মাহবুবুল হক
আলোর
ভুবন

গল্প শোনো সিরিজ

আলোর ভুবন

মাহবুবুল হক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

আলোর ভুবন

মাহবুবুল হক

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম

ফোন : ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল : ০১৭১১৮১৬০০১

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০১৮

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য :৪০০.০০ (চারশত টাকা)

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন -৯৫৭৪৫৯০

ALOR BHUBON Written by Mahbubul Huq, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.400.00 US $: 15.00 **ISBN. 978-984-8000-02-1**

www.nagorikpathagar.org

প্র কা শ কে র ক থা

আমাদের দেশে শিশু-কিশোর উপযোগী বই খুব বেশি একটি প্রকাশ হয় না। যাও হয়, সেগুলোতেও নিজস্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকট। ফলে শিশু-কিশোরদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে আমদানি ও চোরাপথে প্রচুর বই আমাদের দেশে আসছে। বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভরপুর এসব বই দামে সস্তা, দেখতেও সুন্দর! তাই এসবের কাটতিও অনেক।

এই পটভূমিতেই কোনো কোনো দেশি প্রকাশনা সংস্থা শিশু-কিশোর উপযোগী কিছু বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। শুভ উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদেশের অনুকরণ করতে গিয়ে লেখক-প্রকাশক নির্বিশেষে জাতীয় মননের কথা অনেকেই আমরা বেমালুম ভুলতে বসেছি। তাই আশঙ্কা, যদি এই বিস্মৃতি ক্ষণিকের বিস্মৃতি না হয়ে আত্মবিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়?

নবীজী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনের কিছু খণ্ড কাহিনী নিয়ে 'গল্প শোনো' সিরিজের পাঁচটি বই নিয়ে 'আলোর ভুবন' প্রকাশিত হলো। শিশু-কিশোরদের মন ও মনন পরিগঠনে এই বইগুলো গত তিন যুগ ধরে ক্ল্যাসিক সিরিজের ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিদ্যজনেরা জানেন, এই সিরিজের বইগুলো আশির দশকের গোড়া থেকেই এদেশের হাজার হাজার কিশোর-কিশোরীর মন ও মননকে বিপুলভাবে দোলা দিয়েছে। মাঝে লেখকের অবহেলার কারণে কিছু সময় এর প্রকাশনা স্থগিত থাকে। স্থগিত অবস্থাজনিত রুদ্ধ দুয়ার এবার আমরা খুলে দিয়েছি। লেখক সহযোগিতা করলে এই দুয়ার আর বন্ধ হবে না। এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ।

প্রকাশকদের সবচেয়ে বড় পাওনা হলো তুষ্টি। আমরা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট যে, মহান আল্লাহতা'য়ালার ইচ্ছায় একটা ভালো কাজ বোধহয় আমরা করতে পেরেছি। এরপরের সব কথা পাঠকদের।

এস. এম. রইস উদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

লেখকের রচনা সম্ভার লেখকের রচনা সম্ভার লেখকের রচনা সম্ভার লেখকের রচনা সম্ভার লেখকের রচনা সম্ভার

[redacted]

০১. আদম (আ.) -২য় সংস্করণ
০২. নূহ (আ.) -২য় সংস্করণ
০৩. হুদ (আ.) -২য় সংস্করণ
০৪. ইবরাহিম (আ.) -২য় সংস্করণ
০৫. সালেহ (আ.) -১ম সংস্করণ
০৬. লুত (আ.) -১ম সংস্করণ
০৭. ইসমাইল (আ.) -১ম সংস্করণ
০৮. ইয়াকুব (আ.) -১ম সংস্করণ
০৯. ইউসুফ (আ.) -১ম সংস্করণ
১০. আইয়ুব (আ.) -১ম সংস্করণ
১১. শোয়ায়িব (আ.) -১ম সংস্করণ
১২. ইউনুস (আ.) -১ম সংস্করণ
১৩. মুসা (আ.) -১ম সংস্করণ
১৪. দাউদ (আ.) -১ম সংস্করণ
১৫. সোলায়মান (আ.) -১ম সংস্করণ
১৬. ইলিয়াস (আ.) -১ম সংস্করণ
১৭. জাকারিয়া (আ.) -১ম সংস্করণ
১৮. ইয়াহইয়া (আ.) -১ম সংস্করণ
১৯. ঈসা (আ.) -১ম সংস্করণ
২০. মুহম্মদ (স.) -১ম সংস্করণ

[redacted]

২১. মরু দুলালের গল্প শোন- ৫ম সংস্করণ
২২. আবু বকরের গল্প শোন- ৫ম সংস্করণ
২৩. উমর ফারুকের গল্প শোন- ৫ম সংস্করণ
২৪. উসমান গনির গল্প শোন- ৫ম সংস্করণ
২৫. আলি হায়দারের গল্প শোন- ৫ম সংস্করণ
২৬. সোনালী দিনের সোনার মানুষ- ৪র্থ সংস্করণ
২৭. চলো চাঁদের দেশে- ৩য় সংস্করণ
২৮. মাটির মায়া -পার্ল এস বার্কের 'দিআর্থ'- এর কিশোর সংস্করণ
২৯. নানা রং-এর পাতাবাহার- পাণ্ডুলিপি

[redacted]

৩০. ব্রিলিয়ান্ট এবিসি (নার্সারী) - অসংখ্য সংস্করণ
৩১. ব্রিলিয়ান্ট এবিসি (কে.জি)-অসংখ্য সংস্করণ
৩২. ব্রিলিয়ান্ট এবিসি (প্লে-গ্রুপ) -অসংখ্য সংস্করণ
৩৩. ব্রিলিয়ান্ট বর্ণমালার ছড়া (নার্সারী) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৪. ব্রিলিয়ান্ট ওয়ার্ড বুক (ড়) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৫. ছড়ায় ছড়ায় ব্রিলিয়ান্ট এ.বি.সি (নার্সারী) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৬. ছড়া ছড়ায় ব্রিলিয়ান্ট এ-বি-সি (কে.জি.) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৭. ব্রিলিয়ান্ট বর্ণমালার ছড়ায় (কে.জি) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৮. ব্রিলিয়ান্ট ওয়ার্ড বুক (১) শ্রেণি (২য়) - অসংখ্য সংস্করণ
৩৯. চিলড্রেন ওয়ার্ড ডিকশনারী (৪র্থ) - অসংখ্য সংস্করণ
৪০. চিলড্রেন ওয়ার্ড ডিকশনারী (৫ম) - অসংখ্য সংস্করণ

[redacted]

৪১. এক মুঠো আকাশ - ১ম সংস্করণ
৪২. এক রাশ নীল - ১ম সংস্করণ
৪৩. এক ঝাঁক স্বপ্ন - ১ম সংস্করণ
৪৪. এক চিলতে আলো - ১ম সংস্করণ

[redacted]

৪৫. এক গুচ্ছ জোনাকী - ১ম সংস্করণ
৪৬. এক ফালি চাঁদ - ১ম সংস্করণ
৪৭. এক বৃন্ত ফুল - ১ম সংস্করণ
৪৮. এক ঝলক রোদ - ২য় সংস্করণ
৪৯. এক টুকরো মেঘ - ৩য় সংস্করণ

[redacted]

৫০. এক পশলা বৃষ্টি - ১ম সংস্করণ
৫১. এক রত্তি জ্যোৎস্না -পাণ্ডুলিপি

[redacted]

৫২. জীবন সৈকতে – (ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)
৫৩. আর কোন কুয়াশা নেই (এটিএন-এ প্রচারিত)।
৫৪. ঈদের নাটক (দিগন্ত টিভিতে প্রচারিত)
৫৫. এমনতো কথা ছিল না।

[redacted]

৫৬. ঘর হইতে শুধু দুইপা ফেলিয়া (ভারত)
৫৭. মরুভূমিতে মরুদ্যানে (সৌদী আরব)
৫৮. রাজা-রানীর দেশে (ইংল্যান্ড)
৫৯. বরফে সবুজে (কানাডা)

[redacted]

৬০. জীবনের আলো (টিভি)
৬১. এবং অন্যান্য (সেমিনার)
৬২. সোনার বাংলার সম্পাদকীয় (১৯৭২-১৯৭৯)
৬৩. দৈনিক সমাজের সম্পাদকীয় (১৯৭৩-১৯৭৫)
৬৪. ফুলকুঁড়ির সম্পাদকীয় (১৯৮৫-২০০০)
৬৫. সত্যের আলোর সম্পাদকীয় (২০০২-২০০৯)
৬৬. বাংলাদেশ ২০০৩ -২০০৮
৬৭. নির্বাচিত নিবন্ধ
৬৮. নির্বাচিত প্রবন্ধ
৬৯. স্মরণীয় বরণীয়
৭০. সৌরভ ও মননসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়
৭১. আলোকে তিমিরে

[redacted]

৭২. নেতৃত্বের আদর্শ- (অনেক সংস্করণ)
৭৩. মুসলিম মননে সংকট- ২য় সংস্করণ
৭৪. ইসলাম ও বিজ্ঞান

[redacted]

৭৫. বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ে প্রগতিশীল সমাজ - ২য় সংস্করণ
৭৬. অর্থনৈতিক অসমতা - ২য় সংস্করণ
৭৭. সাহিত্যের অপর নাম জীবন - ২য় সংস্করণ
৭৮. বাঙালী জাতীয়তাবাদ কী ও কেন?

[redacted]

৭৯. প্রবাসের চিঠি
৮০. গানের সংকলন
৮১. কুরআনের তাফসির অনুবাদ ও সম্পাদনা

[redacted]

৮২. আমার বেড়ে ওঠা - (মাসিক ফুলকুঁড়িতে প্রকাশিত)
৮৩. আমার যৎকিঞ্চিত ঘোরাফেরা (মাসিক দারুস্সালামে প্রকাশিত)

www.nagorikpathagar.org

ছেলে বান্না, মেয়ে নদী, নাতি আরিজ
নাতনী আমিরাসহ অনাগত
উত্তরাধিকারীদের দু'আ কামনায়—

www.nagorikpathagar.org

আলোর ভুবন

ভে ত রে র পা তা য় পা তা য়

১. মরুদুলালের গল্প শোনো

আকাশের মতো উদার /০৯
অপূর্ব সন্ধি/১৩
উটচালক সেনাপতি/১৬
যুদ্ধবন্দির সাজা/১৭
কত দৃঢ় কত কোমল/১৯
প্রতিশোধের নমুনা/২১
অসাধারণ ক্ষমা/২৩
অতুলনীয় মহানুভবতা/২৫
শাস্তি হলো না/২৭
দুশমনের নিরাপত্তা/২৮
শত্রুর জন্য দোয়া/ ২৯
কবিগানের প্রতিযোগিতা/৩১
স্বার্থবিরোধী সন্ধি/৩৩
বিশ্বাসঘাতকের প্রতি/৩৫
তোমাদের মতো বয়সে/৩৭
দোজাহানের বাদশাহ/৪০
উৎসবমুখর দিনে/৪২
পিতার স্নেহ/৪৪

২. আবু বকরের গল্প শোনো

মিষ্টি খাওয়া হলো না/৪৫
ভাতা ফেরত দিলেন /৪৮
দানের প্রতিযোগিতা/৪৯
প্রতিবেশীর কথা ভুলেননি/৫০
শক্ত শক্ত কথা বলা/৫১
বিপদে বন্ধুর পরিচয়/৫৩
শোনামাত্রই মেনে নিলেন/৫৫
নেতা হতে চাননি/৫৮
নবীজীর বন্ধু হতে পারতেন/৬০
মাটির মানুষ/৬৩

৩. উমর ফারুকের গল্প শোনো

লড়াকু বালক /৬৬
বাদশার টাকা ধার /৬৯
প্রাসাদ পুড়ে ছাই /৭১
উপযুক্ত পুরস্কার /৭৩
সবাই তখন এক কাতারে/৭৫
জবাবদিহির নমুনা /৭৭

www.nagorikpathagar.org

১. মরুদুলালের গল্প শোনো

আকাশের মতো উদার

বিশ্বনবীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই অনেক শুনেছ। যাঁর স্মরণে তোমরা হরহামেশা দরুদ পড় আল্লাহ হুম্মা সাল্লেয়ালা................. ইন্নাকা হামিদুন মাজিদ। যাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা কিছু কবিতা তোমরা পড়ো : "তুমি না এলে দুনিয়ায়, আঁধারে ডুবিত সবি"। সেই মহামানব বিশ্বনবীর কথাই তোমাদের বলছি।

এই মহামানবের নাম-ধামা-পরিচয় সবই তোমরা জানো। ইনিই হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আজ হতে প্রায় পনের শত বছর আগে তিনি আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে সৌদি আরবের কথা এখন তোমরা শোন, তখন কিন্তু দেশটির অত নাম-ডাক ছিল না। এখনকার মতো দেশটি তখন অতো ধনী ছিল না। মানুষগুলোও আজকের মতো এত সভ্য-ভদ্র ছিল না। তারা মারা-মারি, কাটা-কাটি করত। একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করত। কথায়-কথায় মানুষ খুন করত। সমাজে ন্যায়-অন্যায় বলে কোন ভেদ-বিচার ছিল না। যারা জোর-জবরদস্তি করত, তারা লাভবান হতো, আর অন্যরা অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতো। গরিব ও দুর্বলের কোনো বন্ধু ছিল না। ধর্মের নামে তারা নানা ধরনের আজে-বাজে বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে ডুবে ছিল। মুহাম্মদ (সা.) এসব দেখে দুঃখিত হলেন। ভাবতে লাগলেন, কি করে এসব অসভ্য-অভদ্র মানুষগুলোকে ভালো মানুষ করা যায়। কি করে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা যায়। কি করে সমাজে শান্তি আনা যায়। ভাবতে-ভাবতে অনেক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে সমাজের ভালোর জন্য কিছু কিছু কাজও তিনি করলেন। লোকেরা তাঁকে ভালোবাসত- পছন্দ করত। তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। কিন্তু এতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাঁর শুধুই চিন্তা, কি করে এই অসভ্য-বর্বর মানুষগুলোকে সুন্দর মানুষ রূপে গড়ে তোলা যায়। কি করে সকলকে ভালো কাজে লাগানো যায়। পাহাড়ের গুহায় বসে একা একা তিনি ভাবতেন। কিন্তু কোনো কূল-কিনারা করতে পারছিলেন না। অবশেষে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কাছ থেকে তিনি সমাধান পেলেন। কী করে সমাধান পেলেন সেও এক মজার ব্যাপার। আল্লাহর রাজ্যে যারা আল্লাহর কর্মচারী তাঁদের নাম ফেরেস্তা। দুনিয়াতে যেমন বড় কর্মচারী ছোট কর্মচারী আছে তেমনি আল্লাহর রাজ্যে বড় ও ছোট কর্মচারী আছে। বড় কর্মচারীদের মধ্যে জিবরাঈল (আ.) অন্যতম। আল্লাহ, তাঁর মাধ্যমেই নবীদের কাছে বাণী পাঠান। আল্লাহর এই চিরাচরিত পদ্ধতিতেই জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর বাণী নিয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে আসেন। তিনি হলেন আল্লাহর বাণী প্রচারক। এই বাণী প্রচারকদের আমরা নবী বলি। যেমন আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.) প্রমুখ। তাঁরা সবাই ছিলেন নবী ও বাণী প্রচারক। আল্লাহর বাণী প্রচারক বলতে কি বোঝায়? তাঁরা আল্লাহর কথা জীবরাঈল (আ.) হতে লাভ করতেন এবং সে অনুসারে মানুষকে চলতে বলতেন। আগে মানুষের ভালো-মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করতেন। এখন আর করেন না। এখন সেসব নির্দেশ কুরআন শরীফের মধ্যে লেখা রয়েছে। যতদিন দুনিয়া থাকবে

www.nagorikpathagar.org

ততদিন যদি কুরআন শরীফের আদেশ মতো মানুষ জীবন-যাপন করে তবে দুনিয়াতে মানুষ শান্তি পাবে এবং মুক্তি পাবে পরকালে।

তখন কিন্তু নবীদেরও প্রয়োজনও ছিল। লোকেরা আজকের মতো লেখাপড়া জানত না। আজকের মতো উন্নত ছিল না। আল্লাহর নির্দেশ ধরে রাখার জন্য ছাপাখানা-বাঁধাইখানা ছিল না। এখনতো প্রত্যেক ঘরে ঘরে কোরআন শরীফসহ কত-কত বই রয়েছে। সেখান থেকেই মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, পরামর্শ নিতে পারে। আগে মানুষকে এই বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়ার জন্যই আল্লাহ নবী পাঠাতেন। সকল দেশে, সকল অঞ্চলে, আল্লাহর নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষের ভালো-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহর দেয়া উপদেশ মানুষকে জানাতেন। তাঁরা আসলে ছিলেন মানব সমাজের শিক্ষক। তাদের কাজই ছিল মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলা। শিক্ষকরা যেমন আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে তোমাদের বোঝান—কিসে তোমাদের ভালো আর কিসে তোমাদের মন্দ। আর একাজ তারা করতেন আল্লাহর নির্দেশে।

আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি বিধানদাতা ও পালনকর্তা। এই আসমান-জমিন, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, বাতাস-পানি, চাঁদ-সূর্য, জীব-জন্তু, মানুষ সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অন্য সব সৃষ্টি আল্লাহর নির্দেশ মতো কাজ করে চলেছে। তাদের কোনো স্বাধীনতা নাই। যেমন লক্ষ লক্ষ বছর আগে সূর্যের জন্ম হলেও আজ পর্যন্ত সে একই নিয়মে উঠছে, আবার ডুবছে! একই ধরনের আলো দান করছে। তেমনি চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, বাতাস, পানি এখন পর্যন্ত আপন নিয়মেই চলছে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে তাকে স্বাধীনতাও দিয়েছেন। মানুষ নিজের খেয়াল-খুশিমতো যে কোনো কাজ করতে পারে। কিন্তু তাকে বিবেক ও জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর এই বিবেক ও জ্ঞানকে ভাল কাজে লাগানোর জন্য কালে কালে আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন। এই জ্ঞানের আলোকে মানুষ চলবে, এই হল সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। সৃষ্টিকর্তাই জানেন কিসে মানুষের ভালো আর কিসে খারাপ। মানুষ নিজের ভালো-মন্দ কি করে বুঝবে? কেননা বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যতের কথা মানুষ জানে না। সে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ দেননি। একমাত্র আল্লাহই জানেন ভবিষ্যতের কথা। তাই আল্লাহ বরাবর মানুষের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। নবীরা জ্ঞানের বাহক ও মানুষের শিক্ষক হিসেবে সে জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) হলেন শেষ নবী। আল্লাহর কাছ থেকে তিনি বাণী পেলেন, উপদেশ পেলেন। যে সমস্যা নিয়ে তিনি বছরের পর বছর চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, তার সমাধান আল্লাহর কাছ থেকে পেলেন। আল্লাহ বলে দিলেন, কি করে এদের আল্লাহর পথে আনা যায়। খুশিতে আমাদের নবী বাগ বাগ হয়ে গেলেন। ভাবলেন কোনো চিন্তা নাই, এবার শুধু কাজ আর কাজ। মনে অনেক আশা আর উদ্যম নিয়ে তিনি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাজ শুরু করে দিলেন। কিন্তু দু'একজন ছাড়া কেউ তাঁর কথা শুনতে রাজি হলো না। সকলে বলল, আমরা বাপ-দাদার নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে চলছি সে ভাবেই চলব, আমাদের মন যা বলে তাই করব, তোমার কথা শুনতে পারব না। আমাদের নবী হতাশ হলেন না। লোকে যাতে বিরক্ত না হয়, সেভাবে তিনি ধীরে ধীরে শান্ত কোমল কণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন, হানা-হানি করো না, মানুষ মানুষের ভাই, উঁচু-নীচুর কোনো ভেদাভেদ নাই, বংশ-মর্যাদা বলে কোনো জিনিস নাই, দুনিয়ার সব মানুষ সমান- এক আদমের সন্তান- এক আল্লাহর দাস।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে দেখতে দেখতে অনেক কয়টি বছর কেটে গেল। অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। নবীজীর চাচা আবু তালেব মারা গেলেন। মারা গেলেন স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)। নবীজী একা হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের কাছে গিয়ে তিনি বোঝাতে লাগলেন। আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, ভাই বলে, চাচা বলে তিনি সবাইকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে লাগলেন। মানুষ আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা নবীজীকে নতুন আদেশ-উপদেশ প্রচার করতে নিষেধ করল। নবীজী শুনলেন না। কেননা নবীজী জানেন তারা নিজেরা তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে। চোখের সামনে মানুষের ধ্বংস তিনি তো আর দেখতে পারেন না। তিনি তার কাজ করতে লাগলেন। লোকেরা মারমুখী হয়ে উঠলো। পথে ঘাটে তাঁকে দেখলে হৈ হৈ রৈ রৈ করে পিছে-পিছে তাড়া করতে লাগল। পাগল বলে যা-তা গালাগালি দিতে লাগল। তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলো, তাঁর গায়ে ময়লা-আবর্জনা ছুড়তে লাগল। দিন দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। নিজের দেশের লোকেরা তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল।

অবশেষে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ক্ষত-বিক্ষত তাঁর শরীর ও মন। মক্কা শরীফ থেকে সত্তুর মাইল দূরে তায়েফ নামক জায়গায় এসে তিনি হাজির হলেন। ভাবলেন, এখানকার নেতা গোছের লোকদের কাছেই তিনি সবার আগে আল্লাহর বাণী প্রচার করবেন। নেতারা তার কথা মেনে নিলে এলাকার লোকজনও তাঁর কথা শুনবে,তাঁর কথা মানবে। এই ছিল তাঁর চিন্তা। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তিনি বেছে বেছে তিনজন মানী-গুণী লোকের কাছে সত্য পথে, ন্যায় পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। তারা তাঁর কথা শুনল না। বরং তাঁকে আবোল-তাবোল বলে অপমান করলো। ক্ষতি করার জন্য তাঁর পেছনে লোক লাগিয়ে দিলো।

নবীজী তখন সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহর পথে সত্য পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। কেউ তার কথায় কান দিলো না। এরাও তাঁকে নানাভাবে অপমান করল। তাঁর ওপর নানা অত্যাচার শুরু করে দিলো। যত মোলায়েম সুরে তিনি সত্যের আহ্বান জানান, তত কঠোরভাবে তাঁকে তারা আক্রমণ করে। তিনি পথে বের হলেই লোকজন দল বেঁধে হৈ হৈ রৈ রৈ করে তাঁকে তাড়া করে। পাথর মারে। পাথর মারতে মারতে তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে। সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। নবীজী ভাবেন, এরা অবুঝ। বুঝলে এমন অত্যাচার, এমন অবিচার অবশ্যই করত না। আবার তিনি তাদের কাছে যান, আবার সত্য পথ তথা আল্লাহর পথের কথা বলেন। তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর ওপর অত্যাচার-অবিচারের মাত্রাও বাড়ে। তবু তিনি ক্লান্ত হন না। মনে মনে ভাবেন, নিশ্চয়ই তারা একদিন বুঝবে। নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।

কিন্তু না। লোকেরা তাঁকে আর সহ্যই করতে পারে না। তাঁর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। একদিন চারদিক থেকে পাথরের আঘাত খেতে খেতে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েন। সারা শরীর থেকে স্রোতের মতো রক্ত বের হয়ে মাটি লালে-লাল হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি অতি কষ্টে নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ে মোনাজাত করেন : হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি আমার একমাত্র কাম্য। তুমি যদি খুশি থাকো, তবে এসব নিষ্ঠুরতার কোনো পরোয়াই আমি করি না। যে পর্যন্ত তোমার সন্তুষ্টি লাভ না করতে পারি, সে পর্যন্ত তোমার দরবারে আর্তনাদ করতে থাকব। প্রভু হে, তুমি আমার একমাত্র শক্তি, তুমি আমার একমাত্র সম্বল।

www.nagorikpathagar.org

নবীজীর ওপর অত্যাচারে আল্লাহর আরশও বোধহয় কেঁপে উঠেছিল। নবীদের কাছে আল্লাহর বাণী যে ফেরেশতা নিয়ে আসতেন এবং যে ফেরেশতা এর আগেও আমাদের নবীজীর কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন, সেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) নবীজীর সামনে এসে হাজির হলেন। সালাম দিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, দেশবাসী আপনার ওপর যে বর্বর আচরণ করেছে আল্লাহ তা দেখেছেন। আল্লাহ ঐ নরপশুদের শাস্তির জন্য পাহাড়ের পরিচালক ফেরেশতাকে আমার সাথে পাঠিয়েছেন, আপনার হুকুম পালন করার জন্য তিনি প্রস্তুত। পাহাড়ের পরিচালক ফেরেশতা বিশ্বনবীকে সালাম জানিয়ে বললেন, "আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। হুকুম পেলেই দু'পাশের পাহাড়গুলো একত্রে মিলিয়ে দেবো, তাতে তায়েফবাসী নিষ্পিষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা আপনি যে শাস্তি দিতে আদেশ করেন, সেই শাস্তিই তাদের দেবো।"

আমাদের নবী হেসে উঠে বললেন : "না না, তাদেরকে কোনো শাস্তি দিতে হবে না। তারা বেঁচে থাক, তারা যদি আল্লাহর বিধান পথে ফিরে নাও আসে, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষও জন্মগ্রহণ করতে পারে যারা সত্য পথ, সত্য ধর্ম একদিন কবুল করবে।"

মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তোমরা যারা কাজ করবে, তাদেরকে আমাদের নবীজীর ন্যায় আকাশের মতো উদার, সাগরের মতো গভীর এবং পাহাড়ের মতো অটল হওয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অপূর্ব সন্ধি

সন্ধি কথাটি তোমরা শুনে থাকবে। সন্ধি অর্থ বোঝাপড়ার চুক্তি। বিপক্ষ দলগুলো নিজেদের স্বার্থে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নেয়, আমরা আর বিরোধিতা করব না, আমরা আর শত্রুতা করব না, আমরা আর যুদ্ধ করব না, আমরা সমঝোতা করে নেবো। এই চুক্তি করার আগে পক্ষগুলো কিছু কিছু শর্ত ঠিক করে নেয়। তার ওপর ভিত্তি করেই পক্ষগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া হয়। সন্ধি কথাটি সাধারণত যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যবহার হয়। আগের দিনে প্রায়ই যুদ্ধ হতো। সে কারণেই মাঝে-মাঝে যুদ্ধরত দুই বা তারও বেশি পক্ষের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধ বন্ধের বা একেবারে যুদ্ধ বন্ধের জন্যে চুক্তি হতো। এই চুক্তিকেই সন্ধি বলে। ইতিহাসে এমন অনেক সন্ধির কথা আছে। বড় হলে সেসব তোমরা জানতে পারবে। আজ আমরা এমন একটি সন্ধির কথা এখানে আলোচনা করব, যাকে নিঃস্বার্থ সন্ধি বলা যায়। সন্ধির ব্যাপারে সবসময় সব পক্ষের স্বার্থের দিকে নজর রাখা হয়। পক্ষগুলো নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে।

কিন্তু এখানে যে সন্ধির কথা আলোচনা করব, সে সন্ধি শুধু এক পক্ষের স্বার্থেই রচনা হয়। অপর পক্ষ নিজেদের ক্ষতি জেনেও সন্ধি-চুক্তি মেনে নেয়। খুব বিপদে পড়ে বা বেকায়দায় পড়ে ঐ ধরনের একতরফা চুক্তিতে অপর পক্ষ রাজি হয়েছিল তাও নয়। বরং ইচ্ছা করলে সন্ধি না মেনে বিজয় পতাকা তারা ঠিকই তুলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে পরাজিতদের মতো ক্ষতিজনক সন্ধি চুক্তিতে তারা রাজি হয়েছিলেন। এই চুক্তিই ইতিহাসে 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন নিঃস্বার্থ সন্ধি আর হয়নি। এই সন্ধি হয়েছিল মুসলিম আর মক্কার বিধর্মী কুরাইশদের মধ্যে। মুসলিম নেতা ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

মুসলিমগণ মক্কাবাসীদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে মদীনায় গমন করেন। ইতিহাসে একে 'হিজরত' বলা হয়। নিজেদের দেশ, দেশের আলো-বাতাস, দেশের মানুষদের দেখার জন্য এবং কা'বা শরীফে প্রাণ খুলে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য হিজরতকারীরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দেশত্যাগ করার ছয় বছর পর এমন আকুতি কার না হয়? রাসূলের প্রিয় সঙ্গী সাথী যাদেরকে আমরা সাহাবী বলি। এই সাহাবীরা বিশ্বনবীর কাছে আরজ করলেন, হুজুর কা'বা শরীফ কি আমরা আর দেখতে পাব না? বিশ্বনবী তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

আরবি মাস রজব, যিলকদ, যিলহজ ও মহররম মাসকে আরবরা খুব মানত। এসব মাসে আরবরা যুদ্ধ করত না। মক্কার চার পাশে এসব মাসে মারামারি, কাটাকাটি একদম নিষিদ্ধ ছিল। যে কোনো গোত্রের, যে কোনো ধর্মের, যে কোনো লোক কাবা শরীফে হজের সময় হজ করতে পারত। অন্যান্য মাসে সবাই উমরাহ করতে পারত। উমরাহ এক প্রকার হজ। হজের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় যে সংক্ষিপ্ত হজ করা

www.nagorikpathagar.org

হয় তাকে 'উমরাহ' বলে। বিশ্বনবী স্থির করলেন এবার 'উমরাহ' করতে যাবেন। হজের সময় অন্যান্যদের অসুবিধা হতে পারে, সে বিবেচনায় তিনি 'উমরাহ' করাই ঠিক মনে করলেন। যথাসময়ে পনেরো শত সাহাবীকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। সাথে নিলেন কুরবানী করার জন্য সত্তরটি উট।

খবর পাওয়া গেল, মক্কার কুরাইশরা জানতে পেরেছে যে, মুসলিমরা মক্কা নগরী আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মক্কায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কুরাইশদের কোনো কোনো যুদ্ধবাজ শত শত সেনা-সামন্ত নিয়ে মুসলিমদের পথ রোধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। অন্যরা মক্কা নগরীর চার পাশে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতে লাগল। কোনোমতেই তারা মুসলিমদের 'উমরাহ' পালন করতে দেবে না। বিশ্বনবী মক্কার কাছে 'হোদায়বিয়া' নামক জায়গায় তাঁবু গাড়লেন। বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা নবীজীর কাছে আসলেন। তিনি তাঁদের মোলায়েম সুরে বললেন, আমরা উমরাহ যাত্রী। আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। সরদাররা মক্কায় ফিরে নবীজীর কথা বললে কুরাইশরা হেসে উড়িয়ে দিলো। কারো সুপারিশ তারা মানতে রাজি হলো না। তাদের কথা হলো, শিকারি হাতের মুঠোর মধ্যে, এখন তাকে ছেড়ে দেয়া বোকামি। কোনোমতেই এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

নবীজী তাদের দুষ্ট মনোভাব বুঝতে পারলেন। নিজের উটটি দিয়ে খেরাশ নামের এক সাহাবীকে শান্তির দূত হিসেবে মক্কায় পাঠালেন। উত্তেজিত কুরাইশরা নবীজীর উটটিকে মেরে ফেলল! তারা খেরাশকেও হত্যা করত। অন্যান্য গোত্রের লোকেরা বাধা দেয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো। নবীজী উসমান (রা.)কে পাঠালেন। কুরাইশরা তাঁকেও আটক করল। খবর রটে গেল কুরাইশরা উসমান (রা.)কে মেরে ফেলেছে। এই খবর শোনামাত্র মুসলিমদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। নবীজী বললেন, উসমানের শাহাদাতের বদলে অবশ্যই আমরা কুরাইশদের কঠোর সাজা দেবো। অতএব আজ আমাদের সবাইকে মরণপণ লড়াই করতে হবে। মুসলিমদের অবস্থা দেখে কুরাইশরা ভয়ে উসমান (রা.) কে ছেড়ে দিলো। সাথে সাথে তারা সন্ধি চুক্তি করার জন্য লোক পাঠাল। তারা এসে বলল, এবার আপনাদের ফিরে যেতে হবে। না হলে আরববাসী বলবে, মুহাম্মদ (সা.) জোর করে উমরাহ করে গেছে। এটা আমাদের জন্য বড় অপমানের কারণ হবে। এই অপমান আমরা কিছুতেই সইতে পারব না। মুসলিমরা এ শর্ত মানতে রাজি হলো না। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা এটাকে অপমান বলে ধরে নিলো। বিশ্বনবী (সা.) কি চিন্তা করে সবাইকে শান্ত করে বললেন : ন্যায়ের নামে, শান্তির নামে এবং আত্মীয়তার নামে কুরাইশরা আমার কাছে যে দাবি পেশ করবে, আমি তাই মেনে নেবো। মুসলিমরা নবীজীর কথায় শান্ত হলো। কুরাইশরা নিচের সন্ধি শর্ত পেশ করল :

১। মুসলিমদের এবার উমরাহ না করেই ফিরে যেতে হবে;

২। আগামী বছর মুসলিমরা হজ করতে পারবে;

৩। আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যেটুকু প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অস্ত্রই তারা সঙ্গে রাখতে পারবে, তাও খাপের মধ্যে রাখতে হবে;

৪। মক্কায় যেসব মুসলিম বসবাস করবে মুহাম্মদ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যেতে পারবে না। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায়, মুহাম্মদ তাকে নিষেধ করতে পারবে না;

www.nagorikpathagar.org

৫। মদীনার কোনো পুরুষ কুরাইশদের মধ্যে ফিরে আসলে কুরাইশরা তাকে মুহাম্মদের নিকট ফেরত দেবে না। কিন্তু মক্কার কোনো মুসলিম বা অমুসলিম মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নিলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত দিতে হবে;

৬। আরবদের যে কোনো গোত্র কুরাইশদের সাথে অথবা মুহাম্মদের সাথে স্বাধীনভাবে সন্ধি করতে পারবে;

৭। দশ বছর কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না;

বিশ্বনবী (সা.) সন্ধির শর্ত মেনে নিলেন। নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে শুধু শান্তির জন্য নবী তা মেনে নিয়েছিলেন। পরাজিত না হয়েও এমন নতি স্বীকারজনক শর্তে যিনি সন্ধি করতে পারেন– তিনি যে কত বড়, কত মহান শান্তিকামী ছিলেন, দুনিয়াবাসী তা অনুধাবন করতে পেরেছে। বিশ্বে এরপর অনেক সন্ধি চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এমন উদার, নিঃস্বার্থ সন্ধি-চুক্তি আর দেখা যায়নি।

বিশ্বে যারা সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের আমাদের নবীর মতো উদার, নিঃস্বার্থ ও নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

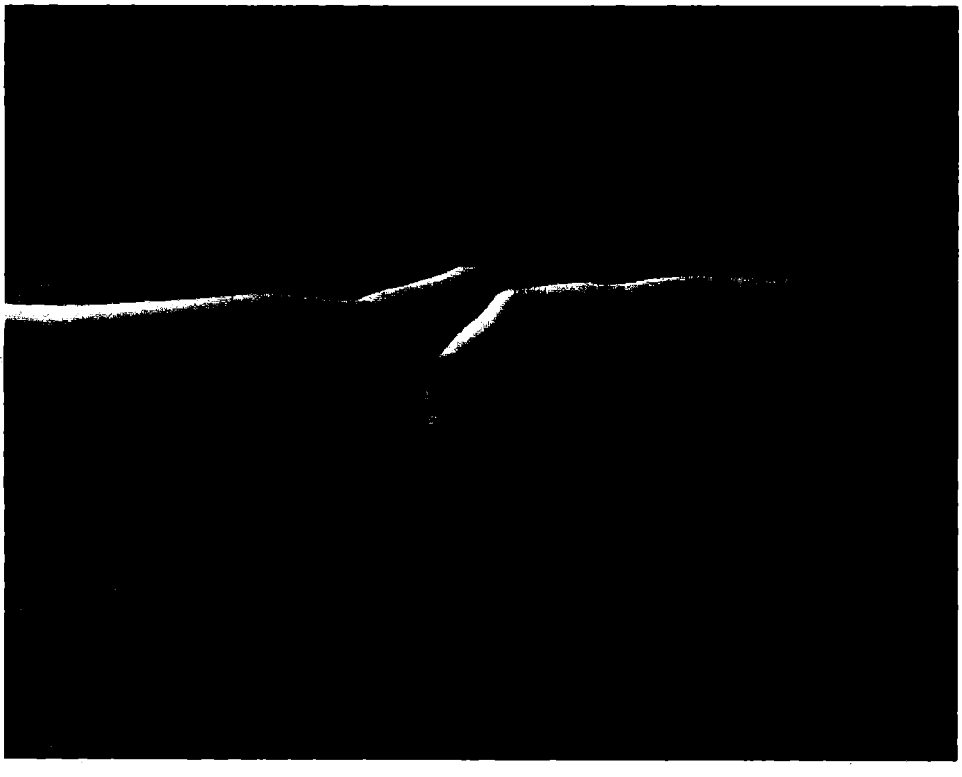

www.nagorikpathagar.org

উটচালক সেনাপতি

দড়ি লাগিয়ে নৌকা টেনে নিতে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। একে গুনটানা বলে। বাংলাদেশের খালে-নদীতে প্রায় সময় এ দৃশ্য দেখা যায়। নৌকা যখন স্রোতের বিপরীত দিকে চলে তখন নৌকার গতি খুব কমে আসে। শুধু বৈঠা মেরে বা লগি দিয়ে নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া যায় না। এ সময় নৌকার মাঝির খুব কষ্ট হয়। তার কষ্ট কমানোর জন্য এবং নৌকার গতি বাড়ানোর জন্য দড়ি লাগিয়ে নৌকাকে সামনের দিকে টেনে নিতে হয়। একেই গুনটানা বলে। আমরা এভাবে নৌকা টানি আর মরুভূমিতে 'মরু জাহাজ' উটকেও তেমনিভাবে টেনে নিয়ে যেতে হয়। উটচালক রশি ধরে আগে আগে চলে। যাত্রীরা উটের পিঠে বসে থাকেন। যাত্রীরা কখনও উটের রশি ধরেন না। ঠিক আমরা যেমন নৌকার গুন টানি না। তেমনি আর কি। কিন্তু আমাদের নবীজী শুধু সম্মানীয় যাত্রী হিসেবে নয়, যুদ্ধ যাত্রায় সেনাপতি হয়েও উটের রশি ধরে আগে আগে চলতেন। চালককে কষ্ট দিয়ে উটের পিঠে বসে থাকতেন না। চলো, তেমন এক ঘটনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি।

মুসলিমরা যুদ্ধে রওনা করেছেন। সংখ্যায় তাঁরা তিনশ'। তাঁদের জন্য আছে মাত্র সত্তুরটি উট। সুতরাং ভাগাভাগি করা হলো। এক এক উটের সঙ্গে তিন-চার জন সৈন্য। নিয়ম করা হলো, পথে অদল-বদল করে সবাই উট চালিয়ে নেবে। নির্দিষ্ট করে কেউ চালক আর কেউ যাত্রী নয়। সবাই চালক—সবাই যাত্রী। আমাদের নবী স্বয়ং সেনাপতি। তবু তিনি একা একটি উট নিলেন না। তাঁর সাথে ছিলেন আরও দু'জন। একজন আলী (রা.), অন্যজন যায়েদ(রা.)। আলী (রা.) এবং যায়েদের উট চালনার কাজ শেষ হলে আমাদের নবীজী উটের পিঠ থেকে নেমে আসলেন। ওদের উটের পিঠে বসতে বলে উটের রশি হাতে নিলেন। আলী (রা.) বললেন : আমরা দু'জনই উট চালনার কাজ করতে পারব, আপনি উটের পিঠে বসে থাকুন। নবীজী জবাব দিলেন, তোমরা আমার চেয়ে সবল নও, আর আমিও তোমাদের মতো সওয়াবের মুখাপেক্ষী। এই বলে তিনি উটের রশি ধরে টানতে লাগলেন। উটের পিঠে সাধারণ সৈন্য আর উটের রশি ধরে টানছেন সেনাপতি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! নবীজী হলেন উটচালক। তিনি তখন শুধু সেনাপতি ছিলেন না। ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে এমন উদাহরণ কি আর কেউ দেখাতে পেরেছে? হ্যাঁ দেখিয়েছেন। তিনিও ছিলেন নবীর অনুসারী উমর (রা.)। বিশ্বনবীর আগে এমন দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারেনি। তিনি বলতেন, দুনিয়ার সব মানুষ সমান। ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ নাই। সবাই এক আদমের সন্তান।

এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি আর কি দেখালেন আর কি শেখালেন? শেখালেন, আইন সবার জন্য সমান। সবাইকে একই নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। বর্তমান সময়ে নবীজীর আদেশ মতো আমরা চলি না বলে যত অশান্তি ও বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধবন্দীর সাজা

যুদ্ধের কথা তোমরা অনেক শুনেছ। বড় হলে কত কত যুদ্ধের কাহিনী তোমাদের পড়তে হবে। শুনেছ, যুদ্ধে যারা জয়ী হয় তারা পরাজিত সৈন্যদের মেরে ফেলে বা খুব কঠিন সাজা দেয়। যারা জয়ী হয় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ওদের ভাগ্য নির্ভর করে। কিন্তু ইতিহাসের এমন অনেক যুদ্ধের কথা আছে যেখানে দেখা যায় পরাজিতদের মেরে ফেলা হয়নি। কেটে ফেলা হয়নি। তেমন কোনো সাজাও দেয়া হয়নি। বরং সেবা করে, আদর-যত্ন করে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। এমন একটি কাহিনী নিয়েই আমরা এখন কথা বলব।

আমাদের নবীজী তখন মদীনায়। মক্কার কিছু লোক সিরিয়া দেশ থেকে ফিরছিল। ব্যবসার জন্য তারা সিরিয়া গিয়েছিল। তখন আজকের দিনের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। লোকেরা উটের পিঠে চড়ে এদেশ থেকে সেদেশে কেনা-বেচা করে বেড়াত। একটানা অনেক দিন ব্যবসার কাজে থাকত বলে তাদের সাথে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্র সবকিছু থাকত। ফেরার পথে তারা নিজ নিজ দেশের চাহিদা অনুযায়ী মালপত্র সংগ্রহ করে আনত। এখন যেমন আমরা আমদানি করি, তেমন আর কি। কিন্তু তখন অত আইনের মার-প্যাঁচ ছিল না। বলতে গেলে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসাতে কোনো বাধাও ছিল না। এখন অবশ্য আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলছি। কিন্তু বলা পর্যন্তই। কার্যত উন্নত দেশগুলো একতরফাভাবে তাদের পণ্য অনুন্নত দেশগুলোতে বিক্রি করছে। এই ধরনের একটি ব্যবসায়ী দল মক্কা ফেরার পথে মদীনার কাছাকাছি এলো। এখানে এসেই তাদের মনে ভয় সৃষ্টি হলো। সাথে এত টাকা-পয়সা, মাল-সামানা। কি জানি, মুসলিমরা যদি শত্রুতার বশে হামলা করে বসে। মনে এসব চিন্তা আসার কারণও ছিল। কথায় বলে না, চোরের মন পুলিশ পুলিশ। তেমন অবস্থা আর কি। এর পূর্বে মুসলিমদের ওপর তারা অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন করেছে। শুধু মুসলিম হওয়ার কারণে অনেককে তারা হত্যা করেছে। অনেককে জমি-জমা, বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে। সবকিছু লুট-তরাজ করে নিয়ে গেছে। অনেকের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিয়েছে এবং প্রায় সবার ওপর দৈহিক নির্যাতন করেছে। এসব কারণে তাদের ভয় ছিল। তাই দলের সর্দার আবু সুফিয়ান তাদের সাহায্যের জন্য মক্কাতে একজন লোক পাঠাল। লোকটি তখন ছিল মুসলিমদের একজন বড় দুশমন। সে মক্কাতে যেয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলো। সবাইকে ডেকে বলল : মুসলিমরা আমাদের দলের ওপর হামলা করেছে। সবকিছু লুট-তরাজ করে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সবাই ছুটে চলো। মক্কাবাসীরা লোকটির কথায় বিশ্বাস করল। তাদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। দেখতে দেখতে এক হাজার লোকের বিরাট বাহিনী তৈরি হলো। মক্কার বড় বড় সর্দারদের নির্দেশে তারা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিমদের এবার চিরকালের জন্য খতম করা।

www.nagorikpathagar.org

খবরটা আমাদের নবীজীর কাছে পৌঁছে গেল। পৌঁছাল সাধারণ মুসলিমদের কাছেও। সবাই আতঙ্কিত হলো। কিন্তু চুপচাপ থেকে তো আর কাপুরুষের মৃত্যু ডেকে আনা যায় না। নবীজী সকলকে ডাকলেন। খবরাখবর জানালেন। একজন সাহাবী বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম আপনি যদি আমাদের নিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরা তাই করব, আমরা কেউ তা থেকে পিছপা হবো না। আমরা যে শপথ নিয়েছি, যুদ্ধে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। অতএব, আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, ব্যবসায়ী দলের পরিবর্তে আক্রমণকারী সৈন্যদলের মোকাবিলা করা হবে। যেমন কথা তেমন কাজ।

১২ই রমজান মাত্র তিনশ' তেরজন সাথী নিয়ে নবীজী মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। উট, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-পানীয় ছাড়া আর তেমন কিছুই ছিল না। অপরদিকে মক্কাবাসীদের বাহিনীতে হাজারের বেশি সৈন্য, একশ'র বেশি সর্দার, অনেক অস্ত্র-শস্ত্র, উট, ঘোড়া এবং প্রচুর খাবার-দাবার ছিল। তাদের জাঁক-জমকের অভাব ছিল না। দেখে মনে হয় মুসলিম বাহিনী মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে।

যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিমরা কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়ে গেল। কারণ তাদের বিপক্ষে ছিল তাদেরই বাবা, চাচা, মামা, ভাই, বন্ধু। কিন্তু আজ সে পরিচয় বড় নয়। আদর্শের কারণে আজ তারা একে অপরের শত্রু। মুসলিমরা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করল। যুদ্ধে মক্কাবাসীরা হেরে গেল। ওদের অনেক সৈন্য নিহত হলো। অনেকে বন্দি হলো। বন্দিদের সেবা-যত্ন, দেখাশোনা করার জন্য সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হল। নবী কড়া নির্দেশ দিলেনঃ কারো যেন কোনো রকম কষ্ট না হয়। সাহাবারা নিজেরা কষ্ট করলেন, কিন্তু ওদের কোনো রকম কষ্ট দিলেন না। সম্মানীয় মেহমানের মতো তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করলেন। বন্দিরা সেবা-যত্নে অভিভূত হলো। মুসলিমরা সহজেই তাদের হৃদয় জয় করে নিলো।

এভাবে মুসলিমদের আচার-আচরণ এবং ব্যবহারে ওরা দলে দলে মুসলিম হতে লাগল। বন্দিরা অবাক হয়ে ভাবল, আরে এরা তো এই সেইদিনও মাত্র আমাদের মতো মূর্তিপূজা করত। মদ খেত। মারামারি-কাটাকাটি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করত। কোন জাদু-মন্ত্রে এরা মাত্র কয়েক দিনেই এমন ভালো হয়ে গেল? এরা তো আমাদের ভাই, আমাদের চাচা, আমাদেরই বন্ধু, অথচ আজ এরা কত উন্নত! কত সুন্দর! কত মার্জিত! যে রাগী ছিল, সে আজ কত শান্ত! যে পরশ্রীকাতর ছিল সে আজ কত উদার। কত বিনয়ী। আহ! আমরা যদি এদের মতো হতে পারতাম!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জান? গরিব এবং লেখাপড়া জানা বন্দিদের বলা হলো, তারা এক একজন দশজন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। এর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। ওরা তো মহা খুশি! এ আবার কেমন সাজা! মহা আনন্দে তারা ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে লাগল। আর মুক্ত হতে লাগলো। এভাবে অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। দেখলে তো, বন্দিদের কেমন সাজা দিলেন আমাদের নবীজী। যে সাজার কারণে কারো কোনো কষ্ট হলো না, কারো কোনো ক্ষতিও হলো না। বরং সবারই লাভ হলো। আমরা সবাই জানি, অন্য কিছু বিতরণ করলে কমে যায় কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে কমে না। এই কারণে বন্দিরাও মহা আনন্দে জ্ঞান বিতরণের কাজটি করেছিল। এমন শাস্তির ব্যবস্থা যদি এখনও থাকত।

www.nagorikpathagar.org

কত দৃঢ় কত কোমল

আইনের চোখে সবাই সমান। কথাটা সবাই বলে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি? দেখি আইনের মানুষরাই আইনের এত ভালো এত মহৎ কথাটি মানেন না। শুধু আমাদের দেশে নয়, দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই একই অবস্থা। গরিব বা সাধারণ লোকেরা অনেক সময় সুবিচার পায় না। বড়লোকেরা সমাজের সব জায়গা থেকে বেশি সুবিধা পায়। এমনকি জেলখানায়ও তাদের জন্য ভালো থাকার ব্যবস্থা, ভালো খাবারের ব্যবস্থা, ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। অথচ গরিব বা সাধারণ লোকদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, কোনো ধনী বা সম্ভ্রান্ত লোককে যখন পুলিশ গ্রেফতার করে তখন হাতকড়া লাগায় না, কিন্তু গরিবদের বেলায় হাতে, পায়ে, এমনকি কোমরেও দড়ি বাঁধা থাকে। ধনী ও উঁচু শ্রেণীর লোককে গ্রেফতার করে নেয়ার সময় গাড়িতে করে নিয়ে যায়। আর গরিবদের বেলায় পায়ে হেঁটে। বড়লোকেরা সহজেই জামিন পায় আর গরিবরা তা পায় না। জ্ঞানী-গুণী বা উঁচু শ্রেণীর ব্যক্তিদের সমাজের লোকেরা সম্মান করে বলেই তারা এই সুবিধাটুকু পায়। আইনে বিধানে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না রাখলেও এই সুবিধা তারা পায়। নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ যে, রেশনের দোকানে রেশন নেয়ার জন্য খুব বড় লাইন পড়ে। কেউ কারো আগে যেতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এমন সময়ে উত্তম পোশাক পরা কেউ এসে সবার আগে রেশন নিয়ে যান। তিনি লাইনে দাঁড়াননি। রেশন দোকানদার সবাইকে দাঁড়িয়ে রেখে তাকেই আগে বিদায় করেন। এমনও দেখা যায় কোনো বড়লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, দোকানদার তাকে দেখে অবাক হয়ে বলেনঃ আরে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, আসুন, নিয়ে যান। এই বলে বেশ কয়েকজনের আগেই তাকে বিদায় করেন। এমনও শোনা যায়ঃ স্যার আপনি এসে আমাদের লজ্জা দেন কেন! আমাদের জানালে আমরাই তো দিয়ে আসতাম।

আমাদের সমাজে এসব হরদম চলছে। কেউ এখন আর এসবকে অন্যায় মনে করছে না। একেই সুবিধাবাদ বলে। এই শ্রেণির মানুষকেই সুবিধাভোগী মানুষ বলে। এরাই অন্যদের বঞ্চিত করে সমাজের বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে।

আমাদের নবীজী এ সবের ধার ধারতেন না, সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। কাউকে তিনি বেশি সুবিধা দিতেন না। সুখ ও শান্তি তিনি সবার মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তেমনি দুঃখ-কষ্টও সবার মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতেন। আজ এমন একটি গল্পই আমরা শুনব।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করল। মক্কাবাসীদের অনেকেই বন্দি হলো। বন্দিদের মধ্যে মহানবীর আপন চাচা আব্বাস ছিলেন। সকল বন্দিকে একইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আব্বাস ছিলেন বয়সে সকলের বড়। তিনি ছিলেন সবচেয়ে উঁচু বংশের লোক। তা'ছাড়া তিনি ছিলেন আমাদের নবীজীর আপন চাচা। এসব কারণে তাঁর জন্য কোনো না কোনো সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা। কিন্তু আমাদের নবীজী সে

www.nagorikpathagar.org

সুবিধা দেননি। ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু সকল বন্দির প্রতি তিনি সমান আচরণ দেখান। রাতে দুঃখ ও কষ্টে আব্বাস কাঁদতে লাগলেন। খুব জোরে জোরে তিনি কাঁদছিলেন। এত কষ্ট তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। চাচার কাঁদাকাটিতে আমাদের নবীজী অস্থির হয়ে পড়লেন। ঘুমাতে পারছিলেন না। ছট-ফট করছিলেন। দয়ার সাগরে মন গলে গলে পড়ছিল। কিন্তু কিছুই তাঁর করার ছিল না। তিনি যে ন্যায় বিচারক! কারো প্রতি তো তিনি অন্যায়ভাবে দয়া দেখাতে পারেন না। নবীজীর এই অবস্থা দেখে কে যেন তাঁর কাছে এসে বললেন: হে রাসূল ! আপনার ঘুম আসছে না কেন? তিনি বললেন: চাচার কষ্টের কারণে আমার খুব খারাপ লাগছে।

লোকটির মনে খুব ব্যথা লাগল। নবীজীর মনোবেদনায় তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ভালো-মন্দ কিছু না ভেবে তিনি বন্দিশালায় ঢুকলেন। আব্বাসের বাঁধন একটু আলগা করে দিলেন। বাঁধন একটু ঢিলে-ঢালা হওয়ায় আব্বাস আরাম বোধ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আব্বাসের কান্নাকাটি বন্ধ হওয়ায় নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন : চাচা এখন চুপ হয়ে গেলেন কেন ? লোকটি বললেন : নবীজী, আমি তার বাঁধন কিছুটা ঢিলে করে দিয়েছি। নবীজী অবাক হলেন। একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর বললেন : যান, সব বন্দিকে বাঁধন সে রকম ঢিলে করে দিন।

এত দৃঢ় ছিল তার মন এবং এত ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

আমাদের নবীজী এবং আমাদের মহান নেতা এমনই ছিলেন। আইনের দিক দিয়ে তিনি যেমন ছিলেন দৃঢ় ও ন্যায়নিষ্ঠ তেমনি ছিলেন অসাধারণ মানবীয় গুণসম্পন্ন।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিশোধের নমুনা

প্রতিশোধ কাকে বলে তাতো তোমরা জানই। সোজা কথায় এর অর্থ, যে ক্ষতি করে তার কিছু ক্ষতি করা। স্কুলে যেমন তোমরা 'শোধ-বোধ' করো তেমনটি আর কি! কোনো ছেলে তোমাদের কারো কান মলে দিলো, তোমরা বিচারে বসে ঠিক করলে, যে কান মলেছে, তারও কান মলে দিতে হবে। অথবা ইচ্ছা করে কেউ কারো বই ছিঁড়ে দিয়েছে, তাকে নতুন বই কিনে দিতে হবে। এসবকে প্রতিশোধ নেয়া বলে। এসব তো তোমরা করো, আমরা বড়রাও করি। এমনকি দুনিয়ার সবাই করে। আসল কথা হলো, যে ক্ষতি করে তারও ক্ষতি করার জন্য আমরাও উঠেপড়ে লাগি। কেউ কাউকে ক্ষমা করতে চাই না। কিন্তু এতে ফলটা কি হয় জান? এতে বন্ধু বাড়ে না, বরং শত্রু বাড়ে। যে ক্ষতি করল, তাকে যদি বলা হয়, "ঠিক আছে, তোমাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।" তা হলে তার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাবে। সে তোমার উদারতার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে। দিন দিন তোমার ঘনিষ্ঠ হবে। তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। এ কথাটি কেউ না বুঝলেও বুঝতেন আমাদের নবীজী। তাই তিনি জীবনে কোনোদিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। বলেননি: আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নিজে তিনি ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন বেশ কয়েকবার। নিজের ভুলের জন্য নয়, সাথী-বন্ধুদের ভুলের জন্যে। তেমন একটি গল্পই এখন আমরা শুনব।

তোমরা তো সবাই জান, শত্রুদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে আমাদের নবীজী মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। তাতেও কিন্তু শত্রুতা কমেনি। বরং নানা ছলে-বলে-কৌশলে নবীজীকে হত্যা করার জন্যে এবং মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্যে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। একই গোত্র বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করেও নবীজীর সাথে সন্ধি করে ক্ষমা পেয়ে যায়। কিছু কিছু গোত্র বার বার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে। নবীজী তাদের বার বার ক্ষমা করেন। মদীনা অঞ্চলের দু-একটি গোত্র ছাড়া বাদবাকি প্রায় সব গোত্রই নবীজীর বিরোধী ছিল। কারণ, নবীজী প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। নবীজী চাইতেন মানুষেরা আল্লাহর দাস হোক। লুট-তরাজ বন্ধ হোক। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বন্ধ হোক। নারীর মর্যাদা ফিরে আসুক। সমাজে মারামারি, কাটা-কাটি বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসুক, মদ-জুয়াসহ যাবতীয় খারাপ কাজ বন্ধ হোক। এতে সমাজের বড়লোকদের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। এরাই ছিল বিভিন্ন গোত্রের সর্দার। তারা নবীজীর এই সংস্কার আন্দোলনকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে চলল।

এমনি এক গোত্রের নাম কালাব। গোত্রের এক সরদার আবু বারাআ নবীজীর কাছে এসে বলল : আমার সাথে কয়েকজন মুসলিম দিন, আমাদের লোকেরা ইসলামের কথা শুনতে চায়। নবীজী খুশি হলেন। ভাবলেন, ক্ষমা করে দেয়াতে এদের মন বোধহয় নরম হয়ে গেছে। নিজের ইচ্ছায় তারা ইসলামের কথা

www.nagorikpathagar.org

শুনতে চাচ্ছে। নবীজীর মনে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। নবীজী বারাআর কথায় এত খুশি হলেন যে, তার সাথে সত্তুর জন সাহাবা পাঠিয়ে দিলেন। আবু বারাআ সাহাবাদের নিয়ে গোত্রের শাসনকর্তা আমের বিন তোফায়েলের সামনে হাজির হলো। শাসনকর্তা একজনকে বাদ দিয়ে উনসত্তুর জন সাহাবাকে ঘেরাও করে হত্যা করল। যিনি বেঁচে গেলেন, তিনি ছিলেন আমর বিন উমাইয়া (রা.)। তাঁকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে শাসনকর্তা বলেছিল : আমার মা একটি গোলাম মুক্ত করার মানত করেছিল, যা ঐ মানত হিসেবে তোকেই আমি মুক্তি দিলাম।

আমর বিন উমাইয়া (রা.) ক্ষোভে-দুঃখে জর্জরিত হয়ে ফিরে আসছেন। চোখের সামনে এত বড় অন্যায়, এত বড় অমানবিক কাণ্ড ঘটে গেল, কিছুই তিনি করতে পারলেন না। সাথী-বন্ধুদের জন্য বুক ফেটে কান্না আসছিল। কী জবাব দেবেন প্রিয় নবীজীর কাছে! ইসলামের এত বড় ক্ষতিকে কোনোমতেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। এমন সময় কালাব গোত্রের দু'জন লোকের সাথে তার দেখা। তিনি ভালো-মন্দ চিন্তা না করে তাদের হত্যা করলেন। মনে মনে ভাবলেন, যাক বিশ্বাসঘাতকতার কিছু প্রতিশোধ তো নেয়া হলো।

বিশ্বনবী ঘটনাগুলো জানতে পেরে খুব দুঃখিত হলেন এবং মর্মাহত হলেন। এতগুলো মানুষের হঠাৎ শাহাদাতে তিনি কিছুটা মুষড়েও পড়লেন। বিশেষ করে পরের ঘটনায় তিনি দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কাজটা বড় রকমের অন্যায় হয়েছে বলে ভীষণ রাগারাগি করলেন। এভাবে প্রতিশোধ নেয়াকে তিনি জঘন্যতম অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। আর তা'ছাড়া ঐ গোত্রের লোকদের তিনি আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে অবস্থায় এই ধরনের হত্যা সরাসরি ওয়াদা বা চুক্তির খেলাফ। তিনি এই হত্যার ক্ষতিপূরণ দানের কথা ঘোষণা করে দিলেন।

দেখলে, প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণের কি দৃষ্টান্ত আমাদের নবীজী দেখিয়েছেন। দুনিয়ার আর কোনো নেতা এমন দৃষ্টান্ত কি দেখাতে পেরেছে? না, পারেনি। সম্ভবত পারবেন না। বর্তমান সময় হলে আমর বিন উমাইয়া (রা.) কে সাবাস দেয়া হতো। বলা হতো তুমি একটা ঠিক কাজ করেছ। কিছু প্রতিশোধ তো অন্তত নিয়েছ।

www.nagorikpathagar.org

অসাধারণ ক্ষমা

দেশ ত্যাগ করার আট বছর হয়ে গেল। এদিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি কুরায়েশরা তাদের স্বার্থে বার বার ভঙ্গ করল। নবীজী বরাবর সন্ধি চুক্তি মেনে চললেন। এতে ইসলাম ও মুসলিমদের যথেষ্ট ক্ষতি হলো। ক্ষতির পরিমাণ দিনদিন বাড়তেও থাকল। যে সমস্ত গোত্র মুসলিম না হয়েও সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমদের সাথে চুক্তি করেছিল, তাদের ওপর কুরায়েশরা নানা রকম জুলুম ও অত্যাচার চালাতে লাগল। তাদের অপরাধ তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তি করল কেন?

খোজায়া নামের একটি গোত্র মুসলিমদের সাথে চুক্তি করেছিল। সে কারণে কুরায়েশরা তাদের ওপর হামলা চালালো। তাদের মধ্যে যারা কা'বা শরীফে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরও হত্যা করা হলো। খোজায়া গোত্রের লোকেরা নবীজীর কাছে এসে সব কথা খুলে বলল এবং চুক্তি অনুযায়ী মুসলিমদের সাহায্য কামনা করল। কি বিচিত্র তাই না? বিধর্মীরা একে অপরকে শাস্তি প্রদানের জন্য মুসলিমদের সাহায্য চাচ্ছে। যেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরই একতাবদ্ধ হয়ে থাকার কথা। মজলুম খোজায়াদের কথা শুনে নবীজী ভীষণ কষ্ট পেলেন। মনে হলো তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের ওপর যেন অত্যাচার চলছে। তিনি তখনই দেরি না করে কুরায়েশদের কাছে দূত পাঠালেন। তাদের এ হানাহানি বন্ধ করার আবেদন জানালেন। সাথে সাথে তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করার আহবান জানালেন :

১) খোজায়াদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

২) বনু বকর গোত্রের সাথে কুরায়েশরা কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না,

৩) হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

দূত মারফত কুরায়েশরা জানাল যে, তারা সন্ধি চুক্তি বাতিল করতে চায়।

অবশেষে রমজান মাসের ১০ তারিখে দশ হাজার মুসলিম-সেনা নিয়ে নবীজী মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। বড় রকমের কোনো গোলযোগ ছাড়াই সাথীদের নিয়ে তিনি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। কা'বা শরীফে তাওয়াফ করার পর জনসমাবেশে ভাষণ দান করলেন। বললেন : সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার, সমস্ত পুরনো হত্যা ও রক্তের বদলা আজ থেকে বন্ধ। বললেন : সমস্ত মানুষ এক আদমের বংশধর, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

কুরায়েশরা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা ভেবেছিল, মুহাম্মদ মক্কা নগরীতে ঢুকে কাউকেই রেহাই দেবেন না। সব দুশমনকে ধরে ধরে হত্যা করবেন। এতকালের শত্রুতার চরম প্রতিশোধ নেবেন। তারা আরও ভাবল, এতবড় বিজয়ের উৎসবে তারা নিজেদের বাহাদুরীর কথা বলবে। দুশমনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘোষণা করবে। কিন্তু কোথায় এসব ? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। তারা তো তাওয়াফ

www.nagorikpathagar.org

করে এবং নামাজ পড়ে উৎসব করল। এ আবার কেমনতরো উৎসব। আবার বলছে কি না, আজ থেকে সব ধরনের রক্তপাত বন্ধ! তবে কি তারা আমাদের দুশমনীর বদলা নিবে না ? আমাদেরকে হত্যা করবে না ? আমাদের বন্দি করবে না ?

জনসমাবেশে বড় বড় কুরায়েশ নেতা উপস্থিত ছিল। যেসব ব্যক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জীবনবাজি রেখেছিল, তারা সেখানে উপস্থিত ছিলো। যারা মুসলিমদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছিল, তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, পাথর মারত, সবসময় তাকে হত্যা করার চিন্তা করত, তারাও সেখানে হাজির ছিল। যারা বিনা কারণে অগণিত মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তারাও সেখানে ছিল। সব ধরনের শত্রুই সেখানে উপস্থিত ছিল।

নবীজী ধীরে ধীরে এদের সবার দিকে তাকালেন এবং বললেন : আজ আপনাদের সাথে আমি কী ধরনের আচরণ করব ?

সকলই বলে উঠলো : আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভাই ও ভাতিজা।

নবীজী বললেন : "আজ আর আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আপনারা সবাই মুক্ত।"

কেউ কোনো কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তোমরাই বলো না, এও কি বিশ্বাস করার মতো কিছু। আজকের যুগে এমন ঘটনা ঘটতে পারে ?

তোমরা শুনে আরও আশ্চর্য হবে যে, যেসব মুসলিম মক্কায় ফেলে যাওয়া বাড়ী-ঘর ফিরে পাবার আশা করেছিল, তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। প্রিয় নবী এসব দাবি-দাওয়া না করার উপদেশ দিলেন। তিনি দখলকৃত বাড়ি-ঘর খালি করারও আদেশ দিলেন না। এ যে কত বড় উদারতা! কত বড় মহানুভবতা! তা কি আমরা ভাবতে পারি ?

নবীজীর উদার মানবিক ব্যবহারে সবাই বিমোহিত হলো। কোনোদিন স্বপ্নেও তারা ভাবেনি, মানুষ মানুষের প্রতি এমন ব্যবহার করতে পারে, জাতশত্রুর বিরুদ্ধে কোনো জাতশত্রু এমন আচরণ করতে পারে। তারা ভেবেছিল, মুহাম্মদ এবার তাদের হত্যা করবে, না হয় জোর করে মুসলিম বানাবে। কিন্তু কই, তিনি তো তার বক্তৃতায় ধর্মের কোনো কথাই বললেন না। জোর করা দূরের কথা, তিনি তো তার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বানও জানালেন না। ধর্মের কথা শোনাবার এত বড় সুযোগ পেলেন তবু তিনি একটি কথাও বললেন না।

এসব থেকেই তারা অনুধাবন করলেন, মুহাম্মদ-এর ধর্ম নিশ্চয়ই খোদা প্রদত্ত ধর্ম। তাই তারা দলে দলে ইসলাম কবুল করলেন।

www.nagorikpathagar.org

অতুলনীয় মহানুভবতা

আবু সুফিয়ান নামে মক্কায় একজন সরদার ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের নবীজীর বড় দুশমন। তিনি সাধারণ লোক ছিলেন না। ছিলেন মক্কার কুরায়েশদের নেতা। শুধু নবীজী নয়। তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিমদের এক নম্বরের শত্রু। ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য এমন কোনো কাজ নেই, যা তিনি করেননি। মক্কায় নবীজী ও তার অনুসারীদের ওপর যে অত্যাচার ও অবিচার চলেছিল, তাতো তোমরা জান। নবীজীর চলার পথে কাঁটা বিছানো, পাথর মারা, নতুন মুসলিমদের মারধর করা, নামাজ না পড়তে দেয়া, মুসলিমদের জমায়েত হতে না দেয়া—এ সমস্ত কাজ আবু সুফিয়ানের নির্দেশে হয়েছিল। এরপর নবীজীকে হত্যা করার জন্য যে কয়জন সর্দার একত্রিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। এদেরই অত্যাচারে নবীজী ও তার অনুসারীরা নিজ দেশ ত্যাগ করে মদীনায় যেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি। আবু সুফিয়ান বারবার মদীনা আক্রমণ করার চক্রান্ত করেন। মুসলিমদের শক্তি যত বাড়তে থাকল, ষড়যন্ত্র তেমনি বাড়তে লাগল। বিনা কারণে মুসলিমদের হত্যা করা, বিতাড়িত করা, যুদ্ধের জন্য উস্কানী দেয়া—এ সমস্ত কাজে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ব ছিল। বদরের যুদ্ধও বলতে গেলে তারই উস্কানিতে সংঘটিত হয়। মোটকথা, বেশ কয়েক বছর আবু সুফিয়ান নবীজী, ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো কাজে তার মন ছিল না। তার একমাত্র চিন্তা ছিল, কি করে এই নতুন আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায়। সে অনুযায়ী যত ধরনের ষড়যন্ত্র করা যায়, যত ধরনের প্রতিহিংসামূলক কাজ করা যায়, তার সবই আবু সুফিয়ান করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধাও। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা যুদ্ধে তিনি সেনাপতি ছিলেন। বহুবার মুসলিমদের রক্তে তিনি নিজের হাত লাল করেছিলেন।

ইসলামের এতবড় শত্রু মক্কা বিজয়ের কিছু আগে মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। তিনি মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য তাদের শক্তি আন্দাজ করতে এসেছিলেন। বন্দি করে তাকে নবীজীর সামনে পেশ করা হলো। সকলেই অনুমান করল আজ আর আবু সুফিয়ানের নিস্তার নেই। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ইসলামের এতবড় শত্রুকে আজ আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। নবীজী তার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন : যাও আজ তোমাকে কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রদর্শনকারী।

আবু সুফিয়ানের প্রতি এই ব্যবহার অভিনব হলেও নবীজীর কাছে তা নতুন ছিল না। তিনি বরাবর এ ধরনের ক্ষমাই করে গেছেন। দুনিয়ার কোনো নেতা, কোনো যোদ্ধা, কোনো সেনাপতি কি এ ধরনের আচরণ দেখাতে পেরেছে? পারেনি। কেননা, আর কেউই তাঁর মতো মহৎ উদার ছিলেন না। যে যুগে

www.nagorikpathagar.org

হত্যার বদলে যুগ যুগ ধরে হত্যালীলা চলতে থাকত, সে যুগে মহত্ত্বের এবং উদারতার এটা ছিল এক অনেক বড় উদাহরণ।

এই মহানুভবতা এবং উদারতা কি কোনো কাজে লাগেনি? লেগেছে। শুনলে অবাক হবে, যে ব্যক্তি ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, দিনরাত যে ইসলামের ধ্বংসের জন্য কাজ করেছে, নবীজীর এই মহানুভবতায় তার মন গলে গেল। তিনি নবীজীকে, নবীজীর ধর্মকে বুঝতে পারলেন। তার সব ভুল ভেঙে গেল। ভাবতে লাগলেন, হায় এতদিন কি অন্যায়ই না করেছি। কি জঘন্য মিথ্যার পেছনেই না ছোটাছুটি করেছি। তিনি ভীষণভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন। বরফ যেমন গলে, তিনি তেমনি গলতে লাগলেন। মনের সমস্ত হিংসা-গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল! দুনিয়ার কোনো মোহই তাঁকে আর ধরে রাখতে পারল না। তিনি নবীজীর প্রচারিত ধর্ম কবুল করলেন।

এখন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নবীজী তাকে কেন শাস্তি দেননি। তিনি তো দেখতে চাচ্ছিলেন আল্লাহ তায়ালা আবু সুফিয়ানকে ক্ষমা করেছেন কি না। ক্ষমা করার জন্য তিনি দোয়াও করেছিলেন। আল্লাহতায়ালা যে ক্ষমা করেছিলেন এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়েছিলেন ।

www.nagorikpathagar.org

শাস্তি হলো না

আবু সুফিয়ানের কথা শুনলে। এবার তাঁর স্ত্রীর কথা তোমাদের বলব। নবীজীর বিরোধিতা শুধু পুরুষরাই করেনি। নারীরাও এ ক্ষেত্রে কোনো অংশে কম ছিল না। নবীজী এবং তাঁর সাথীদের ওপর অত্যাচার করার জন্য বিধর্মী নারীরা পুরুষদের উত্তেজিত করত। তাদের এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করত। যার কথা বলছিলাম, তার নাম ছিল হেন্দা। এই মহিলা আবু সুফিয়ানের সাথে থেকে সব ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনে সব সময় সহযোগিতা করত। ওহুদের যুদ্ধের সময় হেন্দা মুসলিমদের শত্রু কুরায়েশদের উত্তেজিত করার জন্য গান গেয়েছিল। তার গানে ছিল হিংসা আর প্রতিশোধের বিষ। গান গেয়ে সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের বিষিয়ে তুলেছিল। যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হওয়ার পর নবীজীর প্রিয় চাচা হামজাকে (রা.) নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাতে হেন্দার মন এতটুকু নরম হয়নি। সে প্রতিহিংসার জ্বালায় এমনভাবে জ্বলছিল যে, সে নিজ হাতে হামজার নাক-কান কেটে নিজের গলায় পরে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। কিন্তু এতেও তার মন গলেনি। মনের জ্বালা মেটেনি। অবশেষে সে হামজার বুকে ছুরি মেরে কলিজা বের করে চিবিয়েছিল আর আনন্দ-উল্লাস করেছিল। ইসলামের এতবড় শত্রুর স্বামী মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কাবাসীকে যখন ইসলামের বাণী শোনাচ্ছিলেন তখন সবাই অবাক হয়ে তা শুনছিল। কেউ কোনো প্রতিবাদ করছিল না। আবু সুফিয়ান তখনও মক্কাবাসীদের সর্দার। কে তার কথা অগ্রাহ্য করবে। মক্কাবাসীরা তখন বলতে গেলে মুসলিমদের হাতে বন্দি। তারা তখন সব চেয়ে বড় বিপদের মুখে। এই পরিস্থিতির মাঝেও হেন্দা শান্ত থাকতে পারেনি। সবার সামনে আবু সুফিয়ানের দাড়ি টেনে ধরে বলতে লাগল : "কে কোথায় আছ তোমরা! এই আহম্মক বুড়োকে মেরে ফেল।" কিন্তু হেন্দার ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। কারণটা কী? কারণ সবাই নিজের জীবনের চিন্তায় অস্থির ছিল। মক্কা বিজয়ের পর হেন্দাকে হত্যা করার হুকুম হলো। হেন্দা ঘরে ফিরে সমস্ত মূর্তি ভেঙে চুরমার করল। বলতে লাগল, "এই অপদার্থ মূর্তিগুলোর জন্যই আমাদের এই দুর্দশা। এদের সামান্য ক্ষমতা থাকলেও এরা আজ আমাদের সাহায্য করতে পারত। এরা পুতুল, এদের কোনো ক্ষমতা নাই।" সে মনে মনে ভাবল নবীজীর সামনে গেলে অন্যান্যদের মতো সেও ক্ষমা পেয়ে যাবে। কিন্তু একা যেতে সাহস পাচ্ছিল না। তাই অন্য মহিলাদের সাথে নবীজীর সামনে যেয়ে ইসলাম কবুল করলেন। নবীজী তাকে কিছুই বললেন না।

বরং নবীজীকে সে বলল : তার ঘরে ছাগল খুব কম। বেশি ছাগল হওয়ার জন্য তিনি নবীজীর দোয়া চাইলেন! নবীজী দোয়া করলেন। পরে এ কারণে হেন্দার ঘরে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিহিংসার কারণে যিনি নবীজীর চাচার কলিজা চিবিয়েছিলেন তার কোনো শাস্তিই হলো না। বরং তার অবস্থার উন্নতির জন্য নবীজী দোয়া করলেন। কী অপূর্ব প্রতিশোধ!

তোমরা কি পারবে এমন উদারতা দেখাতে ?

www.nagorikpathagar.org

দুশমনের নিরাপত্তা

সাফওয়ান নামে আরও একজন বড় দুশমন ছিলেন। নবীজী ও ইসলামের অন্য দুশমনদের মতো তিনিও কম দুশমনি করেননি। মক্কা বিজয়ের পর অনেক দুশমন ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু সাফওয়ান তা করেননি। নবীজীর প্রতি এবং তাঁর ধর্মের প্রতি তিনি ভয়ানক ক্ষুব্ধ ছিলেন। ভুল বুঝতে পেরে এবং অনুতপ্ত হলে দলে দলে মক্কার লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন ? আশপাশের সকল এলাকা যে মুসলিমদের অধীনে। তার বিরুদ্ধে যে হত্যার আদেশ জারি হয়ে আছে। যে কোনো মুসলিম যে কোনো সময় তাকে হত্যা করতে পারে। তিনি বুঝতে পারলেন তার আর বেঁচে থাকার আশা নেই।

তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু নবীজীর কাছে হাজির হয়ে সাফওয়ানের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানালেন। যার বিরুদ্ধে হত্যার আদেশ জারি হয়েছে তার জীবনের নিরাপত্তা! যে শত শত মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার জীবনের নিরাপত্তা ! যার অন্যায়-অত্যাচারে মুসলিমরা ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি এমনকি মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার জীবনের নিরাপত্তা! দুনিয়ার কেউ কি এই আবদার শুনত ? কারণ হত্যার বদলে হত্যাই ছিল একমাত্র সাজা। নবীজী কিন্তু সাফওয়ানের বন্ধুর আবদার মেনে নিলেন। শুধু মেনে নিলেন না, নিজের মাথার পাগড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন : এটা নিয়ে যাও, নিরাপত্তার সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে।

বন্ধুটি নিরাপত্তার সংবাদ এবং পাগড়িটি সাফওয়ানকে দিলেন। সাফওয়ান এসব বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তার কাছে সব কিছুই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। সাফওয়ান ক্ষমা পেতে পারে– এটা সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। বন্ধু তাকে সব কিছু খুলে বলল। তিনি তো অবাক! এ কী করে সম্ভব? অবশেষে তিনি নবীজীর সামনে হাজির হয়ে বললেন : এখনও আপনার ধর্ম সম্পর্কে আমার সন্দেহ দূর হয়নি। আমাকে দু'মাসের সময় দিন। নবীজী শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন : দু'মাস কেন চার মাস সময় নাও, স্বাধীনভাবে ইসলামের সত্যতা বিচার করো।

অবশেষে স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

শত্রুর জন্য দোয়া

মক্কা বিজয়ের পর নবীজীর সাধারণ ক্ষমার ফলে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। দিকে দিকে নবীজীর উদারতা ও মহানুভবতার হাকডাক পড়ে গেল। সবাই বুঝল ধন-দৌলত বা রাজ্যের জন্য তিনি ইসলাম প্রচার করছেন না। আল্লার ধর্ম প্রচারের জন্যই এত দুঃখ, এত কষ্ট তিনি সহ্য করছেন। শুধু নিজের ভালোর জন্যই নয়, মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য, অনেক দূর দেশের লোকেরাও তার কাছে আসতে লাগল। তার মুখের মধুর মধুর কথা শুনতে লাগল। তাঁর ও অন্য মুসলিমদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা দেখে তারা মুগ্ধ হতে লাগল।

কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের এমন কিছু শত্রু ছিল, যারা এসব দেখে খুব ক্ষেপে গেল। তাদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এখন যেমন আরব দেশগুলোর উন্নতি দেখলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল জ্বলেপুড়ে মরে যায়, তেমনটি আর কি! ইসরাইল যেমন আরবদের ধ্বংস করার জন্য সবসময় ফন্দি খুঁজে, তেমনি তারাও ফন্দি খুঁজছিল। হাওয়াজেন ও সাকীফ নামে দু'টি গোত্র এ ব্যাপারে মিলিতভাবে শলা-পরামর্শ করলো। কিছুতেই তারা মুসলিমদের উন্নতিকে আর বাড়তে দেবে না– এই সিদ্ধান্ত নিলো। দু'গোত্রের বড় বড় সর্দাররা গরম গরম বক্তৃতা করল। সবাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করল। বক্তৃতার পর তারা ঠিক করল যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এজন্য তারা একজন নামজাদা সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করল।

নবীজী একথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু উপায় কি ? চুপ করে বসে তো আর থাকা যায় না। বসে থাকলে শত্রুরা তো আর বসে থাকবে না। তারা তো সব রকমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নবীজী সকলের সাথে পরামর্শ করলেন। সকলে মোকাবিলা করার পরামর্শ দিলো। সিদ্ধান্ত হলো এদের মোকাবিলা করা হবে।

দেখতে দেখতে দু'পক্ষের মধ্যে খুব যুদ্ধ বেধে গেল। যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হলো সে জায়গাটার নাম ছিল হোনায়েন। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুরা হঠাৎ পাহাড় থেকে এলোপাতাড়িভাবে তীর নিক্ষেপ করছিল। মুসলিমরা প্রস্তুত ছিল না। এতে বিচলিত হয়ে অনেকে ময়দান ত্যাগ করেছিল, কিন্তু পরে আবার ফিরে এসে বীরের মতো লড়াই করলেন। শত্রুরা পরাজিত হলো। অনেকে পালিয়ে তায়েফ নামক জায়গায় আশ্রয় নিলো। নবীজী তার অনুসারীদের নিয়ে তায়েফ নগরীর চারদিক থেকে অবরোধ করলেন। শত্রুরা একটি মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েকদিন অবরোধ করে রাখার পর নবীজী যখন বুঝলেন, তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন।

নবীজী না হয়ে অন্য কোনো সেনাপতি হলে দুর্গে আক্রমণ করে তাদের কচু কাটা করতো। কিন্তু নবীজীর মনে কোনো হিংসা বা বিদ্বেষ ছিল না। তিনি দুর্গ আক্রমণ করলেন না। ভুল বুঝে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য অবরোধ করে রেখেছিলেন মাত্র। কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। অবরোধ তুলে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

www.nagorikpathagar.org

করলেন, হে আল্লাহ সাকীফ গোত্রকে সুপথ দেখাও এবং আমার কাছে আসার সৌভাগ্য দান করো। সাকীফ গোত্রের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। শত্রুর কল্যাণের জন্য কেউ কি আবার দোয়া করে! সবাই তো শত্রুর ধ্বংস কামনা করে! আর নবীজী শত্রুর কল্যাণ কামনা করছেন! শুধু এই যুদ্ধে নয়, নবীজী জীবনে বহুবার এমনি শত্রুদের কল্যাণ কামনা করেছেন। বড় হলে তোমরা তা আরো জানতে পারবে।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে নবীজী এমন উদারতা দেখাতেন কেন? আর এই ধরনের মহত্ত্ব উদারতা দেখিয়ে ইসলামের কি কোনো লাভ হয়েছিলো?

প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো, 'ক্ষমা' আল্লাহ্তায়ালার একটি অতি বড় গুণ। যে এই গুণের চর্চা করবে, তাঁর মধ্যে আল্লাহতায়ালার অন্যান্য মহৎ গুণেরও সমাবেশ ঘটবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, যে ক্ষমা করে, সে আমার বন্ধু হয়। নবীজী তো আল্লাহর বন্ধু। সে হিসেবে তিনি সব সময় ক্ষমা করেছেন, উদারতা দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব তো তোমরা জানই। নবীজীর মহত্ত্বের ও উদারতার কারণেই তো দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

কবিগানের প্রতিযোগিতা

কবিগানের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। দিন দিন এ সবের চর্চা এখন উঠে যাচ্ছে। শহরে এসব না থাকলেও পাড়াগাঁয়ে এখনও আছে। বেশ মজার ব্যাপার। সারারাত ধরে চলে কবিতার লড়াই। দু'পক্ষের দু'জন স্বভাব কবি থাকেন। স্বভাব কবি হলেন তারা, যারা লেখাপড়া শিখে কবি হন না। প্রকৃতিগতভাবেই তাদের মধ্যে কাব্যগুণ থাকে। তারা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ছন্দের মাধ্যমে কথার জবাব দিতে পারেন। কবিতা দিয়ে একে অন্যের প্রশ্নের জবাব দেন। কোনো কোনো সময় একাধিক কবিও থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা কবিতা দিয়ে প্রশ্ন এবং কবিতা দিয়েই তার জবাব দেন। কোনো কবিতাই আগে বানানো থাকে না। সব কবিতাই কবিরা আবৃতি করতে করতে রচনা করেন। এভাবে যে কবির কবিতার ছন্দ এবং তার বিষয়বস্তু ভালো হয়, সে জয়ী হয়।

পূর্বে পাড়ায় পাড়ায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা চলত। লোকেরা টাকার বিনিময়ে কবিদের নিয়ে আসত। এতে যেমন অনাবিল আনন্দ পাওয়া যেত, তেমনি কবিতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই জানা যেত। এসব কবিরা সবাই শিক্ষিত ছিলেন, এমন না। অনেকে নিজের নামও সই করতে পারত না। কিন্তু লড়াইয়ের খাতিরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক খবর তারা জেনে নিতেন। সেসব জ্ঞান তারা কবিতার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। পাড়াগাঁয়ে ফসল কাটার পর নবান্নের সময় এসব আনন্দ উৎসব হতো। আজকাল প্রয়োজন পরিমাণ ফসলও চাষির ঘরে আসে না, এসব আনন্দ-উৎসবের আয়োজনও তেমন আর হয় না।

শুধু আমাদের দেশে নয়। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এই কবিগানের প্রচলন ছিল এবং এখনো কিছু কিছু দেশেও আছে। আরবে ছিল। নবীজীর যুগে বিভিন্ন গোত্র এ ধরনের কবিগানের আয়োজন করত। তারা শুধু নিজেদের বংশগৌরব ও কীর্তিগাথা প্রকাশ করত। সকল গোত্রের কবিরাই বলত, তারাই শ্রেষ্ঠ, মানুষের কল্যাণে তাদের অবদানই বেশি। আমাদের নবীজী বংশ গৌরব এবং অহঙ্কার মোটেই পছন্দ করতেন না, তা তো তোমরা জানই। তবু একবার বনী তামীম নামে একটি গোত্র কবিগানের প্রতিযোগিতা করার জন্য নবীজীর কাছে হাজির হয়েছিল। সে গল্পই এখন তোমাদের শুনাব।

আমাদের নবীজী তখন মসজিদে। তারা সেখানে এসেই হাঁক-ডাক শুরু করল এবং কোনো রকম ভদ্রতা না করে ডাকতে লাগল : মুহাম্মদ, বাইরে আসো। যখনকার ঘটনা তখন আরব দেশে নবীজী সবচেয়ে বড় জাতির নেতা। মক্কা-মদীনাসহ আশপাশের সকল এলাকা মুসলিমদের অধীনে। আমাদের নবীজী ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার। মুসলিমদের ভয়ে অন্যান্য জাতি ও দেশ কম্পমান। সেই সময় তারা আমাদের নবীজীর সাথে এ ধরনের দুর্ব্যবহার করে বসল। নবীজী মসজিদ থেকে হাসিমুখে বের হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি চায়। তারা বলল : 'আমরা কবিতা ও বক্তৃতা দ্বারা আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করতে এসেছি।' নবীজী হাসলেন এবং কি যেন ভাবলেন। নবীজী জানেন, এরা শুধু নিজেদের গৌরব এবং অহঙ্কারের কথাই শোনাবে। যা বলা এবং শোনা, কোনোটাই সঠিক নয়। তবু তিনি কি মনে করে যেন রাজি হলেন।

ওদের বক্তা দাঁড়িয়ে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলল। যার সারসংক্ষেপ হলো : 'আমরা বাদশা।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অনেক ধন-দৌলত আছে। দুনিয়ার মানুষ আমাদের সম্মান করে। আমাদের সমান আর কেউ নেই' ইত্যাদি। ওদের বক্তৃতা শেষ হলেই আমাদের নবীজী একজন সাহাবীকে কিছু বলতে বললেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি এই সৌর জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু তার আদেশেই কাজ করছে। চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, সবই তাঁর নির্দেশ মতো নিজ নিজ কাজ করে চলেছে। তাঁর দয়া ও আদেশ ছাড়া কোনো কিছু হয় না। তাঁর রহমতে আমরা দুনিয়ার সেরা মানুষকে আমাদের নবী হিসেবে পেয়েছি। দেশ পেয়েছি। এই নবী সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, জ্ঞানী ও গুণী। তাঁর ওপর আল্লাহ কিতাব নাজিল করেছেন। দুনিয়ার সকল মানুষকে সত্য, সহজ ও সরল পথ দেখাবার দায়িত্বও তাঁর ওপর দিয়েছেন। তিনি সকল মানুষকে সত্যের দিকে আহবানও করেছেন। আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি। তাঁর আহবানে আমরা যুদ্ধ করি এবং অকাতরে জীবন দান করি।

এবার কবিতার পালা। ওদের কবি সুর করে ছন্দ করে নিজেদের গৌরব গাথা প্রচার করল। তার কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে নবীজী ইসলামী কবি হাস্‌সানকে জবাব দেয়ার আহবান জানালেন। তিনি মুসলিমদের পরিচয় এইভাবে তুলে ধরলেন :

"তারা পবিত্র, তাদের পবিত্রতা কুরআনে বলা আছে!
তারা লোভে পড়ে না;
লোভ-লালসা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না;
তারা ধন-দৌলত প্রতিবেশীকে দান করে;
মোটেও কৃপণতা করে না।
তাই লালসার উপকরণ,
তাদেরকে লালসার মধ্যে ফেলতে পারে না।"

সবশেষে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন এই বলে :

"যখন, স্থান ও সমাজ ভেদে
মানুষের আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন,
তখন কর্তব্য-
আল্লাহ যাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর দলের
সম্মান ও তাঁবেদারি করা।"

ওরা অবাক হয়ে গেলো। এত সুন্দর সুন্দর কথা! এত চমৎকার ছন্দ! কী বক্তৃতায়, কী কবিতায় ওরা এত উন্নতি করলই বা কী করে? এসব নিশ্চয়ই মানুষের কথা নয়—মানুষের কথা হলে এমন সাজানো গোছালো হতো না। এসব নিশ্চয়ই আল্লাহর কথা। আল্লাহ তাদের এসব শিখিয়েছেন। তাদের সর্দার দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন :

'নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্য পাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাঁর বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম, নিশ্চয়ই তাঁর কবি আমাদের কবির থেকে উত্তম।'

কবি গানের প্রতিযোগিতায় এসে তারা পরাজিত হলো। নবীজী ও তার সাথীদের ব্যবহারে এবং গুণে তারা মুগ্ধ হলো। তারা আমাদের নবীজীকে সত্য নবী এবং তাঁর ধর্মকে সত্য ধর্ম বলে মেনে নিলো।

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থবিরোধী সন্ধি

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার পর আমাদের নবীজী আশপাশের সকল দেশের রাজা-বাদশাহকে ইসলামের আহ্বান জানালেন। তিনি সকলকে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখলেন। তোমাদের বড় ভাই-বোন তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলে সেভাবে চিঠি লিখেন : দুষ্টামি করো না, কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না, ভালোভাবে লেখাপড়া করো, ভালো হয়ে চলো ইত্যাদি। অনেকটা সে রকম চিঠি আর কি ! আমাদের নবী অবশ্য তাদেরকে ছোট ভাই মনে করে উপদেশ দিতেন না। বন্ধুর মতো তাদের ভালোর জন্য সত্য কথাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি কোনো মানুষকেই ছোট মনে করতেন না। তিনি শুধু রাজা-বাদশাহকে চিঠি দিতেন এমন নয়। অন্যান্য ধর্মের নেতাদের কাছেও চিঠি দিতেন। তেমন একটি ঘটনার কথাই বলি।

আমাদের নবীজী নাজরানের খ্রিষ্টানদের কাছে একটি চিঠি লিখেন। চিঠি পেয়ে খ্রিষ্টানদের বড় পাদ্রী খ্রিষ্টানদের ডাকলেন। সব পাদরী বললেন, এই ব্যক্তি সত্য নবী হতে পারে। অনেক কথাবার্তার পর ঠিক হলো, একদল খ্রিষ্টান মদীনায় যাবে। তারা সব খবরাখবর নিয়ে আসবে। তারা ফিরে আসলে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। কথামতো ষাটজনের একটি দল মদীনায় হাজির হলো। তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন। তারা আমাদের নবীর সাথে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। অনেক কিছু মেনে নিলেন। কিন্তু 'হযরত ঈসা যে আল্লাহর ছেলে নন'– এটা তারা মানতে রাজি হয় না। তখন ঠিক হলো উভয় দলই নিজেদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে খোলা মাঠে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, 'যারা ভুল পথে আছে তারা যেন ধ্বংস হয়।' এটা মীমাংসার একটা রীতি। আরবীতে একে 'মোবাহালা' বলে।

কথামতো পরদিন আমাদের নবী তাঁর অতি আদরের মেয়ে ফাতেমা, তার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন এবং তাঁদের বাবা হযরত আলীকে নিয়ে খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালেন। নবীজীর দৃঢ়তা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা বুঝল ইনি নিশ্চয়ই সত্য নবী। তারা খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল না। পরাজয় স্বীকার করে নিলো। তারা বলল, "আমরা আপনার সাথে সন্ধি করব। সন্ধির শর্ত আপনি ঠিক করে দেবেন।"

মোবাহালায় যোগ না দিয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। নবীজী ইচ্ছা করলে তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। আরবে তখন এই নিয়মই ছিল। কিন্তু নবীজী তা করলেন না। সন্ধির শর্তে নিজের বা নিজের ধর্মের স্বার্থে তিনি কিছুই লিখলেন না। লিখলেন: 'তারা যে অবস্থায় আছে। সে অবস্থায় থাকবে। অর্থনীতিসহ তাদের সমস্ত অধিকার এবং তাদের ধর্ম অক্ষুণ্ন থাকবে।

তারা অবাক হয়ে গেল। এ আবার কেমন শর্ত। ইসলামের স্বার্থে তো কোনো কথাই নেই। বরং যা কিছু লেখা আছে তা তো বিধর্মীদের স্বার্থে। তবে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন কেন ? খ্রিষ্টানরা বুঝলেন, বেকায়দায়

www.nagorikpathagar.org

ফেলে বা কৌশলে তিনি কাউকে তার ধর্মে আনতে চান না। তারা মুগ্ধ হলো। বিদায়কালে তারা তাদের জন্য একজন মুসলিম বিচারক চাইল। নবীজী তাদের দাবি পূরণ করলেন।

কি অদ্ভুত ব্যাপার তাই না! খ্রিষ্টানরা নিজেদের জন্য মুসলিম বিচারক নিযুক্ত করল। তারা বুঝেছিল, কোনো মুসলিম অন্যায় বিচার করবে না। অন্যায়ভাবে কারো পক্ষে যাবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার-আচার করবে। কেননা, একজন খাঁটি মুসলিম আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহতায়ালা সব কিছু দেখছেন, সব কিছু জানছেন। তাঁকে ফাঁকি দেয়ার কোনো উপায় নেই। দুনিয়াতেই তিনি কোনো অন্যায়ের বিচার করতে পারেন, আবার আখেরাতের চরম বিচারের সম্মুখীন করতে পারেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সকল শাস্তির সামনে ঠেলে দিতে পারেন। যে শাস্তির কোনো তুলনা হয় না। আর সবাইকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর চরম বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি সকল বিচারকেরও বিচারক। দুনিয়ার বিচারকরা কোনো ভুল-ভ্রান্তি করলে, আল্লাহর বিচার থেকে সেই বিচারকও রেহাই পাবেন না। তাই তারা বিচারক চেয়ে নিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসঘাতকের প্রতি

আমাদের নবীর সাথে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা সবসময় তাঁর সাথে থাকতেন, উঠতেন-বসতেন, নামাজ পড়তেন, যুদ্ধে যেতেন তাঁরা সবাই যে নবীজীর খুব ভক্ত ছিলেন এমন নয়। বেশিরভাগ লোকই তাঁর ভক্ত-অনুসারী ছিলেন। তাঁরা নবীজীর জন্য এবং আল্লাহর ধর্মের জন্য জানমাল সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলেন যারা নবী, ইসলাম এবং মুসলিমদের দলে থেকে তারা সব খবরা-খবর দুশমনদের কাছে পৌঁছাত। মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজের শেষ ছিল না। খুব সাবধানে থেকে তারা এসব দুশমনি করত—পাছে কেউ টের পায় এই ভয়ে। কারণ তারা ধারণা করত, যদি এই ষড়যন্ত্র কখনো ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে তাদের অবশ্যই হত্যা করা হবে।

একদিনের ঘটনা। নবীজী তখন মদীনায়। একজন আনসার ও একজন মোহাজেরের মধ্যে রাস্তায় কোনো কারণে ঝগড়া বেধে গেল। 'আনসার' আর 'মোহাজের' সে আবার কি—তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে? গল্প বলার আগে সেটাই বুঝে নেয়া যাক। যারা নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় যেয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, আমরা তাদের বলি বাস্তুহারা। এই বাস্তুহারাকে আরবীতে 'মোহাজের' বলে। আর এই বাস্তুহারা বা মোহাজেরদের যারা আশ্রয় দেয়, তাদেরকে বলা হয় 'আনসার'। আনসার মানে সাহায্যকারী । বাস্তুহারাদের তারা সাহায্য করে বলেই তাদেরকে 'আনসার' বলা হয়। এমনিভাবেই মক্কা থেকে যারা মদীনায় গিয়েছিলেন তারা ছিলেন 'মোহাজের'। আমাদের নবীও ছিলেন একজন মোহাজের। অপরদিকে মদীনায় যেসব লোক মক্কাবাসীদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাদের বলা হয় 'আনসার'। আমাদের দেশেও কিন্তু অনেক মোহাজের আছেন। যারা উর্দু ভাষায় কথা বলে অথবা ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলে, তারাই মোহাজের। অনেক আগে এদেশ যখন ভারত থেকে ভাগ হয়, তখন তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে এদেশে আসে। তারা সবাই ছিল মুসলিম। আমাদের দেশের মুসলিমরাও তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু আশ্রয় নয়, নানাভাবে তাদের সাহায্য করেছিল। মদীনার মুসলমানরা যেমন মক্কার মুসলিমদের জন্য করেছিল ঠিক তেমনি। যাক আসল কথায় আসি। বলছিলাম একজন আনসার ও মোহাজেরের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল। ওদের ঝগড়া দেখে নবীজী খুব দুঃখ পেলেন এবং বললেন : 'আশ্চর্য, ইসলাম গ্রহণের পরও তোমরা অন্ধকার যুগের মতো ঝগড়া করছ।' দু'জনকে বুঝিয়ে তিনি ঝগড়া মিটমাট করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

যারা মুসলিম হওয়ার ভান ধরেছিল, তাদের নেতা আবদুল্লাহ পাশেই বসেছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক সুযোগ বুঝে বলে বসল : "মদীনার লোকেরা একদম বোকা। তারা মক্কার লোকদের আশ্রয় এবং আশকারা দিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এবার মদীনায় যেয়ে এসব দীন-হীন বাস্তুহারাকে অবশ্যই বের করে দেবো।" এসব কথা বলার পর সে মদীনার লোকদের সাথে এ ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করল, যে কোনো উপায়ে এবার তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে।

প্রিয় নবী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। শুনে তাঁর সাথীরাও ভীষণ উত্তেজিত হলেন। নবীজীকে তাঁরা বললেন: "এই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করার আদেশ দিন।" নবীজী খুব ধীরে এবং শান্তভাবে বললেন : "না, তা কিছুতেই হতে পারে না। এতে প্রচার হবে যে, মুহাম্মদ (সা.) তার সঙ্গীদের হত্যা করে।"

আবদুল্লাহ যখন শুনতে পেল নবীজী তার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছেন, তখন সে ও তার সাথীরা খুব ভয় পেয়ে গেল। তারা তাড়াতাড়ি নবীজীর সামনে হাজির হয়ে সব অস্বীকার করল। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলল: "এমন চিন্তাও কি কখনো করা যায়!"

আবদুল্লাহর ছেলে খাঁটি মুসলিম ছিলেন। তিনি ঘটনা জানতে পেরে নবীজীর সামনে এসে বললেন : "প্রিয় রাসূল, জানতে পারলাম আমার আব্বা এমন কিছু বলেছেন বা করেছেন, এসব যদি সত্য হয় আর আপনি যদি তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজ হাতে তার মাথা কেটে আপনার সামনে হাজির করি।"

এত বড় ষড়যন্ত্রকারী, এত বড় বিশ্বাসঘাতককে কেউ কি রেহাই দিত ? নিশ্চয়ই না! আবদুল্লাহর ছেলের কথা শুনে নবীজী শান্তভাবে বললেন : "না! তা হয় না। সে যখন আমাদের সাথে আছে বলে বলছে, তখন তার সাথে আমরা নম্র ব্যবহার করব। এ অবস্থায় অন্য কিছুই আমরা করতে পারি না।"

নবীজী এবং তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাসঘাতকদের চিনতেন। ইচ্ছা করলে এদের সবাইকে যে কোনো সময় হত্যা করতে বা শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু নবীজী তা করতে দেননি। তাদের প্রতি তিনি সব সময় সদয় ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেছেন ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যে একদিন না একদিন তারা আকর্ষিত হবে। তার আগে তাদের স্বাধীনভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। তাছাড়া ইসলামের নিজের শক্তিকে তিনি অনেক বড় বলে মনে করতেন। যে কারণে তাঁর ধারণা ছিল, বিশ্বাসঘাতক বা মোনাফেকরা ষড়যন্ত্র করে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের মতো বয়সে

তোমাদের মধ্যে অনেকে এবং তোমাদের বড় ভাইরা ক্লাব, পাঠাগার, সমিতি নিয়ে কত না ব্যস্ত থাকে। কেউ খেলাধুলা করার জন্য সমিতি করতে ভালোবাস। কেউবা সাহিত্য, গান, নাটক এসবের জন্য সমিতি করতে পছন্দ করো। কেউবা দুঃখী মানুষের সেবা করার জন্য সংঘবদ্ধ হও। এইভাবে সারাদেশে কত সংঘ, সমিতি, সংসদ, পরিষদ ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। তোমাদের মতো বয়সের ছেলে-মেয়েরাই সারা দুনিয়ায় এ ধরনের অগণিত সংঘ, সংগঠন কায়েম করে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ কাজের ফলে কত মায়ের মুখে হাসি ফুটছে, কত ভাই উৎসাহিত হচ্ছে, কত জনের দুঃখ দূর হচ্ছে– কে তার হিসাব রাখে! কিন্তু হিসাব না রাখলে কি হবে, এই সব সংঘ, সমিতি মানবতার জন্য, সভ্যতার জন্য, মানুষের জন্য নীরবে যে কাজ করে যাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশ গরিব দেশ। অনেক মানুষ এখনো দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। কাপড় পরতে পারে না। রোগে ওষুধ পায় না। এরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কষ্ট পায়, গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের সাহায্যের যে কত প্রয়োজন, তা তো তোমরা বুঝতেই পারছ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জান? আমাদের দেশে সংঘ, সমিতি যেগুলো আছে, সেগুলোর বেশিরভাগই গান, নাটক, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। এগুলোর প্রয়োজন যে নেই, তা নয়। এসবেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে সেবামূলক সমিতির সংখ্যা যদি আরও বেশি হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। অবশ্য এর জন্য কিন্তু তোমরা দায়ী নও। আমরা বড়রাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তোমরাতো স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য, গান, নাটক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাইবে, থাকাটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লেখাপড়ার পর আনন্দদায়ক এসব কিছু তোমাদের ভালো লাগবে–তোমরা চাঁদা করে ফুটবল কিনতে চাইবে, নাটক-বিচিত্রা অনুষ্ঠান করতে চাইবে, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু তোমাদের যদি আমরা গরিব-দুঃখী মানুষের কাজে লাগাতে পারতাম, তাহলে কত ভালো হতো। তোমরাও খুশি হতে পারতে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে কত আনন্দ যে লাগে তা তো নিশ্চয়ই তোমরা জানো।

যে ভিক্ষুক মাত্র একটি টাকা চায়, তাকে যদি তুমি পাঁচটি টাকা দাও, তাহলে সে কত খুশি হয়, তার মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা তো নিশ্চয়ই দেখেছ। এমন ঘটনা তোমাদের জীবনে দু-একবার যে ঘটেনি, এমন তো নয়। ঐ আনন্দ, খেলার প্রতিযোগিতায় শিল্ড কাপ পাওয়ার আনন্দের চেয়েও নিশ্চয়ই অনেক বেশি মনে হয়। কেমন তাই না? অথচ এই আনন্দ দেয়া এবং নেয়ার চেষ্টা আমরা সবাই ভুলে থাকি। আমাদের কাজ-কর্মে, ধ্যান-ধারণায় কখনই তাদের কথা মনে আসে না। ঈদের সময় অথবা শবেবরাত, শবেকদর-এর দিনে শুধু আমরা ওদের স্মরণ করি। এই সব দিনে দু-একটা রুটি বণ্টন করি, দু-চার টাকা দান-খয়রাত করি। তারপর আবার সব কিছু ভুলে যাই। আমরা কেউ চিন্তা করি না, সারাটি বছর ধরে

www.nagorikpathagar.org

ওরা কি খায়, কি পরে, কোথায় ঘুমায়, ওদের ছেলেরা কি করে লেখাপড়া করে, অনেকেই এসবের খবর রাখি না। অথচ কথা-বার্তায়, বক্তৃতা, বিবৃতিতে গরিবের জন্য অনেকে কাঁদে। অনেকেই ওয়াদা মতো কাজ করে না। সবাই আমরা নিজের কথা চিন্তা করি। নিজের সুখ, শান্তি, নিজের ভবিষ্যৎ এগুলো নিয়েই আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে, অন্য কারো কথা আমাদের মনে থাকে না। এভাবেই আমাদের দেশে গরিব আরও গরিব হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী।

তোমরা যদি এখন থেকেই দুঃখী মানুষের জন্য সংঘ, সমিতি গড়ে তুলতে তাহলে এর কিছুটা লাঘব হবে। অন্তত তোমাদের মধ্যে যারা গরিব, যারা স্কুলের বেতন দিতে পারে না, ভালো জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে স্কুলে আসতে পারে না, ঠিকমতো পরীক্ষার ফিস দিতে পারে না, টাকার অভাবে বনভোজনে যেতে পারে না, খেলার সঙ্গী হতে পারে না, বই কিনতে পারে না, তাদের তো অন্তত সবাই মিলে সাহায্য করতে পার। এতে করে তোমাদেরই এক ভাই, এক বন্ধুর অনেক উপকার হয়ে গেল। সবাই মিলে চাঁদা করে কাজটি করতে পারলে কারো গায়ে লাগবে না। খুব সহজেই একটি বড় কাজ হয়ে যেতে পারে।

তোমাদের মতো বয়সে নবীজী তোমাদেরই মতো সমিতি গঠন করেছিলেন। তাঁর সমিতির নাম ছিল 'হিলফুল ফজুল'। আরব দেশে তখনকার সমস্যা সমাধানের জন্যই তিনি এই সমিতি গঠন করেছিলেন। নিছক নিজের আনন্দ বা খুশির জন্য তিনি এই সমিতি গঠন করেননি। তখনকার আরব দেশের অবস্থা কি ছিল, তা তো তোমরা জান। যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি এসব তো লেগেই ছিল। মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ছিল না। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বালাই ছিল না। 'জোর যার মুল্লুক তার'-এই ছিল একমাত্র নীতি। মোটকথা, সমাজে শান্তি বলতে কিছুই ছিল না। এই অবস্থা থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্য নবীজীসহ সমাজের মুরুব্বী শ্রেণিরা বসলেন। চিন্তা-ভাবনা করলেন, তারপর 'হিলফুল ফজুল' নামে সমিতি গঠন করলেন। 'হিলফুল ফজুল' মানে 'ভালো কাজের প্রতিজ্ঞা' অর্থাৎ নবীজীসহ অন্যেরা ভালো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ওয়াদাবদ্ধ হলেন। ব্যাপারটা কত বড় সাংঘাতিক, তাতো তোমরা বুঝতেই পারছো। কেননা যেখানে ভালো বলতে কিছুই ছিল না, সৎ চিন্তাও কেউ করতো না, সবাই যেখানে মন্দের চর্চাই করতো, সেখানে ভালো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করাইতো ছিল বড় কঠিন। সে জায়গায় শুধু ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, একেবারে ভাল ও সৎকাজের প্রতিজ্ঞা। আসলেই বড় শক্ত কাজ। এই প্রতিজ্ঞা করার অর্থ ছিল তারা অনবরত ভাল কাজ করবে, মন্দের বিরোধিতা করবে এবং ধীরে ধীরে সমাজ থেকে সকল প্রকার মন্দ উচ্ছেদ করবে। এর আরও অর্থ ছিল : নিজেরা সৎ হবে, শান্তিপ্রিয় হবে, ভালো হবে এবং সকল প্রকার মন্দ থেকে দূরে থাকবে। বুঝতেই পারছ, কত কঠিন ছিল সেই প্রতিজ্ঞা । তারা পাঁচ দফা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন :

১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করব;

২. পথিকের জান-মালের হেফাজত করব;

৩. গরিবদের সাহায্য করতে থাকব;

৪. মজলুমের সহায়তা করে যাব;

৫. কোনো জালেমকে মক্কায় আশ্রয় দেবো না।

www.nagorikpathagar.org

এবার আমরা যদি এই পাঁচ দফা চুক্তি আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, কত বলিষ্ঠ ছিল নবীজীর প্রতিজ্ঞা। আমরা যখন কোনো কিছু করতে চাই, ওয়াদা করি, তখন বলি চেষ্টা করব, পথ খুঁজে বের করব ইত্যাদি। কিন্তু এখানে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে শপথ নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে কোনো ফন্দি-ফিকির নেই, ছলচাতুরী নেই। আন্তরিক ইচ্ছাগুলো সহজ-সরলভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "অশান্তি দূর করব, "হেফাজত করব", "সাহায্য করতে থাকব", "সহায়তা করে যাব", "আশ্রয় দেবো না।" এসব জায়গায় আমরা হলে বলতাম, "অশান্তি দূর করার চেষ্টা করব।" "আশ্রয় না দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করব" ইত্যাদি। 'হিলফুল ফজুলের' পাঁচ দফা চুক্তির মধ্যে তখনকার সমাজের সকল সমস্যার সমাধান ছিল। আমাদের সমাজের মোটামুটি সমস্যাকে সামনে রেখে তোমরাও এমন সমিতি-সংঘ গড়ে তুলবে কেমন?

তোমরা শুনে অবাক হবে, বুড়ো বয়সেও নবীজী 'হিলফুল ফজুলের' কথা ভুলে যাননি। একবার তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, "এইসব চুক্তির বদলে কেউ যদি আমাকে একটি লাল রঙের উটও উপহার দিত তবুও আমি তা গ্রহণ করতাম না।"

এখন বলত, তোমাদের যদি ঐ ধরনের কাজের বদলে গানের আসরের জন্য কিছু অর্থ দান করা হয়, তাহলে তোমরা কি করবে? একটু ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবে কেমন?

'হিলফুল ফজুল' অসভ্য-বর্বর আরব সমাজে একটা বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল। দস্যু আরব জাতির মনে সামান্য হলেও নতুন চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। মানুষের জন্য মানুষের দরদ, সহানুভূতি, ভালোবাসা থাকা দরকার– অন্তত এ কথাটি নবীজী ঐ সংঘের মাধ্যমে জানাতে পেরেছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্ধর্ষ জাতির মনে দয়ামায়া ও মমতার ক্ষীণতম আলোর শিখা নিশ্চয়ই তিনি জ্বালাতে পেরেছিলেন।

চেষ্টা করলে আমাদের দেশের দুঃখী মানুষের মনে তোমরাও আশা জাগাতে পার, তাদের শুষ্ক-ম্লান মুখে আবার হাসি ফোটাতে পার।

www.nagorikpathagar.org

দোজাহানের বাদশাহ

মহানবীর জীবনের সামান্য কিছু কথা তোমরা জানতে পারলে। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে– এতবড় ধর্মপ্রচারক, এতবড় শাসনকর্তা, এতবড় সেনাপতি কিভাবে জীবন-যাপন করতেন। দুনিয়ার সকল বাদশাহ, সকল শাসনকর্তা যেভাবে চলেছেন এবং এখনও চলছেন, আমাদের নবী সেভাবে চলতেন না। তাঁর কোনো সিংহাসন ছিল না, কোনো বালাখানা ছিল না, ছিল না কোনো আরাম আয়েশের জিনিস। আমাদের দেশে গরিব সাধারণ লোকের বাড়িতে যেসব জিনিসপত্র থাকে তাও তাঁর ছিল না। দেশের গরিব লোকেরা যা খেতে পায়, তাও তিনি পেতেন না। জীবনে বহু দিন না খেয়ে তিনি উপস করেছেন। আমাদের শহরগুলোর রাস্তাঘাটে একশ্রেণির লোক বসবাস করে। এদের বলা হয় 'ভাসমান জনতা'। এদের কোনো সহায়-সম্বল নেই। থাকার মধ্যে দু-একটি হাঁড়ি- দু-একটি কাঁথা-এই তাদের সম্বল। কিছু পেলে তারা খায়, না পেলে চুপচাপ থাকে। নবীজীর অবস্থা ছিল তাই। নবীজীর সম্বল বলতে তেমন কিছু ছিল না। তবে তিনি ভাসমান মানুষ ছিলেন না। তাঁর থাকার জায়গা ছিল। ইচ্ছা করলে ভালো খেতে, পরতে এবং থাকতে তিনি পারতেন। কিন্তু গরিব অসহায় মুসলিমদের জন্য এমনকি বিধর্মী অসহায়দের জন্য বিলানোর পর তাঁর কাছে আর কিছুই থাকতো না। যা পেতেন তাই প্রতিদিন বিলিয়ে দিতেন। সময় সময় ধার-কর্জ করে চলতেন। হযরত বেলাল (রা.) তাঁর সংসার দেখাশুনা করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন : "প্রিয়নবীর কাছে অর্থ, সম্পদ বা খাদ্যসামগ্রী কোনো কিছুই জমা থাকত না। কোনো মানুষ উপবাসে থাকলে তিনি আমাকে বলতেন। আমি কারো কাছ থেকে ধার করে এনে খাওয়াতাম। কাপড়-চোপড় নেই এমন কেউ এলে, তিনি আমাকে বলতেন। আমি ধার করে তাকে কাপড় দিতাম। প্রায়ই এ রকম হতো।"

বিধর্মীরা তাঁর অবস্থা জানত। তারা তাঁকে জব্দ করার জন্য ধার-কর্জ দিত। তারা মনে করত, সময়মতো ধার শোধ করতে না পারলে তাঁর ওপর আচ্ছামতো নির্যাতন চালানো যাবে। ধার-কর্জের জন্য অনেকে তাঁকে বকাবকি করত। একদিনের ঘটনা শোনো :

এক বিধর্মী নিজের ইচ্ছায় নবীজীকে ধার-কর্জ দিত। মাস তখনও শেষ হয়নি। তার দেয়া ধার শোধ করার তখনও চার দিন বাকি। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিতে উঠেছেন, এমন সময় সে লোকজনসহ এসে গালাগালি ও বকাবকি করতে লাগল এবং বলতে লাগল : সময়মতো ধার শোধ করতে না পারলে তোমাকে আমরা গোলাম বানাব। তোমাদের নবীকে অপমান করব। গালাগলি করতে করতে সে চলে গেল। হযরত বেলাল (রা.) খুব চিন্তায় পড়লেন। মনে খুব কষ্ট পেলেন। ভাবলেন, আহা! নবীজীকে এই লোকটি অপমান করবে! মনে হতেই তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সারাদিন তিনি অস্থির অবস্থায় কাটালেন। রাতে তিনি নবীজীকে সব কথা খুলে বললেন। নবীজী চুপ করে থাকলেন। বেলাল (রা.) তখন বললেন : "আপনার কাছে তো কিছুই নেই। খুব তাড়াতাড়ি আপনার কিছু টাকা-পয়সা হবে তারও

www.nagorikpathagar.org

তো কোনো আশা দেখছি না। অথচ টাকা না পেলে লোকটি যে অপমান করবে। তার চেয়ে আমি বরং কোথাও চলে যাই। আপনার হাতে টাকা-পয়সা এলে ফিরে এসে আমি তার ধার শোধ করে দেবো।" কথাগুলো বলে বেলাল (রা.) চলে এলেন। সারারাত জেগে থাকলেন, ছটফট করলেন। প্রিয় নবীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে–এই চিন্তায় তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভোর হতেই নবীজী তাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখেন, তার সামনে চারটি উট বোঝাই মালপত্র। তিনি বললেন : বেলাল, খুশির সংবাদ শোন, আল্লাহ তোমার সমস্ত ধারকর্জ শোধ করার জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন।

হযরত বেলাল (রা.) আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। তারপর খুব খুশিমনে ঘুরে ঘুরে সবার ধার-কর্জ শোধ করে ফিরে আসলেন। নবীজী তখনও মসজিদে অপেক্ষা করছেন। বেলাল (রা.) ফিরে আসার পর নবীজী বললেন: "ধার শোধ করার পরও কি তোমার কাছে মালপত্র রয়ে গেছে ?" বেলাল (রা.) বললেন : "জি-হ্যাঁ কিছু রয়ে গেছে।" নবীজী বললেন : "তাহলে সেগুলো বন্টন করে দাও। সব জিনিস বন্টন না করা পর্যন্ত আমি বাড়ি যাব না।" সারাদিন গেল। বেলাল (রা.) সারাদিনই বিতরণ করলেন। রাতে এশার নামাজের পর নবীজী আবার জিজ্ঞেস করলেন : "সব জিনিস বন্টন করা হয়েছে তো?" বেলাল (রা.) বললেন : জি-না, এখনও কিছু বাকি রয়েছে। সব সাহায্য প্রার্থী এখনও আসেনি। এলে শেষ হয়ে যাবে"। নবীজী বললেন : "ঠিক আছে বন্টন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মসজিদেই থাকব। বাড়ি যাব না।" নবীজী সেদিন মসজিদ থেকে আর বাড়ি ফিরে গেলেন না। পরদিনও সারাদিন বসে রইলেন। বেলাল (রা.) সারাদিন ধরে জিনিসপত্র বিলালেন। আবার এশার নামাজের পর নবীজী বেলাল (রা.) কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : "এখনও কি কিছু রয়ে গেছে ?" বেলাল (রা.) বললেন : 'জি-না সব শেষ হয়ে গেছে; নবীজী আল্লাহর লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করে বাড়িতে গেলেন।

প্রিয় নবী ঘুমাতেন কিসের ওপর জান? শোন তাঁর অন্যতমা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) কি বলেছেন : খেজুর পাতার ছালাভরা একটি চামড়ার বিছানায় তিনি ঘুমাতেন। আরেকজন স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) বলেছেন : একটি ছালার বিছানা ছিল। তাই দু'ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম। শীতের দিনে এক ভাঁজ গায়ে দিতেন।

নবীজী যেদিন ইন্তেকাল করেন তার আগের দিন রাতে ঘরে বাতি জ্বালানোর তেল ছিল না। তেল ধার করে বাতি জ্বালানো হয়েছিল। নবীজীর যুদ্ধের পোশাক সামান্য কিছু আটার জন্য এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল।

এই ছিলেন দোজাহানের বাদশা। এই ছিল তাঁর জীবনযাপন!

www.nagorikpathagar.org

উৎসবমুখর দিনে

ঈদের দিন। চারদিকে হৈ চৈ। তোমরা যেমন হৈ চৈ করো। কিন্তু এই হৈ চৈ-এর মধ্যে কত শৃঙ্খলা। ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী, বয়স্ক-বৃদ্ধ-সবাই ঈদের জামাতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মদীনার লোক যেন দলে দলে রাস্তায় নেমে পড়েছে। সবার উদ্দেশ্য মসজিদের নববীর দিকে। কত রঙ-বেরঙয়ের জামা-কাপড় পরে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মদীনা যেন আনন্দে হাসছে। সবচেয়ে ভালো লাগছে কি জান, তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েরা মহা আনন্দের সাথে দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের লম্বা-ঢিলা জামা, সুবাসিত রুমালের আন্দোলনে এবং কিচির-মিচির আওয়াজে সমস্ত পরিবেশ যেন আন্দোলিত হচ্ছে।

পুরুষরা আগে, মেয়েরা পরে, ছেলে-মেয়েরা তারও পরে, এভাবে সাজানো হলো নামাজের কাতার। ধীরে সুস্থে নামাজ শেষ হলো। নামাজের পর নবীজী কিছু কথা বললেন। সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁর কথা শুনছে। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরাও টুঁ-শব্দটি করল না। সবাই মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনল। তিনি যে সবার আপনজন। বক্তৃতা শেষ হলে বুকে বুক লাগানো, তারপর অন্য রাস্তা ধরে যার যার বাড়ির পথে রওনা। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা দৌড়া-দৌড়ি হাসি-ঠাট্টায় ডুবে গেল। ঘরে ফেরার পথে নবীজী খবর পেলেন একটি গরিব ছেলে মসজিদের এক কোণে বসে কাঁদছে।

নবীজী তার কাছে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন একটা হালকা পাতলা ছেলে, পরনে তার শত ছিন্ন কাপড়। মসজিদের কোণে বসে দু'হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদছে। নবীজী শান্তভাবে তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁদছ কেন বাবা ?"

ছেলেটি ক্ষোভের সাথে নবীজীর হাত এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমাকে একা থাকতে দিন। আমি আল্লাহকে ডাকব।"

নবীজী তার চুলে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দরদমাখা কণ্ঠে আবার বললেন, "তোমার কি হয়েছে আমার কাছে বলো বাবা ?"

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "নবী মুহাম্মদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়েছেন। আমার মা অন্য জায়গায় বিয়ে বসেছেন। আমার সব সম্পত্তি অন্যদের দখলে। আমি মায়ের সাথে তার নতুন সংসারে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ অন্য ছেলেরা নতুন নতুন জামা কাপড় পরে হাসছে, খেলছে, কিন্তু আমি? আমার না আছে খাবার, না আছে পোশাক, আর না আছে আশ্রয় লাভের কোনো ব্যবস্থা!

www.nagorikpathagar.org

নবীজীর চোখ থেকে দরদর করে পানি পড়ছিল। কিন্তু তিনি হাসতে চেষ্টা করে বললেন, "তাতে কি হয়েছে বাবা, আমিও শৈশবকালে আমার বাবা-মাকে হারিয়েছি।"

ছেলেটি নবীজীর দিকে তাকালো। তাকিয়ে চিনতে পারল এবং খুব অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। নবীজী শান্ত কণ্ঠে বললেন, "বাবা, আমি যদি তোমার বাবা হই, আয়েশা যদি তোমার মা এবং ফাতেমা যদি তোমার বোন হয়, তাহলে কি তুমি সুখী হবে?"

ছেলেটি মাথা নিচু করে থাকল।

নবীজী হাত ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং আয়েশা (রা.) -কে ডেকে তাকে গোসল করালেন। পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন। আর উত্তম পোশাক পরিয়ে বললেন, বাবা, এখন বাইরে গিয়ে অন্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করো। খেলাধুলার পর আবার ফিরে এসো।

ছেলেটি খুশি মনে ময়দানের দিকে চলল। অন্য ছেলেরা তার হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা তার চারপাশে জড়ো হয়ে তার এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ছেলেটি তাদের কাছে সবকিছু খুলে বললো। তাদের মধ্যে একজন খুব বিষাদ কণ্ঠে বলল, "কি মজাই না হতো, আজ যদি তার মতো আমাদের পিতাও মারা যেতেন!"

অর্থাৎ প্রিয় নবীর মতো পিতা বা অভিভাবক পাওয়া গেছে- এর চেয়ে বড় কিছু আর কি পাওয়ার আছে! দেখেছ, শিশুরাও নবীজীকে কত ভালোবাসত এবং কত ভালো জানত! অথচ শিশুদের এই বড় বন্ধু সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব জানায় না।

www.nagorikpathagar.org

পিতার স্নেহ

আমাদের নবীজীর সাতজন ছেলে-মেয়ে ছিল। এদের মধ্যে তিনজন ছেলে ও চারজন ছিলেন মেয়ে। বড় ছেলের নাম ছিল কাসিম। কাসিম দুই বছর বয়সে, মেঝো ছেলে আবদুল্লাহ শৈশবে এবং ছোট ছেলে ইব্রাহিম ষোল মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। চার মেয়ের নাম ছিল জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.)। ফাতিমা ছাড়া আর সব ছেলে-মেয়ে নবীজীর জীবিতকালে ইন্তেকাল করেন। দুনিয়ার সকল মা-বাবার মতো নবীজীরও অপরিমেয় পিতৃস্নেহ ছিল। তাদের সুখে তিনি সুখী হতেন, তাদের দুঃখে তিনি দুঃখী হতেন। তাদের কল্যাণ চিন্তায় মাঝে মাঝে তিনি বিচলিত হয়েছেন। তাদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা প্রদান ও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সাধ্যমত তিনি সব কিছু করেছেন। চোখের সামনে ছয়জন ছেলেমেয়ে মারা যাওয়ায় তাঁর মন ব্যথিত ছিল। এ কারণে আমরা সবাই জানি তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব ভালোবাসতেন। তাদের আনন্দ-কোলাহলে কখনও তিনি বিরক্ত হতেন না। তাদের দফ বাজানো ও বর্শা খেলা তিনি মাঝে মাঝে উপভোগও করেছেন। তাদের সঙ্গে যখন মিশেছেন তখন তাদেরই একজন নিকটাত্মীয় চাচা, মামা, দাদা ও নানা হিসেবে মিশতেন। তাদের সঙ্গে কোনো দূরত্ব বজায় রাখেননি। অন্যরা যখন এ দৃশ্য দেখত তখন তারা বিচলিত হতো, অস্থিরতা অনুভব করত, ভাবত আল্লাহর নবীর সাথে বেয়াদবি করা হচ্ছে। কেউ কেউ আড়ালে, আবডালে এসব ছেলে-মেয়েকে চোখ রাঙাতেন, শাসাতেন, রাসূলের সঙ্গে এভাবে মিশতে হয় না বলে শাসাতেন। কিন্তু কথাগুলো নবীজীর গোচরে এলে তিনি বলতেন "আমি তো তোমাদেরই আপনজন, তোমাদেরই মতো মানুষ। এই দেখ আমি তোমাদেরই মত খাই-দাই, আনন্দ করি, কাজ করি।" ছেলে-মেয়েরা এসব কথায় আরও সাহস পেত, তারা দ্বিগুণ উৎসাহে বয়সের ব্যবধান তোয়াক্কা না করে তাঁর কাছে চলে যেত।

দু'টি ঘটনা শোনো :

নবীজী তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আলাপ করছিলেন। এ সময় একজন লোক এসে তাঁকে সম্ভাষণ করে বললেন, মুহাম্মদ (সা.) একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে।"

নবীজী তার দিকে তাকালেন এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলে চললেন, "আমি ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত ধরনের কিচির মিচির শব্দ শুনতে পেলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, দু'টি ঘুঘুর ছানা। আমি তাদের আমার চাদরের ভেতর নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এর মধ্যে বড় একটি ঘুঘু এসে হাজির হলো। মনে হলো তাদের মা। পাখির নীড়টি খালি দেখে বড় ঘুঘুটি আমার মাথার ওপর চিৎকার করে ঘুরতে লাগল। আমি আমার চাদরের ভাঁজ খুললাম। কি আশ্চর্য, মা ঘুঘুটি আমার চাদরে এসে শিশু ছানাটির ওপর বসে পড়লো। এই দেখুন, এখনো তারা আমার চাদরের মধ্যে রয়েছে।

এই বলে লোকটি চাদরটি রাসূলের সামনে খুলে ফেলল।

www.nagorikpathagar.org

নবীজী পাখিগুলো দেখলেন এবং লোকটিকে বললেন, "এখনই গিয়ে ছানাগুলোসহ ঘুঘু মাকে বাসায় রেখে আসুন।"

একথা বলতে বলতে তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল এবং তিনি নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "একজন মায়ের স্নেহ কত তীব্র, নিজের শিশু ছানাটির জন্য এই পাখি মাতাটির অন্তর কি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় ভরে উঠেছিল! কিন্তু আমার ভাইরা, নিজের সৃষ্টির জন্য আল্লাহ নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।"

নবীজীর পিতৃস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় আরো একটি ঘটনায়। যায়েদ খ্রিষ্টান মাতা-পিতার সন্তান। শৈশবকালে মাসহ এক কাফেলার সাথে ভ্রমণকালে হঠাৎ একদল দস্যু এসে কাফেলার সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। দস্যুরা যায়েদকেও সাথে করে নিয়ে যায় এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। যায়েদকে হাকিম নামে এক লোক কিনে নেয়। তিনি আবার যায়েদকে উপহার হিসাবে তার খালা খাদীজা (রা.) -এর কাছে পাঠান। বিয়ের কিছুদিন পর খাদিজা (রা.) যায়েদকে তার স্বামী মুহাম্মদ (সা.)-কে উপহার হিসেবে দেন। যায়েদ মহা আনন্দে নবীজীর সাথে জীবন কাটাতে থাকেন। একদল হজযাত্রী যায়েদকে মক্কায় দেখে চিনতে পারলেন। তারা তার বাবাকে যায়েদের খবর জানায়।

যায়েদের পিতা তাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতার অনুরোধে দয়ার্দ্র নবীজীর মন গলে গেল। তিনি যায়েদকে মুক্তিপণ ছাড়াই স্বাধীন করে দিলেন। এবং তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যায়েদ বললেন, "আমি যাব না। আপনি পিতা-মাতার চেয়ে আমার কাছে অনেক-অনেক বেশি আপনজন।"

www.nagorikpathagar.org

২. আবু বকরের গল্প শোনো

মিষ্টি খাওয়া হলো না

অনেক অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে এক মস্তবড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। বিদেশেও কাপড় রফতানি করতেন। তখনকার রফতানি কিন্তু আজকের যুগের মতো ছিল না। বিদেশে মাল-পত্র পাঠানোর জন্য জাহাজ-বিমান কিছুই ছিল না। উটের পিঠে মাল বোঝাই করে তিনি বিদেশে পাঠাতেন। অনেক লাভ হতো। তা দিয়ে তিনি আরাম-আয়েশে দিন কাটাতেন। এত বড় ব্যবসার মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। কোথাও কোনো দুর্নীতি ছিল না। এ যুগের ব্যবসায়ীদের মতো ক্রেতাদের কাছ থেকে গলাকাটা দামও তিনি নিতেন না। খুব কম লাভে তিনি ব্যবসা করতেন। ক্রেতাদের যাতে কষ্ট না হয়, সে দিকে তিনি খুব দৃষ্টি রাখতেন। এজন্য লোকে তাঁকে ভক্তি করে, সম্মান করে 'বিশ্বাসী' বলে ডাকত। লোকেরা তাঁর কাছে নগদ টাকা, সোনা-গয়না জমা রাখতো। অনেকে তাঁকে ব্যবসার জন্য টাকা দিত। তিনি সবার পাওনা হিসাব করে সময়মতো ফেরত দিতেন। সবাই তাঁর কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেত। তিনি দু'হাতে দান-খয়রাতও করতেন।

এমন লোকটি হঠাৎ নতুন এক ধর্ম গ্রহণ করে বসলেন। ধর্ম গ্রহণ করেই নিজের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা সব সেই ধর্মের জন্য বিলিয়ে দিলেন। নিজেও ধর্ম প্রচারের কাজে লেগে গেলেন। এতে ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা ছোট হয়ে আসল। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সাও কমে আসতে লাগলো। তবু যখন যতটুকু আয় তিনি করেছেন তার সবটুকুই ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। নিজের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য তিনি কোনো টাকা-পয়সা জমা করে রাখতেন না। নতুন ধর্মকে, ধর্মের প্রচারককে এমন কি ধর্ম ভাইদের তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাই সমস্ত সম্পদ তিনি তাদের জন্য ব্যয় করেছেন।

এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। আরবের অধিকাংশ লোক নতুন ধর্ম গ্রহণ করল। তারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। নতুন নতুন দেশ জয় করল। চারদিকে শান্তি আর স্বস্তি। মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ হলো। নতুন ধর্মের প্রচারক ও শাসনকর্তা হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন। লোকেরা সবাই মিলে কাপড় ব্যবসায়ীকে ধর্মনেতা ও শাসনকর্তা বানালো। কেননা সব দিক থেকে তখন তিনিই ছিলেন সবার সেরা। তাঁর সমান কেউ ছিল না। জনসাধারণ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করত।

শাসনকর্তা হওয়ার পর তাঁর অবস্থার উন্নতি হলো না। বরং খারাপ হতে লাগল। কারণ ব্যবসার জন্য তিনি এখন সময় একদম পান না। সারা দিন-রাত শাসন কাজেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সে জন্য তিনি কোনো বেতনও নেন না। এদিকে সংসারও যে আর চলে না। আয়ের সমস্ত পথই যে প্রায় বন্ধ। কি করবেন, খুব চিন্তায় পড়লেন। অবশেষে ভাবলেন, মাঝে মাঝে সময় করে পুরান ব্যবসাটা চালাবেন। একদিন কিছু চাদর নিয়ে বাজারে চলছেন। রাস্তায় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, 'বাজারে যাচ্ছি।' বন্ধুটি তো অবাক! বলে কি? যাঁর ওপর এত বড় ধর্ম

www.nagorikpathagar.org

এবং এত বড় সাম্রাজ্যের দায়িত্ব, তিনি কি না ব্যবসা করতে বাজারে যাচ্ছেন! মাথাটা তার ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকলে, আপনার কাজ চলবে কি করে ?" তিনি বললেন, "না করলে আমার সংসারই বা চলবে কি করে ?" বন্ধুটি বললেন, "চলুন অর্থমন্ত্রীর কাছে যাই, তিনি আপনার জন্য একটা ভাতা ঠিক করে দেবেন।"

কথামতো তাঁরা দু'জনই অর্থমন্ত্রীর কাছে গেলেন। অর্থমন্ত্রী একজন বাস্তুহারার সমান ভাতা তাঁর জন্য ঠিক করে দিলেন।

শাসনকর্তা আর বাজারে গেলেন না। রাষ্ট্রের দেয়া সামান্য ভাতা দিয়েই তিনি সংসার চালাতে লাগলেন। বুঝতেই পারছ কত কষ্ট হচ্ছিল তাঁর সংসারে। এভাবেও বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

একদিন তাঁর স্ত্রী বললেন, "অনেক দিন মিষ্টি খাই না। মিষ্টি খেতে খুব ইচ্ছা করছে।"

শাসনকর্তা বললেন, "মিষ্টি কিনতে তো টাকা লাগবে, আমার কাছে তো টাকা-পয়সা নেই।" স্ত্রী জবাব দিলেন, "যদি আদেশ দেন, তা'হলে একটা কাজ করতে পারি।" শাসনকর্তা বললেন, "কি সেটা ?" স্ত্রী বললেন, "বাজার খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচালে, মাসের শেষে হয়তো কিছু টাকা জমবে। জমলে তা দিয়ে মিষ্টি কিনতে পারব।" শাসনকর্তা বললেন, "ঠিক আছে তাই করো।" হুকুম পেয়ে দরকারি জিনিসও কমকম করে কিনে তার স্ত্রী কিছু টাকা জমালেন। মাসের শেষে টাকাটা শাসনকর্তার হাতে তুলে দিলেন। ভাবলেন, যাক এবার অনেক কষ্টের পর মিষ্টি খাওয়া যাবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে একটা, হয় অন্যটা। শাসনকর্তা বললেন, "আজ এটা প্রমাণ হলো যে, এ টাকাগুলো আমাকে বেশি দেয়া হচ্ছে। কারণ এ টাকাগুলো ছাড়াই তো আমাদের সংসারের খরচ-পত্র হয়ে গেছে। সুতরাং এগুলো আমি কোনোভাবেই নিতে পারি না।" অর্থমন্ত্রীর কাছে স্ত্রীর জমানো টাকাগুলো তিনি ফেরত পাঠালেন এবং বলে পাঠালেন যে, পরের মাস থেকে ঐ পরিমাণ টাকা কমিয়ে যেন তাঁকে ভাতা দেয়া হয়। তারপর থেকে তাঁর ভাতাও কমে গেল। তাঁর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়া আর হলো না। এরপর বেশিদিন আর তিনি বাঁচেননি। মৃত্যুর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন, "রাষ্ট্রের যেসব জিনিস আমার প্রয়োজনে আনা হয়েছিল, মৃত্যুর পর তা পরবর্তী শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়ে দিও।" মৃত্যুর পর তাঁর কাছে কোনো টাকা-পয়সা পাওয়া যায়নি। ছিল মাত্র একটি উট, একটি পেয়ালা ও একটি গোলাম।

কে এই ব্যবসায়ী? কে এই শাসনকর্তা? তোমরা সবাই তাঁকে জানো। হয়তো এতক্ষণে চিনেও ফেলেছো। তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ।

www.nagorikpathagar.org

ভাতা ফেরত দিলেন

সরকারি কাজ-কর্ম করে বা চাকরি করে সবাই তো বেতন পায়। কিন্তু সারা জীবন বেতন বা ভাতা নিয়ে পরে তা' ফেরত দিয়েছে, এমন কথা কি তোমরা শুনেছ? হয়তো শুনে থাকবে। আবু বকর (রা.) -ই এমন কাজ করেছিলেন। দুনিয়ার আর কেউ ঐ ধরনের কাজ করেছে বলে জানা যায় না। খলীফা হওয়ার পর সরকারি ভাতা নেয়ার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কিন্তু ওমর (রা.)-এর পীড়াপীড়িতে এবং জনসাধারণের চাপে তিনি সরকারি ভাতা গ্রহণ করেছিলেন। সে ভাতাও ছিল খুব সামান্য। তবু তা নিয়ে তাঁর শান্তি ছিল না, স্বস্তি ছিল না। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি নিজের মেয়ে আয়েশা (রা.) -কে ডেকে বললেন, "সরকারি ভাতা নেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ওমর (রা.) -এর কথা ফেলতে পারলাম না। তিনি বলেছিলেন, ব্যবসায়ের সময় পাবেন না। আর ওদিকে সময় দিতে গেলে খেলাফতের কাজ পড়ে থাকবে। এতে দেশবাসীর খুব ক্ষতি হবে। তাঁর কথাতেই সরকারি ভাতা গ্রহণ করেছিলাম। সেজন্য আমার অমুক বাগানটি ঐ ভাতার বদলে দান করে যাচ্ছি।"

যে পরিমাণ তিনি ভাতা পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি দান করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাগানটি ছিল অনেক বড়। এর দামও ছিল অনেক বেশি। এর থেকে নিয়মিত যে আয় আসত, তাও কম ছিল না।

কিন্তু এটা তিনি দান করতে গেলেন কেন? সরকারি ভাতা নেয়া তো কোনো অন্যায় নয়। না নিলে তিনি সংসার চালাতেন কি করে? এর জবাব দিয়েছেন ওমর (রা.) । আয়েশা (রা.) যখন আবুবকর (রা.) -এর শেষ ইচ্ছা উমর (রা.) -কে জানালেন, উমর (রা.) তখন বললেন, "আল্লাহ্ তোমার বাবার ওপর রহমত করুন। তিনি কারো কথার নিচে থাকতে চাননি।"

আসল কথা, এভাবে না সেভাবে– তিনি ইসলামের জন্য, মুসলমানদের জন্য সবকিছু দান করতে চেয়েছিলেন। তা তিনি করে গেছেন। কোনো কিছুই আর রেখে যাননি।

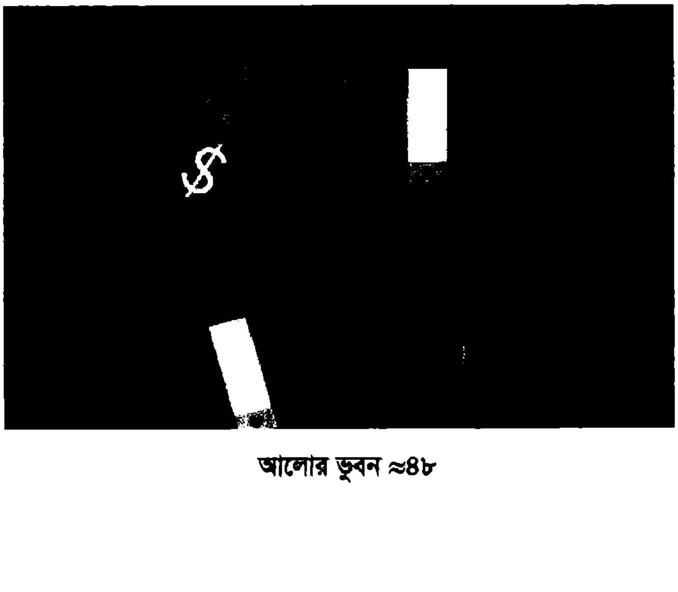

www.nagorikpathagar.org

দানের প্রতিযোগিতা

দান তো অনেকেই করে। অনেক বড় বড় দাতার নামও তোমরা শুনেছ। যেমন দাতা হাতেম তাই, দাতা হাজী মুহম্মদ মহসিন প্রমুখ। এরা অনেক বড় দাতা ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো দাতাই নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন এমন জানা যায় না। এসব নামকরা দাতা ছাড়া দুনিয়াতে এমন অনেক দাতা ছিলেন যারা নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। সব কিছু দান করে গেছেন। এদের মধ্যে আবু বকর (রা.) ও একজন। তাঁদের দান সম্পর্কে অনেক কাহিনী রয়েছে। এখানে মাত্র একটি কাহিনীর কথাই উল্লেখ করছি।

নবীজী একবার সাহাবীদেরকে কিছু দান করতে বললেন। সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। কিসের প্রতিযোগিতা, দান করবেন তার প্রতিযোগিতা। তখন ভালো ভালো কাজের প্রতিযোগিতা হতো। তোমরা যেমন লেখাপড়া এবং খেলাধুলার প্রতিযোগিতা করো, তেমন আর কি! নবীজীর আদেশে এবার দানের প্রতিযোগিতা শুরু হলো।

ওমর (রা.) ভাবলেন, "দানের ব্যাপারে আবু বকর (রা.) ই সবসময় প্রথম হয়। কোনো সময়ই তাঁর সাথে পারা যায় না। আমার কাছে কিছু মালপত্র আছে। এবার আবু বকর (রা.) -এর চেয়ে বেশি দান করে তাকে হারিয়ে দেবো। এবার আমি নিশ্চয়ই প্রথম হবো।" এসব ভেবে সমস্ত মালপত্রের অর্ধেক পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে বাকিটা নবীজীর কাছে নিয়ে এলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, "পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছেন?"

ওমর (রা.) : "কিছু রেখে এসেছি।"

নবীজী : "কি রেখে এসেছেন ?"

ওমর (রা.) : "অর্ধেক রেখে এসেছি।"

আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত মালামাল নিয়ে নবীজীর কাছে হাজির হলেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আবু বকর ঘরে কি রেখে এসেছেন ?

আবু বকর (রা.) : "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"

কথাটার অর্থ কি বুঝেছ? আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত মালামাল দান করার জন্য নিয়ে এসেছেন। পরিবার পরিজনদের জন্য কিছুই রেখে আসেননি। এবারের প্রতিযোগিতায়ও আবু বকর (রা.) প্রথম হলেন। এসব দেখে উমর (রা.)-এর মুখে আর কথা নেই। তিনি খুব লজ্জা পেলেন। বুঝলেন, আবু বকর (রা.) তাঁর চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহৎ। তাঁর সাথে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেছেন : "আমি কোনো সময় দান-খয়রাতে আবু বকর (রা.) -কে হারাতে পারিনি।"

এই ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা। এত বড় ছিল তাঁর মন। এত মহৎ ছিলেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিবেশীর কথা ভুলেননি

আবু বকর (রা.) পাড়া-প্রতিবেশীদের কাজ-কর্ম করে দিতেন। নিজের কাজ শেষ করে ঘুরে ঘুরে প্রতিবেশীদের অভাব-অভিযোগসহ সবকিছুরই খোঁজ-খবর নিতেন। প্রয়োজনে দুঃখীর দুঃখ দূর করতেন, সাহায্য করতেন। এমনকি লোকদের ছাগলের দুধ পর্যন্ত দোহন করে দিতেন। একজন দু'জন নয় অনেকেরই ছাগলের দুধ তিনি দোহন করে দিতেন। খলীফা হওয়ার পর লোকেরা খুব চিন্তায় পড়ে গেল, এবার তাদের সেবা, খোঁজ-খবর নেবে কে? বিপদে-আপদে এখন আর তারা কাকে ডাকবে? কার কাছে যাবে? কে খাবার দিয়ে, টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে? যিনি করতেন তিনি তো এখন খলীফা। সব সময়ই তো তিনি ব্যস্ত থাকবেন। রাষ্ট্রের কত কাজ! কত ঝামেলা! বিশাল সাম্রাজ্যের খবরা-খবর তাঁকে নিতে হবে। বিচার-আচার করতে হবে। এমনকি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে হবে। পাড়া-প্রতিবেশীর খবর নেয়ার আর তো কোনো সময় তিনি পাবেন না। এমনকি এমনও হতে পারে যে, নিজ পাড়া থেকে উঠে গিয়ে তিনি রাজধানী শহরের সুন্দর বাড়িতে বসবাস করতে পারেন। হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিবেন। অনেকেই যখন এমন দুশ্চিন্তা করছে, তখন একটি ছোট্ট মেয়ে আবু বকর (রা.) -এর কাছে গিয়ে বলল :

মেয়ে : এখন থেকে আমাদের ছাগলের দুধ দোহন করে দেবে কে?
আবু বকর (রা.) : কেন? আমি।
মেয়ে : সবাই বলছে, আপনি আর ছাগলের দুধ দোহন করে দেবেন না।
আবু বকর (রা.) : কেন দেবো না?
মেয়ে : আপনি তো এখন খলীফা। আপনার কি আর সময় হবে?
আবু বকর (রা.) : নিশ্চয়ই হবে। তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার ছাগলের দুধ আমিই দোহন করে দেবো।

সত্যিই দেশের হাজার কাজে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি মেয়েটির ছাগলের দুধ দোহন করে দিতেন। কখনও তিনি মেয়েটিকে বলতেন, শুধু দুধ দোহন করে দেবো, না মাখনও বের করে দেবো? মেয়েটি যা বলতো তিনি তাই করতেন। খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন: "আমি যদি আমার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করি, তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। আর যদি ভুল পথে চলি, তাহলে আমাকে আপনারা সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন।"

এটা রূপকথার কোনো কাহিনী নয়। বানানো কোনো গল্প নয়। ইতিহাসের পাতা থেকে এই গল্প তোমাদের শোনানো হলো। এই গল্পের সাথে এই যুগের রাজা-বাদশাহ্ বা শাসনকর্তার কোনো তুলনা হয়? আমাদের যুগের কোনো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও কি এমনিভাবে পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতা করেন? সময় পেলেও কি তাঁরা দুস্থ পরিবারের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন? নিশ্চয়ই আসেন না। কেননা নিজের হাতে মানুষের কাজ করতে আমরা অপমান বোধ করি। অথচ জনগণের সাথে আপন হয়ে না মিশতে পারলে জনগণও শাসনকর্তার কথা কখনও মানতে চাইবে না। শুনতেও চাইবে না। অথবা তাঁকে ভালোভাবে বুঝতেও পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

শক্ত শক্ত কথা বলা

শক্ত কথা বলা এখন তো রেওয়াজ হয়ে গেছে। শক্ত শক্ত কথা, এখন শুধু আর বড়রাই বলে না, ছোটরাও বলে। স্কুলে যাওয়ার সময় তোমাদের কেউ কেউ রিকশাওয়ালাকে এভাবে ডাকো: এই রিকশা যাবে নাকি? রিকশাওয়ালা যদি কিছু না বলে তাহলে কি বলো তোমরা? 'বেটা নবাব কত, কথা বলে না'। যদি বলে 'যাব না', তাহলে তার জবাবে তোমরা বলো, খেতে পায় না, তার আবার বাহাদুরী কত? অথবা কোনো ভিখারী যদি তোমাদের কাছে টাকা চায়, তাহলে কি বলো? কাজ করে খেতে পারো না? ভিক্ষা করো কেন? কিংবা বাসার দরজায় দাঁড়িয়ে ভিখারী দরজা খট্‌খট্ করছে, ভেতর থেকেই বলে দিলে: 'মাফ করো, ভিক্ষা দেয়া হবে না'। ইত্যাদি। এসব কথাই শক্ত কথা। এগুলোকেই কটু কথা বলে। এসব কথায় মানুষ দুঃখ পায়। মনে খুব কষ্ট পায়। অথচ আমরা এদিকে খেয়ালই করি না। আমরা মনে করি ওদের সাথে এভাবেই কথা বলতে হয়। ওরা ভালো কথার মানুষ না। ওদের যত পার শক্ত শক্ত কথা বলো। বাসার সহকারী বা গৃহকর্মীদের বেলায় তো কথাই নেই। তাদের সাথে আমরা কেউ ভালো ব্যবহার করি না। আমরা মনে করি ভালো কথা বললে ওরা আশকারা পেয়ে যাবে। মুখে মুখে কথা বলবে। বেয়াদবী করবে। তাই পঞ্চাশ বছরের বুড়ো চাকরকে বা খুন খুনে বুড়ি কাজের মানুষকে তোমরা 'তুই' 'তুমি' করে কথা বলো। ইচ্ছে করে আজেবাজে ফরমায়েশ দিয়ে কষ্ট দাও। মনে করো, কষ্ট করাই ওদের কাজ।

আসলে তোমাদের এসব ব্যবহারে ওরা খুব কষ্ট পায়। মুখে ওরা কিছু বলতে পারে না। কেননা ওরা অসহায়। ওদের একটা আশ্রয়, একটা চাকরি যে খুব দরকার। তাই ওরা মুখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকে। তোমাদের শত অন্যায়-অবিচারের কোনো প্রতিবাদ ওরা করে না। মনে মনে দুঃখ করে। নিজের জীবনকে ধিক্কার দেয়। ভাবে আহা! আমার বাবা-মা যদি লেখাপড়া করাতো, তাহলে আজ এ অবস্থা হতো না। কেউ ভাবে আহা! তখন যদি বাবা-মার কথা শুনে লেখাপড়া করতাম, তাহলে আজ আর চাকর-বাকর হতে হতো না। ওদের মনের এসব কষ্ট তোমাদের জন্য বদদোয়া হতে পারে। অথচ একটি শক্ত কথা বলার পর হযরত আবু বকর (রা.) -এর কি অবস্থা হয়েছিল, তাই শোনো :

রাবীয়া আসলামী নামে এক সাহাবী ছিলেন। একবার কোনো কারণে আবু বকর (রা.) -এর সাথে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। কথায় কথায় বেখেয়ালে রাবীয়া আসলামীকে তিনি একটা শক্ত কথা বলে ফেলেছিলেন। কথাটা রাবীয়ার মনে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি চুপ করে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর (রা.) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি মাফ চেয়ে নিয়ে বললেন, "তুমিও আমাকে একটা শক্ত কথা বলে দাও, তাহলে বদলা নেয়া হয়ে যাবে।" রাবীয়া আবু বকর (রা.) -এর কথায় রাজি হলেন না। আবু বকর

www.nagorikpathagar.org

বকর (রা.) তাকে বার বার পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু রাবীয়া কোনোমতেই রাজি হলেন না। অবশেষে আবু বকর (রা.) বললেন, "আপনি কথাটা বলে বদলা নিয়ে নিন। নাহলে আমি নবীজীর কাছে নালিশ করব।" এরপরও রাবীয়া কটু কথা বলতে রাজি হলেন না। অবশেষে আবু বকর (রা.) উঠে চলে গেলেন।

তঁদের কথা কাটাকাটির সময় কিছু লোক সেখানে ছিলেন। আবু বকর (রা.) চলে যাওয়ার পর তাঁরা বলল, "এ তো বেশ বাড়াবাড়ি দেখছি, দোষ করা আবার নিজেই গিয়ে নালিশ করা।"

রাবীয়া নবীজীর কাছে যেয়ে সবকিছু খুলে বললেন। শোনার পর নবীজী বললেন, "তুমি ঠিক কাজ করেছ। বদলা নেয়ার জন্য তাঁকে তোমার কিছু বলা উচিত নয়। অবশ্য বদলার পরিবর্তে তুমি বলে দাও: "হে আবু বকর, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন।"

দেখলে তো সামান্য একটা কথার জন্য কত চিন্তা ! মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। কতভাবে তিনি চেষ্টা করলেন ক্ষমা পাওয়ার জন্য। কেননা তিনি জানেন, যার মনে কষ্ট লেগেছে, সে যদি মন থেকে ক্ষমা না করে, তবে আল্লাহ্ও ক্ষমা করবেন না। তাই তিনি ক্ষমা নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।

তোমরা কি এভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারবে ? নিশ্চয়ই পারবে।

www.nagorikpathagar.org

বিপদে বন্ধুর পরিচয়

বিপদে পড়লে বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়–কথাটা তোমরা অনেক শুনেছ। হয়তো তোমাদের কারো কারো জীবনে এমন অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, বিপদে পড়লে যে আসল বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়, তা তোমরা নিশ্চয়ই মানবে। তোমরা সকলেই জানো, আবু বকর (রা.) নবীজীর সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুত্বে কোনো ফাঁক ছিল না। বহু বিপদে আপদে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেসব শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। এখানে মাত্র দু'টি ঘটনা উল্লেখ করছি।

মক্কায় নবীজী গোপনে-গোপনে ইসলাম প্রচার করছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করত, তারাও গোপনেই তা করত। মুসলিমদের তখন চরম দুরবস্থা। মক্কাবাসীরা মুসলিম পেলেই গালাগালি ও মারামারি করে এবং নানাভাবে অত্যাচার করে। মুসলিমদের অবস্থা তখন কড়াইতে মাছ ভাজার মতো। টুঁ-শব্দটি করার রাস্তা নাই। এভাবে দেখতে দেখতে উনত্রিশ জন নারী ও পুরুষ মুসলিম হলেন। আবু বকর (রা.) আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। নবীজীর কাছে গিয়ে বললেন, তিনি খোলাখুলিভাবে ইসলাম প্রচার করতে চান। নবীজী তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। অনুমতি পেয়ে আর দেরি নাই। আবু বকর (রা.) কাবা শরীফের সামনে খোলাখুলিভাবে বক্তৃতা শুরু করলেন। আর যায় কোথায়? মক্কাবাসীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে খুব মারধর করল। তার সমস্ত শরীর থেকে ফিনকী দিয়ে রক্ত ঝরল। তবু নিস্তার নাই। আবু বকর (রা.)-এর রক্তে মাটি লালে লাল হয়ে গেল। তিনি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে তাঁর বাড়িতে নেয়া হলো। সবাই ভাবল আবু বকর (রা.) আর বাঁচবেন না। সারাদিন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো না। সবাই দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটালেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নবীজীর কি অবস্থা"? আবার তিনি জ্ঞান হারালেন। রাতে জ্ঞান ফিরে এলে তিনি আবার নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কিছু বলতে পারলো না। আবু বকর (রা.)-এর জন্য যা কিছু খাবার আনা হয়েছিল, তিনি খেলেন না। বললেন, "নবীজীর অবস্থা জানার আগে আমি কিছুই খাব না।" রাত গভীর হতে লাগল। আবু বকর (রা.) নবীজীর অবস্থার জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেক রাতে ওমর (রা.)-এর বোনের সাথে শপথ করলেন, নবীজী (সা.)-কে না দেখা পর্যন্ত তিনি কোনো খাবারেই হাত দেবেন না।

তখনও রাস্তায় মানুষ চলাচল করছিল। কি করে আবু বকর (রা.) -কে নবীজীর কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে? তিনি যে ভয়ানক অসুস্থ ! এ সময় তিনি চলাফেরা করবেনই বা কি করে? আবু বকর (রা.) কোনো কথাই শুনলেন না। যত অসুবিধাই হোক তিনি যাবেন এবং নবীজীকে নিজের চোখে দেখবেন।

www.nagorikpathagar.org

অগত্যা গভীর রাতে আবু বকর (রা.) -এর মা তাঁকে নিয়ে বহু কষ্টে নবীজীর কাছে হাজির হলেন। হাজির হয়ে নবীজীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবু বকর (রা.)-এর মা এই দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অন্য এক ঘটনা। মক্কাবাসীরা যখন দেখল এত অত্যাচার, এত নির্যাতনের পরও দিন দিন মুসলিমের সংখ্যা বাড়ছে, তখন তারা অনেকেই মিলে সভা করল। সভায় স্থির হলো, মুহম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হবে। নির্দিষ্ট রাতে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন প্রতিনিধি এসে নবীজীর ঘর ঘেরাও করল। মক্কার বড় বড় সরদারও আসল। কিন্তু নবীজী ওদের ষড়যন্ত্র জানতে পেরে আবু বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে রওনা হলেন। একেই নবীজীর হিজরত বলে। হত্যা করার জন্য নবীজীকে না পেয়ে তারা ঘোষণা করল: "মুহম্মদ পালিয়েছে। তাঁকে অথবা আবু বকর (রা.) কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারলে একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে।" পুরস্কারের লোভে চারদিকে নবীজী ও আবু বকর (রা.)-এর খোঁজ পড়ে গেল।

নবীজী ও আবু বকর (রা.) তখন মক্কা হতে মাত্র তিন মাইল দূরে এক পাহাড়ের গুহায় রয়েছেন। মক্কাবাসীরা এদিকে-ওদিক খোঁজার পর এ গুহার কাছে এলো। এসে দেখে গুহার মুখে বিরাট মাকড়শার জাল পাতা। তারা সেখান থেকে সরে গেল। নবীজী ক্লান্ত থাকার কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুহায় কয়েকটি সাপের গর্ত ছিল। আবু বকর (রা.) চিন্তায় পড়লেন। তারপর নিজের পাগড়ি ছিঁড়ে গর্তগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। এরপরও একটি গর্ত রয়ে গেল। আর কিছু নেই যে গর্তের মুখ বন্ধ করা যায়। আবু বকর (রা.) নবীজীর নিরাপত্তার জন্য ঐ গর্তের মুখে একটি পা দিয়ে বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর পায়ের নিচে সাপ ছোবল মারল। আবু বকর (রা.) পা সরালেন না। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন, তবু একটু উহ্ আহ্ করলেন না। একটু নড়াচড়াও করলেন না। তাঁর চিন্তা নবীজীর ঘুম যদি ভেঙে যায়! ব্যথায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন, তবু গর্তের মুখ থেকে পা সরালেন না। এমন সময় নবীজীর ঘুম ভেঙে গেল। শুনে তিনি তো অবাক! তাড়াতাড়ি সাপ যেখানে ঠোকর দিয়েছে সেখানে থু-থু লাগিয়ে দিলেন। বিষ পানি হয়ে গেল।

সাপের কামড়ে আবু বকর (রা.) মৃত্যুর মুখোমুখি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি নবীজীকে বিপদে ফেলেননি। সাপের গর্ত থেকে পা সরাননি। ভেবেছেন, সরালে সাপ যদি বের হয়ে নবীজীকে দংশন করে! শুধু তাই নয়, নবীজীর জন্য নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মক্কাবাসীদের তরবারির নিচে তিনি ফেলে রেখে এসেছিলেন। এটা কত বড় ত্যাগ, কত বড় কোরবানি ছিল, তা কি অনুমান করা যায়? এভাবে সারাটি জীবন তিনি নবীজীর পাশাপাশি থেকেছেন। বিপদের মুখেও ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এমন বন্ধুর সন্ধান কি তোমরা পেয়েছ ? দোয়া করি, নিশ্চয়ই এমন বন্ধুর সন্ধান যেন তোমরা পাও।

www.nagorikpathagar.org

শোনামাত্রই মেনে নিলেন

মহানবী মাত্র ইসলাম প্রচার শুরু করেছেন। মক্কাবাসীরা মহানবীর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। তারা মহানবীর প্রচারিত নতুন ধর্ম মানতে চাইল না। সবাই মিলে এর বিরোধিতা শুরু করল। মহানবীকে পাগল, মাথা খারাপ বলে ঠাট্টা করতে লাগল। আবু বকর (রা.) তখন মক্কায় ছিলেন না। তিনি তখন ব্যবসার কাজে ইয়েমেন দেশে অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরে এলেন। মক্কার বড় বড় সরদাররা তাঁর সাথে দেখা করতে গেল। আবু বকর (রা.) ছিলেন সমাজের অন্যতম নেতা। তাই এই দেখা-সাক্ষাৎ ছিল একান্তই সামাজিক। আবু বকর (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে মক্কায় কি ঘটেছিল তা তারা তাঁকে জানালো, আর তাঁর কাছে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর জানতে চাইল। এদের অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী। আমাদের দেশেও তো এমন হয়ে থাকে। সমাজের কোনো নেতাগোছের লোক বিদেশ থেকে ফিরে এলে গন্য-মান্য লোকেরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন, তাঁর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। খবরা-খবর নেন। আবু বকর (রা.) ও তেমনি সমাজের সরদারদের জিজ্ঞেস করলেন : 'কোনো নতুন খবর আছে কি? তাঁরা বলল, নিশ্চয়ই আছে।

সবচেয়ে বড় খবর হলো–মুহাম্মদ কিছুদিন থেকে নতুন এক ধর্ম প্রচার করছে। সে বলছে : 'আমাদের দেব-দেবীরা সব মিথ্যা। তার আল্লাহই নাকি একমাত্র সত্য।' এই কথা বলে সবাই হাসাহাসি শুরু করে দিলো। আবু বকর (রা.) কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। সবাইকে বিদায় করে দিয়ে তখনই তিনি মহানবীর (সা.) সামনে গিয়ে হাজির হলেন। মক্কার সর্দাররা তো মহা খুশি। তারা ভাবল, এইবার মুহাম্মদের শিক্ষা হবে। মহানবীর সামনে হাজির হয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেনঃ আপনি কি সত্যিই নতুন কোনো ধর্ম প্রচার করছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর (রা.) বললেন, সে ধর্মের ব্যাখ্যা কি ?

সে ধর্মের ব্যাখ্যা এই "আল্লাহ্ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের উপাস্য। দেব-দেবী সব মিথ্যা। আমি আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল। তাই আমি এই কলেমা ঘোষণার আদেশ পেয়েছিঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

মহানবীর (সা.) মুখে এই কথা শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সাথে সাথেই বললেন- "আপনি আমাকে এই ধর্মে দীক্ষিত করুন।" এই বলে তিনি মহানবীর হাতে হাত রেখে কলেমা পাঠ করলেন।

এরপর আবু বকর (রা.) মক্কার সর্দারদের কাছে ফিরে এলেন। আবু বকর (রা.) কে দেখে তাঁরা খুব খুশি হলো। মনে মনে ভাবল, মুহাম্মদকে একটা শিক্ষা দিয়েই হয়তো আবু বকর (রা.) ফিরে এসেছে। এর পর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আর নতুন ধর্ম প্রচারে উৎসাহ পাবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। আবু বকর (রা.)

www.nagorikpathagar.org

এসেই বললেন- "আমি আর তোমাদের দলে নেই। আমি মুসলিম।" সর্দারগণ তাঁর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা অবাক বিস্ময়ে আবু বকর (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারা কল্পনাও করেনি আবু বকর (রা.)-এর কাছে এ কথা শুনবে। তাদের সমস্ত আশা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। তারা আবু বকর (রা.)-এর ওপর খুবই বিরক্ত হলো। রাগান্বিত হলো। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না। ধীরে ধীরে তারা সকলেই চলে গেল।

এইভাবে অতি সহজে, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের পৈতৃক ধর্মকে উপেক্ষা করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কি আশ্চর্য! সত্যের প্রথম আহ্বানেই তিনি সত্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। দ্বিধাহীনভাবে কোনো সংকোচ বা সন্দেহ ছাড়াই তিনি সত্যের বাণী কবুল করেছিলেন। নতুন ধর্ম কবুল করার ব্যাপারে কোনো সংশয়, কোনো প্রশ্নই তার মনে জাগেনি। নবীজী তাঁকে ইসলাম গ্রহণে সরাসরি দাওয়াতও দেননি। শুধু ধর্মের কথা বলেছিলেন মাত্র। সেই ব্যাখ্যাও ছিল অতি সাধারণ ও অতি সংক্ষেপ। অথচ সাধারণ এই ব্যাখ্যা শুনেই কেন তিনি অবলীলাক্রমে সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, এটাই একটা বড় প্রশ্ন। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগছে। জাগাটাই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে এমন ঘটনা ঘটে না। সেদিক থেকে ঘটনাটি অসাধারণ। আর অসাধারণ তো হবেই, কারণ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ মানুষ। নবীজী ছিলেন আল্লাহ্‌র বাণীবাহক রাসূল। আর পরবর্তীকালে আবু বকর (রা.) হয়েছিলেন রাসূলের বাণীবাহক প্রথম খলীফা।

একটা উদাহরণ থেকেই তোমরা সহজেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। তোমাদের শিক্ষক প্রথম যেদিন বলেছিলেন, "নামাজ পড়, নামাজ সমস্ত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" তখন কি তোমরা সবাই মিলে নামাজ পড়তে শুরু করে দিয়েছিলে? নিশ্চয়ই তা করোনি। দু-চারজন হয়তো বিনা বাক্য ব্যয়ে কোনো ওজর-আপত্তি ছাড়া সরাসরি মসজিদে ঢুকে গেছ। অন্যেরা এই নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছ। নামাজ পড়তে বলার সংগে সংগে ওরা নামাজ পড়তে এলো কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেলেই তোমরা আবু বকর (রা.) কেন বিনা বাক্য ব্যয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন, তারও জবাব পাবে।

তোমরা লক্ষ করলে দেখবে, যারা বলামাত্র নামাজ পড়তে এগিয়ে গেল তারা সবাই কম-বেশি সৎ, শান্ত ও চরিত্রবান ছেলে। ভালো কথা শোনা এবং মানার জন্য ওরা সবসময় প্রস্তুত হয়েই থাকে। ন্যায়, সত্য ও ভালোর প্রতি ওদের দারুণ আকর্ষণ থাকে। ন্যায় কথা শুনলে, ভালো কথা শুনলে, সত্য কথা শুনলে ওরা সাথে সাথে তা গ্রহণ করে। মন্দ বা খারাপ বিষয়ের প্রতি এদের তেমন ঝোঁক থাকে না। এদের ঝোঁক থাকে ভালোর দিকে। এ জন্য শিক্ষক যখন বলেন– নামাজ মানুষকে ভালোর দিকে পরিচালিত করে, তখন তারা তা বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেয়।

তোমরা আগেই জেনেছ, আবু বকর (রা.) ছোটকাল থেকেই সত্যবাদী ছিলেন। বিশ্বস্ত ছিলেন। আমানতদার ছিলেন। ছোটকালেই তার মধ্যে ভালো ভালো সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সবার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দরদী ছিলেন। আপন-পর সবাইকে তিনি ভালোবাসতেন। কারো সংগে মারামারি, কাটাকাটি করতেন না। আরবদেশে সে সময় বড়-ছোট সবাই মদ পান করত, জুয়া খেলত, নারীকে অপমান ও লাঞ্ছিত করত। কিন্তু ছোটকাল থেকেই তিনি এসব থেকে দূরে থাকতেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর মন সব সময় প্রস্তুত থাকত। চুম্বক যেমন অন্য

www.nagorikpathagar.org

কোনো ধাতুকে চট্ করে আকর্ষণ করে, তেমনিই তার মনও সত্যকে গ্রহণ করার জন্য চুম্বকের মতোই অবস্থান করছিল। মহানবী (সা.) যখন সত্যের বাণী উচ্চারণ করলেন, চুম্বকের মতোই তিনি তখন তা গ্রহণ করে নিলেন।

এখানে আর একটি কারণও উল্লেখযোগ্য। তোমরা সেই শিক্ষক বা গুরুজনের কথাই শোনো, যাকে তোমরা ভালো জানো। ভালো মনে করো। যাঁকে তোমরা মনে করো তিনি সৎ, চরিত্রবান, খাঁটি মানুষ– তাঁর কথাই তোমরা শোনো। খারাপ লোকের ভালো কথা কেউই শোনে না। ভালো মানুষের ভালো কথাই লোকেরা শুনে থাকে।

মুহাম্মদ (সা.) কে আবু বকর (রা.) ছোটকাল থেকেই চিনতেন। জানতেন। তাকেও তিনি দেখেছেন সত্যবাদী, ন্যায়বাদী, বিশ্বাসী হিসেবে। ছোটকালে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে চরিত্রবান ছেলে। কিশোরকালে তিনি ছিলেন সবচেয়ে চরিত্রবান কিশোর। যৌবনকালে তিনি ছিলেন সবচেয়ে চরিত্রবান যুবক। সারা আরবের সবাই তাঁকে **'আল আমীন'** বলে ডাকত। তিনি ছিলেন সবার সম্মানের, সবার স্নেহের এবং সবার আদরের মানুষ।

তাই আবু বকর (রা.) অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। ভালোবাসতেন। এহেন মানুষের কথা যে মিথ্যা হবে না, এই বিশ্বাস আবু বকর (রা.) -এর ছিল। এ কারণেই মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখে যখন তিনি মহাসত্যের বাণী শুনলেন, তখন তা তিনি বিশ্বাস না করে পারলেন না। এ কারণেই নবীকে তিনি প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেননি। শোনামাত্র মহাসত্যের বাণী তিনি কবুল করে নিয়েছিলেন।

তোমরা কি এখন থেকে নিজেদের মনকে আবু বকর (রা.) -এর মতো সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে। কেননা এ ছাড়া শান্তি এবং মুক্তির কোনো পথ যে খোলা নেই।

www.nagorikpathagar.org

নেতা হতে চাননি

সমাজের নেতা হওয়ার জন্য, দেশের শাসনকর্তা হওয়ার জন্য মানুষের কত আগ্রহ থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা তো তোমরা জানই? তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বড় হলে তুমি কি হতে চাও? কি বলবে তুমি? ভেবে-চিন্তে হয়তো বলবে, আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই বা প্রধানমন্ত্রী হতে চাই। তোমার কোনো বন্ধুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, হয়তো বলবে, আমি জজ হতে চাই। অন্য কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সে হয়তো বলবে, আমি সেনাপতি হতে চাই। এভাবে দেখা যাবে আমরা সবাই ক্ষমতাবান হতে চাই। সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আমরা সবাই চাই। আমরা সবাই তাই কামনা করি। যার যোগ্যতা আছে সেও কামনা করে, আর যার আদৌ কোনো যোগ্যতা নেই সেও তাই কামনা করে। অর্থাৎ যার বিদ্যা-বুদ্ধি নেই, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা কোনো কিছুই নেই, সে ধরনের মানুষও আশা করে, আহা! আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম, প্রধানমন্ত্রী হতাম! আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করে, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট হতে চায়। খোঁজ করলে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে, যে ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চায় না। তোমাদের ক্লাসের ক্যাপটেন নির্বাচনের দিন তোমাদের কত না ঝামেলা হয়। ৩০ জন ছাত্রের মধ্যে ৫ জনই হয়তো ক্যাপটেন পদপ্রার্থী হয়।

এ থেকেই বোঝা যায় ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব সবাই চায়। সাধারণের চেয়ে যারা একটু মেধাবান, প্রতিভাবান, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী, বংশে-মর্যাদায় যারা একটু ভালো, আর যারা লিখতে পারে, বলতে পারে, যারা একটু বুদ্ধি ও বিবেচনা রাখে তারা বরং নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাবান হতে বেশি আগ্রহী হয়। কারণ তারা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করে। নিজেদের ওপর তারা বেশি আস্থাবান। তাই দেখা যায়, সব লোকেরা দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী না হলেও সমাজের যে যেখানে অবস্থান করে সেখানকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁরা দখল করে বসেন। ছাত্র হলে তারা ছাত্র প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা হন। শিক্ষক হলে শিক্ষক সমিতির। এভাবে না হলে সেভাবে, সংঘ-সমিতি কায়েম করে নিজেরাই হর্তাকর্তা হয়ে বসেন। নেতৃত্বের প্রতি মোহের কারণে আমাদের সমাজের একতা-শৃঙ্খলা বহুবার ধ্বংস হয়েছে। কেননা সবাই নেতৃত্ব চায়। সবাই নেতা হতে চায়। কেউ কর্মী হতে চায় না। হঠাৎ কেউ কাউকে মানতে চায় না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। সবাই নিজেকে বড় মনে করে।

অথচ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মানুষেরা কেউই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চাননি। মানুষের সেবা করতে চেয়েছেন মাত্র। সমাজের লোকেরা তাদের জোর করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। নেতৃত্বে বসিয়েছে। তাদের শাসক, মনিব ও পরিচালক বানিয়েছে। জনগণের অনুরোধেই তাঁরা দেশ শাসন করেছেন। রাজ্য শাসন করেছেন। আবার যখনই তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, তখনই রাজ্য শাসনের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর (রা.) নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে সবসময় দূরে থাকতে চেয়েছেন। না চাইলেও তাঁকে কিন্তু খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। তিনি হয়েছিলেন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমের নেতা। খলীফা হিসেবে তিনি সবসময় বলেছেন : "অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। এক সাহাবী বলেন : একবার তিনি আবু বকর (রা.) -এর কাছে কিছু উপদেশ শুনতে চান। আবু বকর (রা.) বললেন : "খোদাতায়ালা তোমার প্রতি বরকত ও রহমত বন্টন করুন। নামাজ পড়, রোজা রাখ, হজ করো, জাকাত দাও। আর কখনও নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করো না। নেতার দায়িত্ব অনেক বেশি। কেয়ামতের দিন খুবই কড়াকড়িভাবে তোমাদের নেতাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর সেই হিসেবও হবে অনেক বড়, অনেক লম্বা।"

শুধু কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নয়, দুনিয়ার সকল প্রকার আকর্ষণ ও প্রলোভন থেকে তিনি দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। ক্ষমতাবানদের মতো তিনি দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ করেননি, করতে চাননি। শাসনকর্তা হওয়ার আগে তিনি যেমন ছিলেন সহজ, সরল ও খোদাভীরু, শাসনকর্তা হওয়ার পরেও এসব গুণের চর্চা তিনি আরও বেশি করেছেন। অর্থাৎ তিনি আরও বেশি সহজ, সরল, আরও বেশি সহানুভূতিশীল, আরও বেশি খোদাভীরু হয়েছিলেন।

একটি ঘটনা থেকে তোমরা তা বুঝতে পারবে। একবার তিনি পানি পান করতে চাইলে তার পানির সাথে কিছু মধু মিশিয়ে দেয়া হয়। পানির সাথে মধু আছে এটা বুঝতে পেরে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। সবাই তো অবাক। ব্যাপার কি, তিনি কাঁদছেন কেন ? কান্না থামার পর উপস্থিত সঙ্গী-সাথীরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন : "একদিন আমি রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি দুরদুর আওয়াজ করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি কার উদ্দেশ্যে দুর-দুর করছেন। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নবীজী বললেন : দুনিয়া আমার সামনে সুন্দর রূপ ধারণ করে হাজির হয়েছিল। আমি তাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। মধু মিশানো পানি দেখে নবীজীর ঐ কথাই আমার মনে পড়ে গেল। সে জন্য আমি কাঁদছিলাম। ভয় হচ্ছিল আমি কি দুনিয়ার প্রলোভনের ফাঁদে পা বাড়িয়েছি ?"

সামান্য মধু দেখে যিনি বিচলিত হন, তিনি যে কত মহান ছিলেন, আমরা কি তা আজকের এই যুগে চিন্তা করতে পারব? যেখানে আমাদের নেতা বা শাসনকর্তারা সবসময় উত্তম ও দামী খাবার খেতে চান, ভালোর থেকে ভালো দালান কোঠায় বসবাস করতে চান। কেননা তারা মনে করেন দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, সুখ-ভোগ সব তাদের জন্য। এ সবের ওপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার।

তোমরা যখন নেতা হবে, মন্ত্রী হবে, প্রেসিডেন্ট হবে, তখন কি আবু বকর (রা.)-এর আদর্শের কথা স্মরণ রাখবে? আশা করি, নিশ্চয়ই রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

নবীজীর বন্ধু হতে পারতেন

তোমরা জানলে আবু বকর (রা.) সত্যবাদী ছিলেন। সহজ সরল ছিলেন। নবীপ্রেমিক ছিলেন। খোদাভীরু ছিলেন। সহনশীল, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমানতদার ছিলেন। ন্যায় বিচারক ছিলেন। এক কথায় মানুষের মধ্যে যতগুলো ভালো গুণের সমাবেশ হতে পারে তার সবগুলোই আবু বকর (রা.)-এর মধ্যে ছিল। তাইতো আমাদের নবীজী বলেছেন-"আমার যদি কোনো বন্ধু না থাকত তবে আমি আবু বকর (রা.) -কেই বন্ধু করতাম। নবী-রাসূলদের বাদ দিলে আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ নেই। রাসূলে-করিমকে বাদ দিলে আবু বকর (রা.) মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি কি সেই ব্যক্তি নন, যে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর (রা.)। তোমরা যদি আবু বকর (রা.)-কে নেতা নির্বাচিত করো তা'হলে দেখবে, তিনি দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী এবং আখেরাতের প্রতি মনোযোগী।"

আলী (রা.) বলেছেন, "যদি আবু বকর (রা.) -এর ঈমান এবং সমগ্র জাতির ঈমান দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আবু বকর (রা.) -এর পাল্লাই ভারী হবে।" তিনি আরো বলেছেন, "মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহে আবু বকর (রা.) সবার শ্রেষ্ঠ।

বহু বিষয়ে আবু বকর (রা.) -কে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি। যেমন :

* বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন
* তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন
* ইসলামের জন্য তিনিই প্রথম যোদ্ধা হন
* তিনিই প্রথম খলীফা হন
* তিনিই প্রথম সরকারি তহবিল স্থাপন করেন
* তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাদের জন্য বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করেন
* তিনিই সর্বপ্রথম রাজকার্যে পরামর্শ তথা গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন
* তিনিই সর্বপ্রথম মক্কায় মসজিদ নির্মাণ করেন
* নবীদের পরে তিনিই সর্বপ্রথম বেহেস্তে প্রবেশ করবেন।

মনীষীরা বলেছেন, আবু বকরের স্বার্থ সিদ্ধির কোনো বাসনা ছিল না। ক্ষমতা এবং রাজশক্তির তিনি অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাবই তিনি ইসলামের কল্যাণ ও জনসেবায়

www.nagorikpathagar.org

নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস ছিল রাসূল-প্রীতি। তিনি বলতেন: "আমাকে কেউ আল্লাহ্‌র খলীফা বলো না, আমি রাসূলের খলীফা।" তিনি সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করতেন-এই অবস্থায় রাসূল বেঁচে থাকলে রাসূল কী সিদ্ধান্ত নিতেন। রাসূলের আদর্শ হতে এক চুল পরিমাণ তিনি বিচ্যুত হতেন না। তাঁর খেলাফতকাল ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এ কথা সত্য যে, নবীজীর পরে আবু বকর (রা.)-এর মতো অন্য আর কারো কাছে ইসলাম এত বেশি ঋণী নয়।

ন্যায়বিচারের একটি কাহিনী থেকে তোমরা বুঝবে তিনি কত বড় ন্যায়বিচারক ছিলেন। ন্যায় বিচারের খাতিরে আপনজনদের কথাতেও তিনি কর্ণপাত করেননি। তোমরা সকলেই জানো তাঁর কন্যা আয়েশা (রা.)-কে তিনি কত স্নেহ করতেন। আয়েশা (রা.) ছিলেন নবীজীর সহধর্মিণী। একবার তিনি আয়েশা (রা.)-কে ২২টি খেজুর গাছ দান করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মনে পড়ল কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই আয়েশা (রা.) -কে ডেকে বললেন, "আমার মৃত্যুর পর এই গাছগুলো তোমরা সব ভাই-বোন আইন অনুযায়ী ভাগ করে নেবে।"

নবীজীর একটি বাগান ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা.) ঐ বাগানটি দাবি করলেন। খলীফা ফাতেমাকে নবীজীর কন্যা হিসেবে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ফাতেমার এ আবেদন তিনি মঞ্জুর করতে পারেননি। তিনি ফাতেমা (রা.) -কে ডেকে বললেন : "নবী-রাসূলদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকে না। তাঁদের যা কিছু সম্পত্তি, সমস্তই উম্মতরা, অনুসারীরা পাবে।"

খলীফার এ কথায় ফাতেমা অসন্তুষ্ট হলেন। তবু খলীফা তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেননি।

ইসলামকে তিনি কত ওপরে স্থান দিয়েছিলেন, একটি গল্প থেকেই তা বুঝতে পারবে।

একদিন আবু বকর (রা.) সঙ্গী-সাথীসহ বসে আছেন। তাঁর পাশে বসেছিলেন তাঁরই ছেলে আবদুর রহমান। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল। এক সময় বদরের যুদ্ধের কথা উঠল। বদরের যুদ্ধে আবদুর রহমান ছিলেন শত্রুর পক্ষে। তখনও তিনি মুসলিম হন নি। আবু বকর (রা.) ছিলেন সেই যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি।

আবদুর রহমান: আব্বা! বদরের যুদ্ধে আপনি বহুবার আমার তলোয়ারের সামনে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাকে আঘাত করিনি। আমি আমার ঘোড়াকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছি।

আবু বকর (রা.) : কিন্তু হে আমার পুত্র, তুমি যদি একবারও আমার তলোয়ারের সামনে পড়তে, তাহলে আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে দিতাম না। কেননা তোমরা ছিলে অসত্যের পক্ষে আর আমরা ছিলাম ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। সত্যের খাতিরে তোমার প্রতি আমার স্নেহ আমি অবশ্যই ভুলে যেতাম।

তিনি কি ধরনের শাসনকর্তা ছিলেন নিচের দুটো কাহিনী থেকে তা সহজেই বুঝতে পারবে।

সিরিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছেন। সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার আগে তিনি বললেন, "মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করো না। ফলবান গাছ কেটো না এবং শস্যক্ষেত নষ্ট করো না। একটি

www.nagorikpathagar.org

ভেড়া, ছাগল, উটও নষ্ট করো না—খাদ্যের জন্যে সঞ্চিত রাখো। যে গাছ বেড়ে উঠছে তা ধ্বংস করো না এবং আত্মার অবমাননা করো না।"

খলীফা হিসেবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি নিজ চোখে দেখাশোনা করতেন। রাতের অন্ধকারে শহর এবং শহরতলীতে তিনি বেড়াতেন। খোঁজ-খবর নিতেন। কারা দুঃখ কষ্টে আছে, কারা রোগে-শোকে কষ্ট পাচ্ছে, তিনি নিজ হাতে সকলের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ দূর করতেন।

ওমর (রা.) খলীফা না হলেও শহর ও শহরতলীতে ঘুরে ঘুরে লোকদের দুঃখকষ্ট দূর করতেন। প্রতিদিন তিনি এক অন্ধ মহিলার সেবা করতেন। তার সমস্ত কাজ-কর্ম করে দিতেন। একদিন রাতে গিয়ে তিনি দেখলেন মহিলার সমস্ত কাজ কে যেন করে দিয়ে গেছে। মহিলা নিশ্চিন্ত মনে পরম সুখে ঘুমাচ্ছেন। ওমর (রা.) অবাক হলেন, ভাবলেন এই শুভ কাজে কে আবার তার প্রতিযোগিতায় নামল ? পরদিন তিনি সেই অন্ধ মহিলার বাড়িতে কিছু আগেই আসলেন। তাঁর ধারণা, গতকাল যিনি মহিলার কাজ করে দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই আজ আবার আসবেন। তাঁর ধারণাই ঠিক হলো। তাঁকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। একজন লোক এসে অসহায় মহিলার কাজ-কর্ম শুরু করে দিলো। ওমর (রা.) দেখলেন তার প্রতিযোগী কে? দেখে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া। তিনি আর কেউ নন। তিনি আবু বকর (রা.)। একটু পরেই দু'জনের দেখা হলো। দু'জনেই খুব খুশি হলেন। ওমর (রা.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং ভাবলেন প্রতিযোগিতায় তিনি হেরেছেন অন্য কারো কাছে নয়। হেরেছেন স্বয়ং আবু বকর (রা.)-এর কাছে।

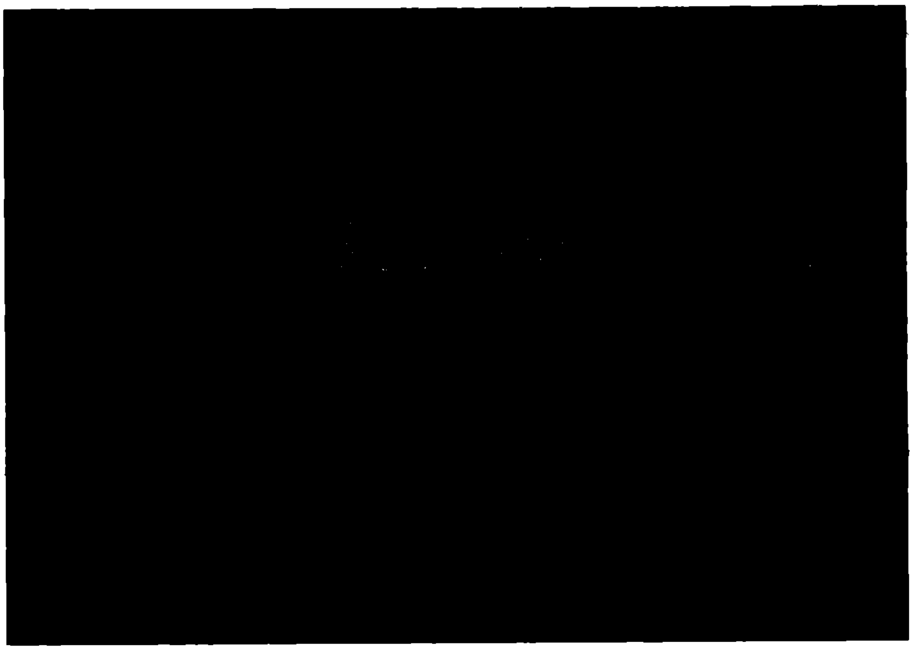

www.nagorikpathagar.org

মাটির মানুষ

আবু বকর (রা.) স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও প্রতিভাবান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তোমাদের বয়সে তিনি কবিতা লিখতেন। মনের সমস্ত কথাই তিনি কবিতার ছন্দে প্রকাশ করতে পারতেন। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রশংসা করে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। সেগুলো মাঝে মাঝে সঙ্গী-সাথীদের আবৃত্তি করে শোনাতেন। কবিতার ছন্দে তিনি সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন। বড় হয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। নবীজীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"গৌঢ় বর্ণ যে চেহারার নিকট মেঘও পানি চায়,
আখেরাতের বন্ধু সে, নিঃস্ব বিধবাদের আশ্রয়।"

দেখলে তো–ভাবে, ভাষায়, উপমা ও ছন্দে কত উন্নত এই কবিতা। ইসলাম গ্রহণের আগে নানা ধরনের কবিতা তিনি লিখতেন ! ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্র প্রশংসা ছাড়া কোনো কবিতাই তিনি লিখেননি।

আবু বকর (রা.) খুব সুন্দর করে কথা বলতেন। বড় বড় সভায় তাক লাগানো ভাষণ দিতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মধুর। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল দরদ মেশানো। প্রতিটি ভাষণও ছিল আবেগ জড়ানো। তাঁর ভাষণের প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করত। কবিতায় যেমন তিনি উন্নতমানের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতেন, বক্তৃতায়ও তেমনি উন্নতমানের ভাষা ব্যবহার করতেন। এখানে তাঁর একটি বক্তৃতা তুলে ধরছি। এ থেকেই বুঝতে পারবে, কত সুন্দরভাবে গুছিয়ে তিনি কথা বলতেন : "আজ প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও লাবণ্যময় চেহারাগুলো কোথায়? বড় বড় নগরীর প্রতিষ্ঠাতারা কোথায়? যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিমান বীর পুরুষেরা আজ কোথায় পালিয়েছে? যুগের পরিবর্তন তাদের শক্তি কেড়ে নিয়েছে। তাদের শক্তিশালী হাত আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা আজ কবরের অন্ধকার কক্ষে গভীর নিদ্রায় শায়িত।"

পড়তে ভালো লাগছে, শুনতেও ভালো লাগছে, কেমন তাই না? এ থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ, তিনি কত সুন্দর বক্তৃতা করতেন। এখানে তো বক্তৃতার অনুবাদ পড়লে। মূল আরবীতে লেখা তাঁর বক্তৃতা পড়তে পারলে বুঝতে, আরবী ভাষায় তাঁর দখল ছিল কত বিরাট! তিনি কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। তিনি কুরআন-হাদিসের অর্থ অতি সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারতেন। নবীজীর সাথে সবসময় থাকতেন বলে কুরআন ও হাদিসের পটভূমিও তিনি জানতেন।

তোমাদের মতো বয়সেই আবু বকর (রা.) বহু চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারের আগে আরবে যখন সবাই মদ পান করত, তখনও তিনি মদ পান করতেন না। মদ পান করাকে খুব ঘৃণা করতেন। কোনা প্রকার হৈ চৈ ও উচ্ছৃঙ্খল কাজে তিনি শরিক হতেন না। তিনি ছিলেন সরল ও উদার।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর সততার কারণে সমাজের সব ধরনের লোকেরা তাঁর কাছে টাকা জমা রাখত। তিনি তোমাদের মতো বয়স থেকে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সরল মনে সবার বিপদ-আপদে এগিয়ে যেতেন। মেহমানদারী ও দান-খয়রাতের অভ্যাস তাঁর ছোটকাল থেকেই ছিল। গরিবের প্রতি তাঁর অফুরন্ত দরদ ছিল। সবাইকে তিনি ভালোবাসতেন। বিশ্বাস করতেন। কারো প্রতি তাঁর হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। এসব কারণে ইসলাম প্রচারের আগেও তিনি সমাজে খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। একটি ঘটনা থেকে তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তোমরা আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার লোকেরা যখন মুসলিমদের ওপর অত্যাচার-অবিচার শুরু করল, নিরুপায় হয়ে আবু বকর (রা.) অন্যান্য মুসলিমদের সাথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করলেন। রাস্তায় মক্কার সর্দারের সাথে তাঁর দেখা হয়! সর্দার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

সর্দার : কোথায় যাচ্ছ আবু বকর (রা.)?

আবু বকর (রা.): দেশবাসী আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন অন্য কোনো দেশে গিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী দিনযাপনের চেষ্টা করব।

সর্দার: তুমি দেশ থেকে চলে যেতে পারবে না। তোমার মতো মানুষকে বিদায় দেয়া যায় না। তুমি গরিব-অসহায়দের সাহায্য করো। আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি লক্ষ রাখো। মেহমানদের সেবা করো। বিপদে যারা পড়ে তাদের উদ্ধার করো। সুতরাং তোমার মতো উপকারী মানুষকে কোনোভাবেই বিদায় দেয়া যায় না। তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চলো। নিজের দেশেই স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে।

এ থেকেই বোঝা যায়, আবু বকর (রা.) জনগণের কত বড় উপকারী বন্ধু ছিলেন। তিনি খোদাভীরু ছিলেন। তাঁর খোদাভীরুতার কথা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। একবার এক সঙ্গীর সাথে তিনি হেঁটে কোনো এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গীটি বললেন: এ এলাকায় খুব খারাপ লোক বাস করে। এ কথা শোনামাত্র তিনি থেমে গিয়ে বললেন: এমন পথে তো আমি হাঁটতে পারি না। বলেই তিনি ফিরে চলে গেলেন।

এক ক্রীতদাস তাঁকে কিছু খাবার এনে দেয়। ক্রীতদাসের অনুরোধে তিনি তা থেকে কিছু খেয়ে নেন। শেষে ক্রীতদাস বললেন : আপনি কি জানেন, এ খাবার আমি কিভাবে পেয়েছি?

আবু বকর (রা.) : বলো ?

ক্রীতদাস : ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমি একজনকে ভাগ্য গণনা করেছিলাম। ভাগ্য গণনার আমি কিছু জানতাম না। শুধু তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর আজ সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। সেদিনের সেই ভাগ্য গণনার প্রতিদান স্বরূপ সে এই খাবার দিয়েছে।

আবু বকর (রা.) : হারাম খাবারে যে শরীর গড়ে ওঠে তা জাহান্নামী।

তিনি গলায় আংগুল দিয়ে সব খাবার বমি করে ফেলে দিলেন। আল্লাহকে কতটা ভয় করলে এমন দৃষ্টান্ত রাখা যায়, তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

তাঁর স্বভাব ছিল খুব নম্র। সাধারণ কাজও তিনি নিজের হাতে করতেন। সৈন্যেরা যখন কোনো অভিযানে

www.nagorikpathagar.org

রাজধানী থেকে বের হতো, তিনি তাদের সাথে হেঁটে হেঁটে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। খলীফার সম্মানে সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামতে চাইলে তিনি নামতে দিতেন না। অনেক সময় ঘোড়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তিনি দৌড়াতেন।

কেউ প্রশংসা করে তাঁকে কিছু বললে তিনি বলতেন- "মানুষ আমাকে খুব ওপরে তুলে দিচ্ছে। হে খোদা- তুমি আমার অবস্থা, আমার চাইতেও ভালো জানো। আর আমি নিজের অবস্থা এদের চাইতে ভালো জানি। হে খোদা তুমি আমাকে এদের ধারণার চাইতেও ভালো হওয়ার তওফিক দান করো। আমার সমস্ত গুনাই মাফ করো। লোকের প্রশংসার জন্য আমাকে দোষী করো না।"

গাছপালা দেখে তিনি বলেন উঠতেন, "হায় আমি যদি গাছ হতাম, তাহলে পরকালে কোনো হিসাবই দিতে হতো না।"

পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনে বলতেন, "হে পাখিরা আমার আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করো। দুনিয়ায় তোমরা কত না আনন্দ করছ, গাছের ছায়ায় দিন কাটাচ্ছো, কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না। যদি আমি তোমাদের মতো হতে পারতাম, তা'হলে কতই না ভালো হতো।"

তিনি অনেক সময় সারারাত জেগে নামাজ পড়তেন। প্রায় সময় রোজা রাখতেন। নামাজে দাঁড়িয়ে তিনি কান্নাকাটি করতেন। কোনো কোনো সময় কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় তিনি অঝোরে কাঁদতেন। এই জন্য সবাই তাঁকে 'আফসোসকারী' বলে ডাকত। তিনি খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। মোটা কাপড় পরতেন। অতি সাধারণ খাবার খেতেন। তাঁর সকল ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে কখনো কখনো তিনি দুই-তিন দিন ধরে উপস করেছেন। তিনি খুব হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী ছিলেন। গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। বুড়ো বয়সে তিনি চুলে মেহেদীর রঙ লাগাতেন।

আবু বকর (রা:) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা। পৃথিবীর এক বিশাল এলাকায় তখন ইসলামের শাসনব্যবস্থা জারি ছিল। এত বড় দেশের শাসক হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। কোনো অহঙ্কার তাঁর ছিল না। খলীফা হওয়ার আগে তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর অর্থ-সম্পদের কোন অভাব ছিল না। অথচ মৃত্যুর সময় ধন-সম্পদ বলে তার কাছে কিছুই জমা ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

৩. উমর ফারুকের গল্প শোনো

লড়াকু বালক

মেলা বসেছে। বছরে একবার বসে এই মেলা। হরেক রকম জিনিসের দোকান। কী সুন্দর থরে থরে সাজানো! শুধু কি দোকানপাট? গান-বাজনা, খেলাধুলা, ম্যাজিক-সার্কাস কোনোটারই অভাব নেই। ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে মেলায় এসেছে। অনেকে মেলা দেখার জন্য তাঁবু টানিয়ে বসবাস করছে। সে কী আনন্দ! কেউ খেলছে, কেউ খেলা দেখছে, কেউ বেচছে, কেউ কিনছে, কেউ গাইছে, কেউ তাল দিচ্ছে। সারা মেলা জুড়ে হৈ-চৈ হাসি-আনন্দ। মক্কার আশপাশের লোকের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু ছিলো না। মেলার এক কোণে বসেছে কুস্তিগীরদের আখড়া। আরবের প্রায় সব গোত্রের কুস্তিগীর তাঁবু ফেলেছে। প্রত্যেক গোত্রের সাথে রয়েছেন নামজাদা কবি-গায়ক ইত্যাদি। তারা নিজের নিজের গোত্রের গুণগান আর বড়াইর কথা বলে যাচ্ছেন। বলছেন নিজের নিজের কুস্তিগীরের বাহাদুরীর কথা। সুর করে, ছন্দ করে তারা আপন মনে বলে যাচ্ছে! লোকেরা শুনছে, বাহ্‌বা দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে। তোমরা যেমন খেলার মাঠে বাহবা দাও তেমন আর কি! সে কী অভাবিত দৃশ্য! সে কী আনন্দ! চারদিকে যেন কবিতার প্রতিযোগিতা! জম-জমাট পরিবেশ।

এক যুবক তাঁবুর সামনে বসে কুস্তিগীরের বাহাদুরীর কথা শুনছিল আর হাসছিল। সে কী প্রাণফাটা হাসি! দর্শকরা মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। যুবকের সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি শুধু একমনে শুনছেন আর হাসছেন।

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের কুস্তিগীরকে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সাথে লড়ব।'

সারা মেলায় খবর ছড়িয়ে পড়ল। কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখার জন্য যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এলো। ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী, বুড়ো-বুড়ি কেউ আর বাদ থাকলো না। যুবকের নাম শুনে সবাই এসে জড়ো হলো।

মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। যুবকটি বুকটান করে দাঁড়িয়ে থাকল। কুস্তিগীরকে বললো, 'তুমি আগে আঘাত করো।'

কুস্তিগীর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল যুককের ওপর। যুবকটি কায়দা করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর তার বুকের ওপর লাফ দিয়ে চড়ে বসলো। কুস্তিগীর যুবককে বুকের উপর থেকে সরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো ফল হলো না। যুবক পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে বুকের ওপর বসে থাকল। কুস্তিগীরের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। অবশেষে সে জীবন ভিক্ষা চাইল। যুবক হাসিমুখে তাকে ছেড়ে দিলো। সবাই যুবককে বাহবা দিলো।

মেলা শেষ হয়ে আসছে। বাকি রয়েছে শুধু ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক গোত্রের সেরা ঘোড়-সওয়ার আপন আপন তাজিঘোড়া নিয়ে মাঠে নেমেছেন। সেই বীর যুবকও নিজের কালো তাজি ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। কত ঘোড়া আর কত ঘোড়-সওয়ার। মাঠের চারদিকে লোকে-লোকারণ্য। ঘোড়দৌড় শুরু হওয়ার পর দেখা গেল যুবকের তাজি ঘোড়াই সবার আগে। ঐ এক পাক, দুই পাক, তিন পাক। না, যুবকের তাজি ঘোড়ার সামনে কোনো ঘোড়াই আসতে পারছে না। উল্কার মতো ছুটছে ঘোড়া। ঘোড়ার পা যেন মাটিতেই পড়ছে না। যুবক এই প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হলো। চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

কি কাজ করেন এই যুবক ? হ্যাঁ, এ যুবক রাখাল-উট পালক। মরুভূমিতে উট চরান। আমাদের দেশের রাখালরা মাঠে গরু চরায়। সবুজ মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে ওরা গাছের ছায়ায় ঘুমায়, গান গায়, বাঁশি বাজায়। কবি বলেছেন "রাখালী বাঁশির সুর সরল মধুর।" সত্যি ওরা সরল। তাই ওদের গান, ওদের বাঁশির সুর সবই সরল, সবই সহজ, সবই মধুর। নিরীহ, শান্ত গরুর পাল নিয়ে আমাদের দেশের রাখালদের তেমন কোনো কষ্ট হয় না। আল্লাহর দেয়া মাঠে ঘাস, লতাপাতা যেমন ছড়িয়ে আছে, তেমনই আছে কত নদ-নদী, খাল-বিল, তাই না? পানির পিপাসায় গরুর পালকে ছোটাছুটি করতে হয় না। নিকটে কাছে-ধারেই পানি পাওয়া যায়। অথচ মরুভূমির রাখালদের কি অবস্থা জানো? ওরা উট চরায় মরুভূমির বালুতে। মাটি নেই, ঘাস নেই, পানি নেই, গাছ নেই। মাইলকে মাইল শুধু ধু-ধু বালু। দুপুরের রোদে একটু ছায়াও নেই। রাখালকে এই রোদের মধ্যে উটের পিছে পিছে দৌড়াতে হয়। উট গরুর মত নিরীহ-শান্ত নয়, মেজাজী পশু। সামান্য লতাপাতার আশায় এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে। যুবক ছোটকাল থেকেই রাখাল। সুতরাং বুঝতেই পারছ কি কঠোর এবং কঠিন জীবন ছিল তার।

এভাবে অনেকদিন কেটে গেছে। নতুন ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে। গোপনে গোপনে লোকেরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে। যুবক তো রেগে টং! কী, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে হবে? কার এই আস্পর্ধা? কে বলে তাকে হত্যা করতে হবে। ঘরের বাঁদি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। শুনে তো যুবকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা। শুরু হলো মার। মারতে মারতে কাহিল হয়ে পড়েছেন যুবক। বলছেন, "থাম্ থাম। আমি একটু নিশ্বাস নেই। তারপর আবার শুরু হবে।" নতুন ধর্ম গ্রহণের জন্য রাগে দিশাহারা হয়ে বোন-ভগ্নিপতিকে মারছেন। খোলা তলোয়ার নিয়ে সবার সামনে ধর্ম-প্রচারককে হত্যা করার জন্য ছুটছেন।

আবার নতুন ধর্ম গ্রহণ করে কারো পরোয়া না করে সবার সামনে সত্যের প্রচার করছেন, হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। দুশমনের স্বপ্ন সাধ মিটিয়ে দিচ্ছেন। ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে কোনো আপস করছেন না।

এই দুর্দান্ত, কঠোর, মেজাজী, বীর ও আল্লাহভীরু লোককে সবাই মিলে শাসনকর্তা বানালেন। তিনি তখন ব্যবসায়ী। অবস্থা তাঁর বেশ ভালো। শাসন কাজের জন্য ব্যবসা ছাড়তে হলে লোকেরা তাঁর ভাতা ঠিক করে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর সংসার চলছে না। সবাই চিন্তিত হলেন। তাঁর ভাতা বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হলে বললেন, "যারা এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তাদের নাম জানলে, এমন শাস্তি দিতাম যে মুখে দাগ পড়ে যেত।"

শাসনকর্তা মসজিদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। তাঁর কাপড়ে অনেক তালি। তার মধ্যে একটি আবার চামড়ার।

মসজিদে আসতে দেরি হয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়ে বলছেন, "আমাকে নিজেই কাপড় ধুতে হয়। এ কাপড়টি ছাড়া অন্য কোনো কাপড় আমার নেই। এটা শুকাতে একটু দেরি হয়ে গেছে।"

মেহমানকে নিয়ে খেতে বসেছেন। রুটিগুলো গেলা যাচ্ছে না। মেহমান বলছেন, "আটাগুলো ছেকে নিয়ে রুটি করলে ভালো হতো।" শাসনকর্তা বলছেন, "সবাই কি মিহি আটার রুটি খেতে পায় ?"

www.nagorikpathagar.org

মেহমান : না পায় না।

শাসনকর্তা : তাহলে আমি খাই কি করে?

খুব অসুখ। সবাই বললেন মধু খেতে। কিন্তু কোথায় মধু কেনার পয়সা? তাঁর ঘরে তো কেউ মধু খেতে পায় না। সরকারি গুদামে অনেক মধু আছে। সবাই বলল, সেখান থেকে কিছু আনতে। শাসনকর্তা বললেন, না জনসাধারণের অনুমতি নিতে হবে। শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো। লোকেরা জমায়েত হলেন। শাসনকর্তার পক্ষ থেকে সামান্য একটু মধুর জন্য আবেদন করা হলো। লোকেরা আবেদন মঞ্জুর করলেন। শাসনকর্তা অসুখের কারণে কিছু মধু পেলেন।

শাসনকর্তার স্ত্রী এক রাজ-রানীর কাছে উপহার হিসেবে কয়েক শিশি সুগন্ধি পাঠান। রাজ-রানী শিশিগুলো ভর্তি করে মণিমুক্তা পাঠিয়ে দেন। শাসনকর্তার স্ত্রী তো খুব খুশি। মনে মনে ভাবলেন, এবার আমাদের অভাব ঘুচে যাবে। শাসনকর্তা ঘটনা শুনে বললেন, "এসব তুমি পাবে না। সরকারি কর্মচারী মারফত উপহার গিয়েছে এবং এসেছে। সুতরাং এগুলো সরকারই পাবে। তুমি শুধু সুগন্ধির দাম পেতে পারো।"

দেখলে তো কেমন শাসনকর্তা! আজকালকার শাসনকর্তা হলে ঘটনাটা কাউকে জানাত না। মণি-মুক্তাগুলো নিজেরা রেখে দিত। জনগণ এর কোনো অংশই পেত না।

এখন বল—কে এই যুবক, কে এই কুস্তিগীর, কে এই রাখাল, কে এই শাসনকর্তা ?

তাঁকে তোমরা সবাই চেন, সবাই জানো। তাঁর নাম তোমরা অনেক শুনেছ। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা:), যাঁর কথা কবি বলেছেন :

অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন ধুলার তখতে বসি,
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি,
সাইমুম ঝড়ে পড়েছে কুটির, তুমি পড়নিক নুয়ে
ঊর্ধ্বে যাহারা পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।

www.nagorikpathagar.org

বাদশার টাকা ধার

তোমরা যারা রাজধানী বা মফস্বল শহরের স্কুলে পড়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে গাড়িতে বা রিকশায় চড়ে স্কুলে আস। ড্রাইভার বা অন্য কেউ তোমাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার ছুটির সময় এসে নিয়ে যায়। অনেকে সাথে নাশতা নিয়ে আস। অনেকের নাশতাও আবার সময়মতো স্কুলে পৌঁছে যায়। কত রঙ-বেরঙ এর জামা-কাপড় তোমাদের। স্কুলের পোশাক আলাদা, ঘুমানোর পোশাক আলাদা, এমনকি পরে থাকার পোশাক আলাদা, বাইরে বেড়ানোর পোশাক আলাদা। কত ধরনের খেলাধুলা, আমোদ-প্রামোদের ব্যবস্থা রয়েছে তোমাদের জন্য। শুধু সুখ আর সুখ তোমাদের জীবনে।

অথচ তোমাদের পাশাপাশি এমন অনেক ছেলে-মেয়েই স্কুলে আসছে, যাদের গায়ে ভালো জামা-কাপড় নেই। যাদের কেউ পৌঁছে দেয় না, নিয়েও যায় না। নাশতা আসে না, নাস্তা খায় না। সব সময় মন-মরা হয়ে থাকে। এদেরকে সবাই গরীব বলে। সবাই জানে, এদের বাবারা ছোট-খাটো চাকরি করে। সামান্য ক'টা টাকা বেতন পায়, তা দিয়ে তাদের অভাব পূরণ হয় না। এদের তোমরা হয়তো জামা-কাপড়ের জন্য টিটকারী করো। ওরা বাসায় গিয়ে বাবা-মার কাছে কাঁদাকাটি করে। বলে, আমাদের জন্য ভালো জামা-কাপড় এনে দাও। কেউ কেউ জিদ করে বলে, ভালো কাপড়-চোপড় না দিলে স্কুলে যাব না। অনেকে মনের দুঃখে লেখাপড়াও ছেড়ে দেয়। জামা-কাপড় না পেয়ে অনেকে স্কুলে যায় ঠিকই, কিন্তু ক্ষোভে-দুঃখে আর পড়ালেখায় মন বসাতে পারে না। এভাবে অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। এরা গরিব, এদের এমন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। কিন্তু কোনো রাজা-বাদশাহর ছেলের জীবনে এমনটি ঘটলে সত্যি অবাক হতে হয়। সেটা কাহিনী হয়। গল্প হয়। আর সে অবাক করা গল্প আমরা না পড়েও পারি না।

এক বিরাট বড় বাদশাহ। বলতে গেলে অনেক বাদশাহর বাদশাহ। দেশ নয়, কয়েকটি মহাদেশ জুড়ে তাঁর রাজ্য-সাম্রাজ্য। রাজ্যে-রাজ্যে তাঁর শাসনকর্তা, সৈন্য-সামন্ত। দেশের পর দেশ তিনি জয় করে চলেছেন। বাদশাহর ধন-ভাণ্ডারে টাকা-পয়সা, মণি-মুক্তার কোনো অভাব নেই। রাজ্যে সুখ-শান্তিরও কোনো অভাব নেই। এমন একজন বাদশাহর ছেলে স্কুলে থেকে ফিরে এসে মনের দুঃখে ফুঁপিয়ে-ফাঁপিয়ে কাঁদছে। বাদশাহ তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে বাবা, কাঁদছ কেন ?"

ছেলেটি মনের আবেগে কথাই বলতে পারছে না। অনেক কষ্ট করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "সবাই আমাকে টিটকারী দেয়। বলে, দেখ না আমার অবস্থা, চৌদ্দ জায়গায় তালি। বাপ নাকি আবার মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা।"

আর কথা বলতে পারে না। এবার সে জোরে কাঁদতে লাগল। বাদশাহ তাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, "আচ্ছা দেখি কি করা যায়।"

অনেক-অনেক ভাবলেন বাদশাহ। কিন্তু কোনোভাবেই একটি জামার টাকা তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না। খুব অবাক লাগছে কথাটা শুনে, তাই না? আসলে এই শাসনকর্তা মনে করতেন, রাজ-ভাণ্ডারের যত

www.nagorikpathagar.org

ধন-রত্ন আছে তা সবই জনসাধারণের। সে জন্যই তাঁর এত অভাব। হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি এলো। তিনি ভাণ্ডারের রক্ষকের কাছে একটা চিঠি লিখে পাঠালেন, "আমাকে আগামী মাসের ভাতা থেকে চার দেরহাম ধার দেবেন।"

ভাণ্ডার-রক্ষক জবাবে লিখে জানালেন : আপনি ধার নিতে পারেন, কিন্তু কাল যদি আপনি মারা যান, তা'হলে কে আপনার ধার শোধ করবে?

বাদশাহ ভাবলেন, তাই তো, ভাণ্ডার-রক্ষক ভালো কথাই বলেছে। আমি দেনা নিয়ে মরব, সে তো হতেই পারে না। তিনি মনে মনে ভাণ্ডার-রক্ষকের জন্য দোয়া করলেন।

অবশেষে বাদশাহ ছেলের গা-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "যাও বাবা, যা আছে তা পরেই স্কুলে যাও। আমাদের অনেক টাকা-পয়সা নেই। আমি শাসনকর্তা সত্য কিন্তু এই ধন-সম্পদ তো আমার নয়। এ সবই তো জনসাধারণের। আমি শুধু রক্ষক মাত্র। এখান থেকে আমি অতিরিক্ত টাকা নিতে পারি না।"

কী অবাক করা কাণ্ড, তাই না! কোনো পিয়ন-চাপরাশি, দিনমজুর বা ভিখারীর ছেলে নয়। স্বয়ং বাদশাহ বা শাসনকর্তার ছেলে!

তোমরা যারা ভালো ভালো জামা-কাপড় পরে স্কুলে যাও তারা কি রাজা-বাদশাহর ছেলে? নিশ্চয়ই নও। বড়জোর ব্যবসায়ী বা বড় চাকুরের ছেলে। একজন ব্যবসায়ী বা চাকুরের ছেলে হয়ে তোমরা যে শান-শওকতে থাক, সে হিসেবে বাদশাহর ছেলে আরাম-আয়েশ বা শান-শওকতের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। দুনিয়ায় এমন অনেক বাদশাহর ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের নিজস্ব হেলিকপ্টার রয়েছে। গাড়ি-ঘোড়ার তো হিসাব নেই। এসব বাদশাহ কোথায় এত টাকা পয়সা পায়? সবই জনসাধারণের টাকা-পয়সা। জনসাধারণকে ঠকিয়ে রাজা-বাদশাহ, শাসনকর্তা এবং কর্মচারীরা তা ভোগ করে। এ কারণেই তারা অতো শান-শওকত করতে পারে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাদশাহর ছেলেকে টিটকারী করছে কারা? ঐ দেশেরই সাধারণ কর্মচারী বা কৃষক-মজুরের ছেলেরা। ঠিক উল্টো ব্যাপার আর কি! তোমরা টিটকারী করো গরিব কর্মচারীর ছেলেদের আর ওরা যারা টিটকারী করেছিল তার ঐ দেশের সবচেয়ে গরিব লোক। বাদশাহ সামান্য ভাতা পেতেন, তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। আর জনসাধারণ চাষবাস করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং এরপরেও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ধন-সম্পদ পেত। এ জন্য ওদের আয় ছিল অনেক বেশি। সহকারী কর্মচারীরাও তাঁর থেকে বেশি ভাতা পেতেন।

তোমাদের স্কুলে পৌছাবার জন্য সরকারি তহবিল থেকে প্রতিদিন কত হাজার হাজার টাকা চলে যাচ্ছে কে তার হিসাব করছে? সরকারি ড্রাইভার, সরকারি গাড়ি এবং সরকারি পেট্রল সরকারের অনুমতি ছাড়াই তোমাদের জন্য ব্যয় হচ্ছে। একেই বলে ক্ষমতার অপব্যবহার অথচ বাদশাহ হয়েও সাধারণ নাগরিকের মতো তিনি তার ভাতা থেকে মাত্র চারটি টাকা ধার চেয়েছিলেন। তাও তিনি পেলেন না। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

এখন বলো, কে ছিলেন এই বাদশাহ বা শাসনকর্তা? তিনি রাজাও নন বাদশাহও নন। তিনি খলীফা। তিনি আমীরুল মোমেনীন। তিনি হযরত ওমর (রা.)।

www.nagorikpathagar.org

প্রাসাদ পুড়ে ছাই

রাজা-বাদশাহ, শাসনকর্তা, কার না প্রাসাদ থাকে বলো। এক শাসনকর্তা দিগ্বিদিক জয় করে নিজের জন্য শখ করে একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। সে প্রাসাদের কাহিনী শোন।

ওমরের (রা:) রাজত্বকাল। সেনাপতি সা'দ পারস্য জয় করেছেন। জয়ের পর ওমর (রা:) তাঁকে পারস্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। একবার তাঁর শখ হলো পারস্যের রাজধানী কুফাকে সুন্দর করে সাজাবেন। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি পারস্যের রাজার বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের সামগ্রী দেখেছেন। সেসব তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আহা! কী সুন্দর দালান-কোঠা! কী বিপুল আরাম-আয়েশ! তাঁর খুব লোভ হলো। তিনি সে অনুযায়ী দালান-কোঠা বানাতে লাগলেন। নিজের জন্য খুব সুন্দর করে একটা প্রাসাদ বানালেন। তারপর আগের রাজা খসরুর প্রাসাদের একটা তোরণ এনে নিজের প্রাসাদের সামনে লাগালেন। মনে মনে ভাবলেন, সারা জীবনই তো কষ্ট করেছি। আর কত? এই বয়সে একটু আরাম করি।

সত্যি সেনাপতি সা'দ অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। ইসলামের জন্য তাঁরা প্রথম যুগে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন, সা'দ তাঁদেরই একজন। ইসলামের বিপদের দিনে সা'দ ছিলেন অনেক বড় বন্ধু। ইসলামের বিজয় পতাকা পত পত করে উড়ছে। মুসলমানদের দরিদ্রতা দূর হয়েছে। চারদিকে সুখ আর শান্তি। এ অবস্থায় বিরাট রাজ্যের শাসনকর্তার একটা প্রাসাদ থাকবে—এ তো একেবারেই মামুলি ব্যাপার।

খবরটা ওমর (রা:)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রাগে গড়-গড় করতে থাকলেন। বুঝলেন সা'দ অন্যায় পথে পা বাড়িয়েছেন। তাঁকে একটি চিঠি দিলেন। বললেন, "এখনই কুফায় যাও, গিয়ে সা'দের প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দাও। সা'দ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে এই চিঠিখানা দেবে।"

দূত ছুটল কুফার দিকে। খলীফার নির্দেশ মতো সা'দের প্রসাদে সে আগুন লাগিয়ে দিলো। কুফাবাসী অবাক। তাদেরই সামনে শাসনকর্তার প্রাসাদ পুড়ছে। সা'দ অবাক হয়ে খলীফার দূতের কাছে আগুন লাগানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দূত কোনো কথা না বলে খলীফার চিঠিটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কম্পিত হাতে সা'দ চিঠিখানা খুললেন। তাতে লেখা ছিল :

"শুনতে পেলাম, নিজের আরাম-আয়েশের জন্য খসরুর প্রাসাদের একটা দরজা এনে তোমার প্রাসাদে লাগিয়েছ। দরজায় দারোয়ান-সিপাইও রেখেছ। জনসাধারণ এখন অভাব-অভিযোগ জানাতে যাবে কি করে? তুমি রাসূলের আদর্শ ত্যাগ করে খসরুর আদর্শ গ্রহণ করেছ। মনে রেখো, বিরাট প্রাসাদে বাস করেও খসরুর দেহ কবরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর নবীজী কুঁড়েঘরে বাস করেও সবচেয়ে আরামদায়ক বেহেশতে বাস করছেন।

www.nagorikpathagar.org

মাসলামাকে তোমার ঐ প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলার জন্য পাঠালাম। বসবাসের জন্য একটা কুটির এবং সরকারি কাজের জন্য একটা খাজাঞ্চিখানাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

সা'দ নত হয়ে থাকলেন। দু'চোখ দিয়ে তাঁর ঝরনাধারার মতো পানি ঝরতে থাকল। বুঝলেন, কত বড় ভুল তিনি করেছিলেন। আল্লাহর কাছে খুব কাঁদাকাটি করলেন। ওমরের (রা.) নির্দেশ মতো কুঁড়েঘরেই তিনি উঠলেন। সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

দেখলে তো, কী কঠোর শাসন! খলীফা যদি এই কঠোরতা না দেখাতেন, তা'হলে কি হতো জান? সা'দ শাসনকর্তা থেকে ধীরে ধীরে বাদশাহ বনে যেতেন। জনসাধারণ থেকে আস্তে আস্তে তিনি দূরে সরে পড়তেন, ততই তিনি আরাম-আয়েশে-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতেন। আর এই বিলাসিতার জন্য টাকা-পয়সা, ধন-রত্নের যোগান দিত কে? জনগণকেই বাধ্য হয়ে এসব দিতে হতো। তাতে জনগণের ওপর অত্যাচার হতো। জনগণ ধীরে ধীরে গরিব হয়ে পড়ত। আর এভাবেই বহু ত্যাগ-তিতিক্ষায়, বহু কষ্টে, বহু সংগ্রামে এবং বহু রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা একটি আদর্শ ধ্বংসের দিকে পা বাড়াত। খলীফা আগুন লাগিয়ে দিয়ে এবং সা'দ তা মেনে নিয়ে শুধু যে সে ধ্বংসের হাত থেকে সেই আদর্শকে বাঁচিয়েছেন তাই নয়, বরং ইসলামের আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। যাদের মনে সর্বশ্রেষ্ঠ এই আদর্শ সম্পর্কে তখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল তারা অবাক হয়ে দেখল এবং ভাবল, এত বড়, এত শক্তিশালী, এত জীবন্ত এই আদর্শ। একে আটকায় কে? এর গতি, এর বিজয় আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কিন্তু এ যুগের মুসলমান শাসনকর্তা, রাজা-বাদশাহদের কি অবস্থা, তা কি তোমরা জান? সবাই আরাম-আয়েসে এবং বিলাশে গা ভাসিয়ে চলেছে। কে তাদের বাধা দেবে? সবার ওপরে একজন খলীফাও নেই যে, শক্ত হাতে সবাইকে শাসন করবেন। এ যুগে ওমরের মতো একজন খলীফা যে কত প্রয়োজন, বড় হলে তোমরা তা বুঝতে পারবে।

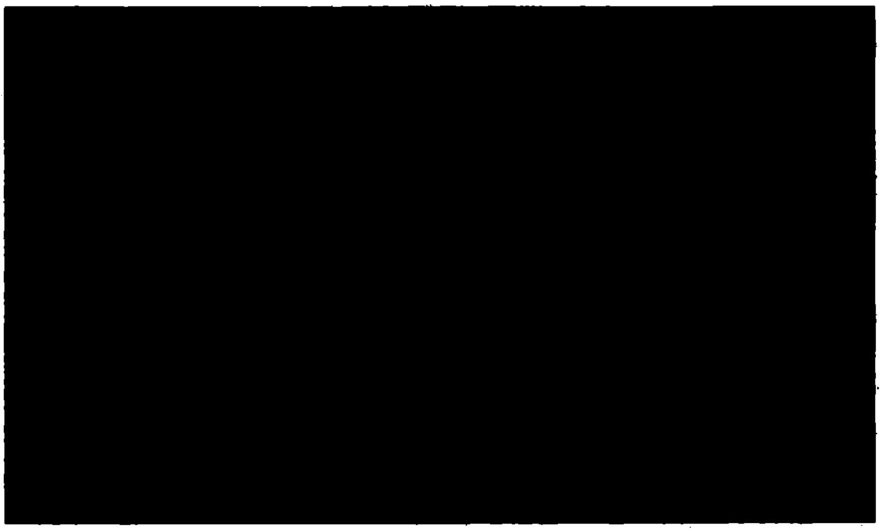

www.nagorikpathagar.org

উপযুক্ত পুরস্কার

গভীর রাত। চারদিকে অন্ধকার। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘুমে অচেতন। এক বুড়ি আর তাঁর মেয়ের চোখে ঘুম নেই। সংসারের চিন্তায় তারা অস্থির। কি করে সামনের দিনগুলো চলবে? মাত্র কয়েকটা ছাগল। এগুলোর দুধ বেচে কী আর সংসার চালানো যায়? কোনোমতেই আর সংসার চলে না। এর মধ্যে অনেক দায়-দেনাও হয়ে গেছে। সেগুলো শোধই বা করবে কি করে?

বুড়ি মা : আচ্ছা মা, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করলে হয় না?

মেয়ে : কেন?

মা : তাহলে আমাদের অবস্থা একটু ভালো হতো।

মেয়ে : না, তা কি কখনো হয় মা?

মা : কেন হয় না! আমরা যে খুব কষ্টে আছি।

মেয়ে : কষ্টে থাকলেই অমন অন্যায় কাজ করতে হবে?

মা : বেঁচে থাকার জন্য এটুকু অন্যায় আল্লাহ মাফ করে দেবেন।

মেয়ে : না মা, ওসব বলো না। খলীফার আদেশ শুনোনি?

মা : কোন আদেশ?

মেয়ে : কয় দিন আগেই তো জারি করা হয়েছে, "দুধে কেউ পানি মেশাতে পারবে না।"

মা : হোক না খলীফার আদেশ। কেউ তো আর দেখতে আসছে না।

মেয়ে : ছি! ছি! অমন কথাও মুখে নিও না মা। খলীফার হুকুম আমাদের প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। আর তাছাড়া আল্লাহ তো আছেন, তিনি দেখবেন না? খলীফার চোখকে না হয় ফাঁকি দিলে, কিন্তু আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেবে কেমন করে?

মা : আল্লাহ দয়ালু, ক্ষমাশীল, তিনি মাফ করে দিবেন।

মেয়ে : না মা, এসব অন্যায় আল্লাহ কখনো মাফ করেন না। তুমি মানুষকে ঠকাবে, মানুষকে ফাঁকি দিবে—আর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, তা হয় না।

খলীফা ওমর দাঁড়িয়ে তাদের সব কথা শুনলেন। তিনি জনসাধারণের অবস্থা জানার জন্য বের হয়েছিলেন। প্রায় রাতেই তিনি বের হতেন। চুপিচুপি হাঁটতেন। দেখতেন, কে কি অসুবিধায় আছে। মানুষের ঘরে কান পেতে শুনতেন। কারো কোনো অভাব-অভিযোগ আছে কি না। কেউ কোনো বিপদে-আপদে পড়েছে কি না। কেউ বিপদে-আপদে পড়লে নিজেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন। কেউ অভাবে পড়লে সরকারি তহবিল থেকে নিজেই খাদ্যসামগ্রী এনে দিতেন। আজ বের হতেই কুটিরের কাছে

www.nagorikpathagar.org

কথা শুনেই তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। ভালো করে সব কথা শুনেছেন। মনটা তাঁর খুশিতে ভরে গেল। তাঁর রাজত্বে সত্যের অনুসারীর অভাব নেই। আল্লাহর কাছে তিনি শোকর আদায় করলেন। পরম তৃপ্তির সাথে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। সারারাত তিনি ভেবেছেন, সত্যের এই অনুসারীকে কি পুরস্কার দেবেন? একে যদি পুরস্কার না দেয়া হয় তাহলে ন্যায়ের প্রতি, সত্যের প্রতি সুবিচার করা হয় না! দুষ্টকে দমন করার জন্য যেমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি ভালোর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। না হলে ভালো লোকেরা উৎসাহ পাবে না, প্রেরণা পাবে না। আর এ ধরনের লোকেরা যদি পুরস্কার না পায় তাহলে আল্লাহর কাছেই বা কী জবাব দেবেন?

পরদিন দরবারে বসেও এ ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছেন। তারপর মনে মনে একটা কিছু ঠিক করে সে মেয়েকে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো মেয়েটিকে খলীফার সামনে হাজির করা হলো। সে তো ভয়ে অস্থির। না জানি কি অপরাধ সে করেছে। অনেক বার ভাবল। না! তেমন কোনো অপরাধ তো সে করেনি। তাহলে কেন তাকে ডেকে আনা হয়েছে? খুব ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি। খলীফা নিজের ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের কাছে গত রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তাঁরা মেয়েটিকে প্রশংসা করলেন। খলীফা বললেন, "এই মেয়েকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হবে। কি পুরস্কার দেয়া যায় বলো।"

কেউ কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর খলীফা বললেন, "একে আমি বৌমা করতে চাই। তোমরা কে রাজি আছ, বলো ! তোমাদের জন্য এর চেয়ে ভালো মেয়ে আর নাই।"

ছেলেদের মধ্যে একজন রাজি হয়ে গেলেন। এবার মেয়ের মতামত নেয়ার পালা। মেয়েকে সব কিছু খুলে বলা হলো। সে রাজি হলো। অবশেষে খলীফার ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হলো। সবাই খুশি হলো। গ্রামের এক অজানা-অচেনা সাধারণ মেয়ের সাথে আমীরুল মোমেনীনের ছেলের বিয়ে হলো। কী অবাক করা কাণ্ড তাই না! মেয়ের রূপ দেখে নয়, বংশ দেখে নয়, জ্ঞান-গরিমা, অর্থ-সম্পদ কোনো কিছু দেখে নয়, শুধু তার সততা, তার আল্লাহ-ভীতি দেখে খলীফা তাকে অতি আপনজন করে নিয়েছিলেন। খলীফা মনে করেছিলেন, ঐ একটি মাত্র গুণই সবচেয়ে বড় গুণ। এ গুণ যার মধ্যে আছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই তাকে যোগ্য পুরস্কার তিনি দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সবাই তখন এক কাতারে

ধর্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে, বংশ নিয়ে দুনিয়ায় কত মারামারি, কত কাটাকাটি! ওমর (রা.) ও সবের কোনো মূল্য দিতেন না। ওমর ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ধর্মের অন্ধ ছিলেন না। অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণা ছিল না। তিনি সকল ধর্মের লোকদেরকেই সমান চোখে দেখতেন। খ্রিষ্টান মহিলার কলসীর পানি দিয়ে তিনি অজু করেছেন। খ্রিষ্টানদের তৈরি খাদ্য নিজে খেয়েছেন, অন্যদের খেতে বলেছেন। ওমরের (রা.) চাকর ছিল খ্রিষ্টান। মদীনার ভূমিকর অফিসার ছিল খ্রিষ্টান। ইরাক, সিরিয়া, মিসরে শতশত খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের তিনি চাকরি দিয়েছেন। ছোটো-খাটো চাকরি নয়, বড় বড় চাকরি। কাউকে বেকার থাকতে দেননি। নওজোয়ানদের চাকরি দিয়েছেন, বুড়ো ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পেনশনের ব্যবস্থা করেছেন। মৃত্যুর আগে অন্য ধর্মের লোকদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তাই ওদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর জীবন-কাহিনী শুনলেই বুঝতে পারবে ওমর (রা.) অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি কেমন ব্যবহার করেছেন।

একদিন ওমর (রা.) দেখলেন, এক বুড়ো খ্রিষ্টান দুর্বল শরীর নিয়ে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করছে। ওমরের (রা.) খুব দয়া হলো। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই শরীর নিয়ে তিনি ভিক্ষা করছেন কেন? বুড়ো তার অভাবের কথা খুলে বললো। ওমর (রা.) খুব ব্যথা পেলেন। তাকে সাথে করে নিজের বাড়ীতে আনলেন এবং কিছু টাকা-পয়সা দিলেন। সাথে সাথে নির্দেশ জারি করলেন, বুড়ো ও অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পেনশন দেয়া হবে। ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর নামে বলছি, এটা কখনই উচিত নয় যে, আমরা জনগণের যৌবনকালকে কাজে লাগাব, আর বুড়ো হয়ে গেলে তাদের পথে ফেলে দেবো।"

ওমর (রা.) ধর্মমতে যেমন উদার ছিলেন, তেমনি ছিলেন 'কুসংস্কারমুক্ত'। হজের সময় কা'বার চারদিকে তিনবার দৌড়ানোর প্রথা আছে। ওমর (রা.) বলেছিলেন, এখন আর দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই। বিধর্মীদের দেখানোর জন্য এ হুকুম জারি হয়েছিল, এখন তো আর বিধর্মী নেই। কিন্তু নবীজীর স্মৃতি জড়িত বলে ওমর (রা.) প্রথাটি বন্ধ করেননি। তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনেক নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। যেমন : মসজিদে খোতবার রেওয়াজ চালু, জানাজার নামাজে চার তকবির দান, ফজরের আজানে 'নিদ্রার চেয়ে নামাজ উত্তম' শব্দ ঢুকান, জামাতে তারাবীহ নামাজ পড়া ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

বংশ-মর্যাদা, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র সব তাঁর কাছে সমান ছিল। জাবালা নামে এক গোত্রের সরদার ইসলাম গ্রহণ করেন। একদিন কা'বা শরীফের চারদিকে ঘোরার সময় হঠাৎ তাঁর পাগড়ি একজন সাধারণ লোকের পায়ের নিচে পড়ে। জাবালার মর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি রেগে গিয়ে লোকটিকে থাপ্পর মারেন। লোকটিও তাঁকে পাল্টা থাপ্পর মারে। জাবালা তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়ে ওমরের (রা.) কাছে নালিশ করেন। ওমর (রা.) রায় দেন, উচিত শাস্তি হয়েছে। ওমর (রা.) হাসি মুখে বলেন, "অন্ধকার যুগে সে নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু ইসলাম উঁচু-নীচু সকলকে একই কাতারে এনে দিয়েছে।"

একবার কুরায়েশ সরদার ওমরের (রা.) সাথে দেখা করার জন্য আসেন। সেখানে তখন বেলালসহ কয়েকজন মুক্ত-ক্রীতদাসও ছিলেন। ওমর (রা.) প্রথমে মুক্ত-ক্রীতদাসদের ডেকে পাঠালেন। কুরায়েশ সরদাররা অপেক্ষা করতে লাগলেন। ব্যাপারটাতে তাঁরা অপমানবোধ করলেন। আবু সুফিয়ান নামের একজন নামজাদা লোক আক্ষেপ করে বলেই ফেললেন, "হায়রে কপাল, হায়রে ভাগ্য! মুক্ত-ক্রীতদাসরা আগে দেখা করার সুযোগ পায়; আর আমরা বাইরে বসে অপেক্ষা করি।"

এই ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কোথা থেকে তিনি এসব শিখেছিলেন ? নিজের থেকে? না। তবে কোথা থেকে? এক কথায় বলা যায়, ইসলাম থেকে। কবি বলেছেন না :

"ইসলাম সেতো পরশ মানিক
তারে কে পেয়েছে খুঁজি,
পরশে তাহার সোনা হলো যারা
তাদেরই মোরা বুঝি।"

www.nagorikpathagar.org

জবাবদিহির নমুনা

জবাবদিহি কথাটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। মুরুব্বিরা বলেন, দুনিয়ার সমস্ত কাজের জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সরকার বলেন, "আমাদের সমস্ত কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।" ভোটের সময়, নির্বাচনের সময়, নেতারাও একই কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবে যাঁরা একবার নেতা হন, শাসক হন, বিচারক হন, অফিসার হন, রাজা হন, বাদশাহ হন, তাঁরা কেউ আর তাঁদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করেন না। তাঁরা জনগণের খাদেম না হয়ে জনগণকেই তাদের প্রজা, তাদের গোলাম, তাদের দাস বানান। সুতরাং গোলাম বা দাসদের কাছে জবাবদিহি করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমরা কি আমাদের চাকর-বাকরদের কাছে কোনো জবাবদিহি করি? করি না। বরং তারাই আমাদের কাছে জবাবদিহি করতে করতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাজা-বাদশাহ, শাসক-নেতা, অফিসার-কর্মচারী সবাই জনগণকে তাদের খাদেম বা আজ্ঞাবহ দাস মনে করেন। তাই নানা ছুতা-নাতায় জনগণকেই তাঁদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

নেতা, শাসক, রাজা-বাদশাহ তো দূরের কথা, আমাদের দেশের জনগণ সাধারণ কর্মচারীর সামনে কথা পর্যন্ত বলতে সাহস পায় না। কৈফিয়ত তলব বা জবাবদিহি করার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। শুধু আমাদের দেশে কেন, দুনিয়ার বহু দেশ আছে যেখানে নেতাদের সমালোচনা করা দূরের কথা, সরকারি কাজের সমালোচনা করলেও প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হয়। রাজা-বাদশাহ, শাসনকর্তারা তো নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলেন। তাঁদের খেয়াল–খুশি মতো দেশ চালান, দেশের মানুষদের চালান। তাঁরা আবার কার কাছে যাবেন জবাবদিহি করতে? তারাই তো হর্তা-কর্তা, বিধাতা। এই ছিল এবং এই হলো সারা দুনিয়ার অবস্থা।

অথচ অবাক হয়ে যাবে, অর্ধেক পৃথিবীর তিনি শাসক। যাঁর ভয়ে সমস্ত দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কাঁপত, যাঁর ভয়ে বড় বড় যোদ্ধা, বড় বড় সেনাপতি জড়োসড়ো থাকত, সেই রাজাধিরাজ, বাদশাহর বাদশাহ সাধারণ কারণে সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতেন। যাঁরা তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতেন তাঁদের ওপর তিনি খুশি হবেন। তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একদিন ওমর (রা:) মদীনার রাস্তায় একা হাঁটছিলেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ লোক তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। ওমর (রা:) দাঁড়ালেন। লোকটি বলল, "ওহে ওমর! আপনার কি আল্লাহর ভয় নাই? আপনি বুঝি ভেবেছেন, কর্মচারীদের জন্য হুকুমনামা পাঠালেই আপনি আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পাবেন?"

ওমর (রা:) ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কি হয়েছে ভাই?" লোকটি বলল, "আপনি কি খবর রাখেন, মিসরের শাসক মিহি কাপড় পরিধান করেন এবং দরজায় দারোয়ান রাখেন?"

www.nagorikpathagar.org

ওমর (রা.) বিনয়ের সাথে বললেন, "না ভাই, আমি তো কিছুই জানি না।"

ওমর (রা.) সেদিনই মিসরে দূত পাঠালেন। দূতকে বললেন, "অভিযোগ সত্য হলে তাকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ধরে নিয়ে আসবে।"

দূত মিসরের শাসককে ধরে আনল। ওমর (রা.) দেখলেন তাঁর গায়ে মিহি কাপড়ের পোশাক। হুকুম দিলেন, "পোশাক খুলে মোটা কাপড় পরিয়ে দাও।"

আদেশ মতো তাই করা হলো।

ঘটনা কি এখানেই শেষ? আরে না! এক পাল মেষ এনে মিসরের শাসকের সামনে দিয়ে বললেন, "যাও, এবার বনে-জঙ্গলে মেষ চরাও গে।"

এরপর মিসরের শাসক আজীবন মেষের রাখালী করে জীবন নির্বাহ করেছেন।

আরেক দিনের ঘটনা। ওমর (রা.) মসজিদে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে। এক মুসল্লি দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, তারপর আপনার কথা শুনব।"

তখনই ওমর (রা.) বক্তৃতার জন্য নির্ধারিত উঁচু জায়গা থেকে নিচে নেমে এসে বললেন, "বলো, কি তোমার প্রশ্ন ?"

লোকটি বলল, "সরকারি তহবিল থেকে আমরা সবাই এক টুকরা করে কাপড় পেয়েছি। অথচ আপনার গায়ে দু'টুকরা কাপড় দেখা যাচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এই কাপড় পেলেন ?"

মুসল্লিরা সাবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। খলীফা নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, "তুমি এর জবাব দাও।"

আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি আমার অংশের টুকরাটি বাবাকে দান করেছি। ঐ দুই টুকরা দিয়ে এই পোশাক তৈরি হয়েছে।"

লোকটি বলল, "আমীরুল মোমেনীন, এবার আমরা আপনার কথা শুনব।"

খলীফা ওমর (রা.) হেসে বললেন, "আল্লাহ, আমি কত ভাগ্যবান। ওরা আমার কৈফিয়ত তলব করতেও ভয় করে না।"

অন্য একদিনের ঘটনা। ওমর (রা.) বিরাট জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। হাজার হাজার লোক নীরবে তাঁর কথা শুনছে। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, "বন্ধুগণ, আমি যদি বিপথে চলি, যদি লোভ-লালসায় পড়ে যাই, তখন আপনারা কি করবেন ?"

বলামাত্রই এক লোক মাথা তুলে দাঁড়াল এবং তরবারি উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, "তা হলে! আমিরুল মোমেনীন! অবশ্যই মাথা কেটে ফেলব।"

লোকটির সাহস পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ওমর (রা.) ধমক দিয়ে বললেন, "আপনি এ কথা কাকে বলছেন? খলীফাকে? লোকটি নির্ভয়ে বলল, "হ্যাঁ ওমর, আমি আপনাকে বলছি।"

ওমর (রা:) মনে মনে খুব খুশি হলেন। দু'হাত তুলে আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, "আল্লাহ আমি কী ভাগ্যবান! আমি যদি ভুল পথে চলি, তা হলে সঠিক পথে চালাবার লোকের অভাব হবে না।"

www.nagorikpathagar.org

আর একটি ঘটনা। এক বেদুঈন এসে ওমর (রাঃ)-কে বলল, "হে ওমর, বেহেশতের আনন্দই বড় আনন্দ। আল্লাহর দোহাই আমার মেয়েদের এবং তাদের মাকে কাপড় দান করুন।"

ওমর (রাঃ) বললেন, "যদি না দিই, তাহলে কি হবে ?"

বেদুঈন বলল, "তা'হলে কেয়ামতের দিনে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আপনি কোনো জবাবই দিতে পারবেন না। তারপর আপনি দোজখে যাবেন।"

এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) ভয়ে কাঁপতে থাকেন। দর-দর করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। কিন্তু তখন তাঁর কাছে কোনো কাপড়-চোপড়ই ছিল না। অগত্যা নিজের পোশাক খুলে তিনি বেদুঈনকে দান করলেন।

দেখলে তো! এত বড় একজন শাসনকর্তা, যাঁর ভয়ে সমস্ত দুনিয়া কম্পমান, তিনি কি না রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে জবাবদিহি করছেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না!

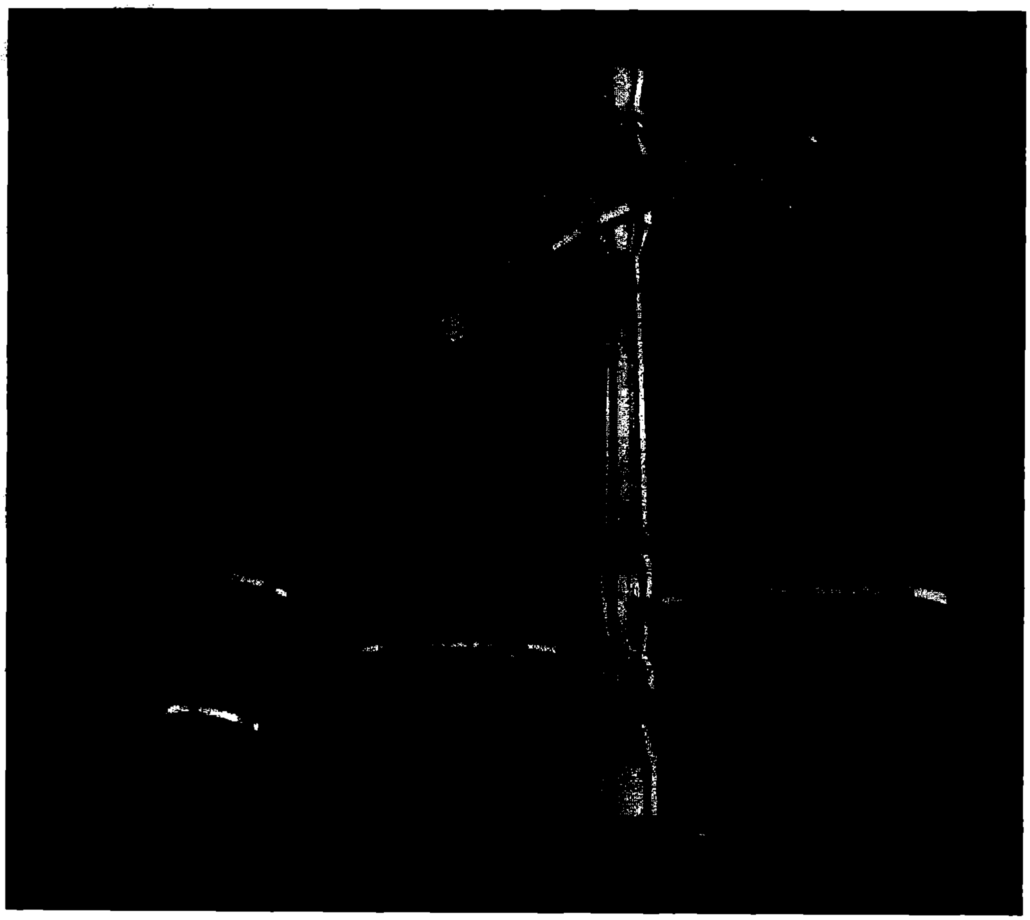

www.nagorikpathagar.org

সবচেয়ে বড় গোলাম

ওমর (রা.) নিজেকে জনগণের সবচেয়ে বড় গোলাম, সবচেয়ে বড় চাকর, সবচেয়ে বড় দাস মনে করতেন। নিজেকে কখনই তিনি আমীর, বাদশাহ্ বা শাসনকর্তা মনে করতেন না। নিজের কাজ, নিজের পরিবারের কাজ, দেশের কাজ, দশের কাজ, সব তিনি নিজে এবং নিজ হাতে করতেন।

একবার এক লোক আরবের কয়েকজন গণ্যমান্য মাতব্বর ধরনের লোক নিয়ে ওমরের (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মসজিদে না পেয়ে তাঁরা তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন ওমর কোমরে কাপড় গুঁজে ছোটাছুটি করছেন। তাঁদেরকে দেখতে পেয়েই ওমর (রা.) লোকটির নাম ধরে হাঁক দিলেন, "দৌড়ে এসো, রাষ্ট্রের একটা উট ছুটে পালিয়েছে। ওটাকে ধরতে হবে। জানো তো, কত এতিমের অংশ রয়েছে উটটিতে।"

একজন মাতব্বর বললেন, "এর জন্য আমীরুল মোমেনীন দৌড়াদৌড়ি করছেন কেন? একজন গোলাম পাঠালেই তো চলত।"

মুচকি হেসে ওমর (রা.) বললেন, "আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে ?

আরেকদিনের ঘটনা। ওমর (রা.) চাকর আসলামকে সাথে নিয়ে গভীর রাতে বের হয়েছেন। এ পাড়া, সে পাড়া ঘুরে ঘুরে দেখছেন। দেখছেন কে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, আর কার ঘরে শান্তি নেই। হঠাৎ দেখেন সামনে আলো জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে দেখেন, এক মহিলা ডেকচিতে কি যেন জ্বাল দিচ্ছেন, আর তার চার পাশে কয়েকটি শিশু কাঁদাকাটি করছে। ওমর (রা.) আরো নিকটে গেলেন। বললেন, "কি মা, এরা কাঁদছে কেন? আর তুমিই বা কি জ্বাল দিচ্ছ?"

মহিলা মনের দুঃখে বললেন, "ঘরে এক কণা খাবার নেই। এরা কিছু খায়নি। ক্ষুধার জ্বালায় ওরা কাঁদাকাটি করছে। ওদের ভুলাবার জন্য ডেকচিতে পানি জ্বাল দিচ্ছি। কাঁদতে কাঁদতে কাহিল হয়ে এরা এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে।"

ওমরের (রা.) মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি পাগলের মতো শহরের দিকে ছুটলেন। সরকারি গুদাম খুলে আটা, ঘি, খেজুর বের করলেন। বস্তাতে সব ভরলেন। বিরাট বোঝা হয়ে গেল। আসলামকে ডেকে বললেন, "আসলাম, বোঝাটা আমার পিঠে তুলে দাও।"

আসলাম বলল, "বোঝাটা আমাকে নিতে দেন হুজুর।"

ওমর বললেন, "ভালো কথা, কিন্তু কেয়ামতের দিন আমার বোঝা তো তুমি বইবে না। তখন আমার কি হবে?"

আসলাম তবুও অনুরোধ করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, "এ বোঝা আমার, এটা আমাকেই বইতে দাও।"

www.nagorikpathagar.org

ওমর বিরাট বোঝাটি নিজের পিঠে তুলে নিলেন। তিন মাইল পথ হেঁটে মহিলার তাঁবুর কাছে এলেন। আটা দিয়ে মহিলা রুটি বানালেন। ওমর (রা.) বসে বসে রুটি সেঁকলেন। তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের খেতে দিলেন। ওরা পেট ভরে খেলো। ওমর (রা.) তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। আহা! সে কী আনন্দ! সে কী তৃপ্তি।

অন্য দিনের ঘটনা। ওমর (রা.) মদীনায় ফিরছেন। দেখেন তাঁবুর সামনে এক বুড়ি মুখ কালো করে বসে আছেন। ওমর (রা.) ভাবলেন, আহা বেচারীর জানি কী কষ্ট। মনে খুব দয়া হলো। এগিয়ে গেলেন বুড়িমার দিকে। বললেন, "ওমরকে তোমার অবস্থা জানাও না, কেন ?"

বুড়ি মা ভয়ানক রেগে গেলেন এবং বললেন, "তাঁর ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। সে আমার জন্য এক পয়সাও সাহায্য পাঠায়নি।"

ওমর (রা.) বললেন, "কিন্তু এতদূর থেকে আপনার খবর ওমরের কাছে পৌছবে কি করে ?"

বুড়ি মা আরো রেগে গিয়ে বললেন, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। প্রত্যেকের খোঁজ-খবর যদি না রাখতে পারে, তবে সে খলীফা হয়েছে কেন ?

ওমর (রা.) ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "মা, আপনি ঠিকই বলেছেন, সত্যি ওমর (রা.) মহা অপরাধী।"

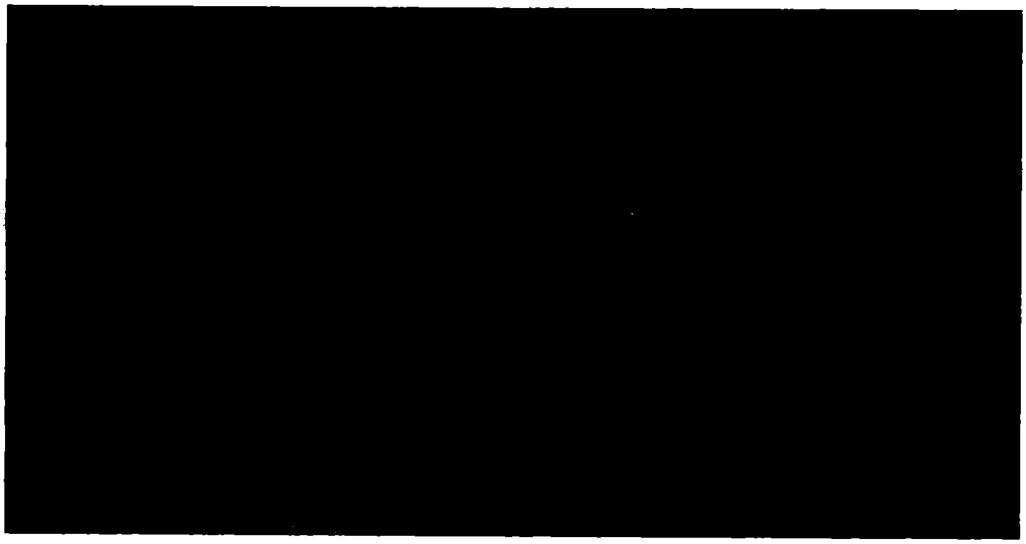

www.nagorikpathagar.org

অচেনা যাযাবরের জন্য

সাহায্য, সহানুভূতি এসব শব্দ তোমরা অনেক শুনেছ। বইতে পড়েছ দুর্বলকে সাহায্য করবে, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। জীবনে দুর্বলকে, গরিবকে কোনোদিন কোনো সাহায্য করেনি, অসহায়ের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি, এমন কি কেউ আছে? তোমরা তো অনেকেই স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ফকিরকে পয়সা দাও। গরীব ছেলে-মেয়েদের পুরাতন জামা-কাপড় দাও, অনেক সময় আবার ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করার বা সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ থাকে না। যেমন ধরো, ঘরের বারান্দায় গভীর রাতে কোনো মুসাফির ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকতে চায়। তোমার মন বলছে জায়গা দিতে। ওদের কষ্টে তোমার দুঃখ হচ্ছে। ভাবছ, আহা! বেচারীরা কত অসহায়! কিন্তু তোমার মা-বাবা কেউ জায়গা দিতে রাজি নন। তাঁরা বলছেন : এরা চোর। সুযোগ পেলেই চুরি করবে। সুতরাং আর কি করা। ওদের বিদায় করে দিতে হলো। তুমি মনে খুব ব্যথা পেলে। তবু তো তুমি ব্যথা পেয়েছ। সহানুভূতি দেখানোর জন্য এগিয়ে গেছ। অনেক লোককে দেখবে, যাদের মনে কোনো দয়া নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। ওরা শুধু নিজকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজের সুখ, নিজের শান্তি ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতেই পারে না। অথচ তোমাদের মতো ওরাও একদিন বইতে পড়েছিল :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

পরের জন্য কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, ওমরের (রা.) জীবনে তার দৃষ্টান্ত ভুরি-ভুরি। সেসব শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, এমন মানুষও আবার হয়! যে যুগে আমরা বাস করছি, তাকে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতার যুগ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা সভ্যতার সবচেয়ে উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছি। দয়া, মায়া, মমতা, সৌজন্য, সাহায্য, সহানুভূতি এসবের মাধ্যমে সভ্যতার পরিচয় মেলে। অথচ এ যুগে এসব গুণের কত অভাব ! তবু আমরা সভ্য, তবু আমরা উন্নত। কী বিচিত্র তাই না! যাক এবার গল্প শোনো।

ওমর (রা.) তখন খলীফা। কত বড় শাসনকর্তা জান? এক-আধটি রাজ্যের বা দেশের নয়। কবি বলেছেন, "অর্ধ পৃথিবী করেছে শাসন ধুলার তখতে বসি......।" সত্যিই তখন তিনি প্রায় অর্ধ পৃথিবীরই শাসনকর্তা। তিনটি মহাদেশের বহু দেশ তাঁর অধীনে। এই বিশাল এলাকার তিনি অধিপতি। তোমরা ভাবছ, কত আরাম-আয়েশ তাঁর। কিন্তু না, তাঁর চোখে ঘুম নেই।

গভীর রাত। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা নিয়ে নয়–একা। এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক মাঠের কোণায় একটা তাঁবু দেখতে পেলেন। খলীফা চিন্তা করলেন, এর আগে তো ওখানে কোনো তাঁবু ছিল না। ব্যাপার কি? কারা তাঁবু গেড়েছে? তিনি এগিয়ে গেলেন। তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখেন এক বেদুঈন মন খারাপ করে বসে আছে। বেদুঈন মানে যাযাবর।

www.nagorikpathagar.org

যাদের নির্দিষ্ট কোনো ঘর-বাড়ি নেই। আমাদের দেশের বাস্তুহারাদের মতো। ওরা আজ এখানে, কাল ওখানে, এভাবে ঘুরে। খলীফা আরো এগিয়ে গেলেন। তাঁবুর ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ পেলেন। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

লোকটি জবাব দিলো, "আমি বেদুঈন, এই গ্রামে থাকি। খলীফার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি।"

ওমর : তাঁবুর ভেতর কাঁদছে কে?

লোকটি রেগে গেল। বলল, "যাও মিয়া, নিজের কাজ করগে।"

ওমর : না, বল না। কার যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

দরদমাখা কথায় লোকটির রাগ কমে গেল। সে বলল, আমার স্ত্রীর প্রসব-ব্যথা শুরু হয়েছে।

ওমর জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁর কাছে অন্য কোনো মেয়ে লোক আছে?

বেদুঈন : না, আর কেউ নেই।

ওমর বললেন, "আচ্ছা আমি আসছি।"

এই বলে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে ডেকে বললেন, "তোমার জন্য একটা বড় রকমের পুণ্যের কাজ ঠিক করে এসেছি। চলো যাই।"

উম্মে কুলসুম : বলুন না, কি কাজ ?

ওমর : গ্রামের এক গরিব মেয়ে লোক মাঠে প্রসব-ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তার কাছে অন্য কোনো মেয়ে-লোক নেই। বেচারী খুব বিপদে পড়েছে।"

উম্মে কুলসুম শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন। বললেন, "আপনার আদেশ পেলে এখনই যাওয়ার জন্য তৈরি হই।

ওমর : হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হও। প্রসবের সময় যা যা দরকার সাথে নাও। এছাড়া আটা, ঘি এবং একটা হাঁড়িও সাথে নেবে।

তাঁরা সব জিনিসপত্র নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তাঁবুর কাছে আসলেন। বেদুঈনের অনুমতি নিয়ে উম্মে কুলসুম তাঁবুর ভেতর চলে গেলেন। ওমর (রা.) তাঁবুর বাইরে আগুন ধরিয়ে ঘি-আটা দিয়ে রান্না করতে লাগলেন। এর মধ্যে মেয়েলোকটি সন্তান প্রসব করল। উম্মে কুলসুম খলীফাকে ডেকে বললেন, "আমীরুল মোমেনীন! আপনার বন্ধু ছেলের বাবা হয়েছেন, তাঁকে সুসংবাদ দিন।"

'আমীরুল মোমেনীন' কথাটা শুনে বেদুঈনের চোখ ছানাবড়া। সে সম্মানের সাথে সালাম জানিয়ে এক পাশে দাঁড়াল। ওমর (রা.) বললেন, "ভয় পাওয়ার কি আছে ভাই! এই নাও খাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। হাঁড়িটা তাঁবুর ভেতর নিয়ে যাও, তোমার স্ত্রীও কিছু খেয়ে নেবেন।"

উম্মে কুলসুম মহিলাকে খাইয়ে হাঁড়িটা বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। ওমর (রা.) লোকটিকে খাইয়ে বললেন, "কিছু মনে করো না ভাই! আমরা ফিরে যাচ্ছি। সমস্ত রাত তুমি জেগে রয়েছ। এখন গিয়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে আমার কাছে আসবে, নবজাত শিশুর একটা ভাতার ব্যবস্থা করে দেবো।"

রাজা-বাদশাহ দূরের কথা, এ যুগে এমন একজন লোকও কি পাওয়া যাবে, যে নিজের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গভীর রাতে অন্য কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে? নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত মানুষের জন্যও মানুষ এমন করে না। অথচ ওমর (রা.) ছিলেন রাজাদের রাজা, বাদশাহদের বাদশাহ। আর লোকটি ছিল অজানা, অচেনা একজন যাযাবর। কিন্তু তাতে কি! ওমর (রা.) এই সব মানুষকেই সেবা করেছেন সারা জীবন।

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের ভয়

তোমরা যারা বেশি দুষ্টুমি করো, তাদের সম্পর্কে মা-বাবারা বলেন, "ছেলেটা একেবারে শয়তান হয়ে গেছে। কোনো কথাই শুনতে চায় না। খালি দুষ্টুমি করে।"

এই 'শয়তান' বলতে তোমরা কি বুঝ? শয়তান কি কোনো মানুষের নাম, না কোনো জানোয়ারের নাম? আসলে শয়তান এসবের কোনোটাই নয়। শয়তান একটি জীবের নাম। এই জীবকে আবার দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। দুনিয়ার কোনো চিড়িয়াখানায়ও এ জীব নেই। কেউ তাকে ধরতে পারেনি। পারবেও না। অথচ এই জীবের নাম সবাই জানে। এই জীবটিই আবার মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন। এতবড় দুশমনকে যদি মানুষ হাতের কাছে পেত তাহলে যে কি করত? তা তো বুঝতেই পারছ।

আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান, এ জীবটির জন্যই দুনিয়ায় যত মন্দ কাজ, বাজে কাজ, খারাপ কাজ—সব কিছু হচ্ছে। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কে করছে? এক কথায় সবাই বলবে মানুষ। মানুষই দুনিয়ার ভালো-মন্দ সব কিছুর জন্য দায়ী। দুনিয়ার মানুষ যত মন্দ কাজ করে তা এই শয়তানের কুপরামর্শেই করে। শয়তান মানুষকে আবার কি করে পরামর্শ দেয়? এ এক বিরাট রহস্য, তাই না? কেননা শয়তানকে তো দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না, তাহলে সে পরার্মশ দেয় কেমন করে?

এখন খেলব, না পড়ব? মানুষের গাছের আম পাড়ব, কি পাড়ব না? টাকাগুলো চুরি করব, কি করব না? মিথ্যা কথা বলব, কি বলব না- এসব নিয়ে আমরা সবাই চিন্তা করি। কোনো কাজ করার আগে একটা সিদ্ধান্ত আমরা সবাই নেই। এই সিদ্ধান্তটা কোত্থেকে আসে? যেখান থেকে আসে তাকে 'বিবেক' বলে। এই বিবেক আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের মনের মধ্যেই বিবেকটা থাকে। যে ভালো-মন্দ কোনো কিছুর ভেদ-বিচার করে না। লোকে তাকে কি বলে? বলে, লোকটা একেবারে বিবেকহীন। মানুষ বিবেকহীন, বিচার-বুদ্ধিহীন হয় কেন? তা এই শয়তানের জন্য। যার বিবেকে শয়তান বাসা বাঁধে তার আর বিবেক বলে কিছু থাকে না। সে তখন খারাপ চিন্তা করে, খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সবশেষে খারাপ খারাপ কাজ করে। সে মানুষ হলেও নিজেই শয়তান হয়ে যায়। মানুষের খারাপ ছাড়া, ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছুই সে ভাবতে পারে না। অন্য মানুষ কেন, নিজেরও ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছু করতে পারে না।

শয়তান মানুষের শরীরের রগে রগে বিচরণ করতে পারে। এ ক্ষমতা তার আছে। এই ক্ষমতা আছে বলেই সে মানুষের বিবেকে বাসা বাঁধে। সব বিবেকের মধ্যে ঢোকার সে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। যারা শয়তানের কুপরামর্শ বোঝে, এর পরিণাম ফল যে খুব খারাপ তা বুঝে, তারা খুব সতর্কই থাকে। তারা শয়তানকে ধারে-কাছে আসতে দেয় না। দেখবে কিছু লোক আছে যারা শুধু ভালো ভালো কাজ করে, ভালো ভালো কথা বলে, ধর্ম-কর্ম করে। অহঙ্কার করে না, বড়াই করে না, বাহাদুরী করে না, লোভ করে না, হিংসা করে না, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বিচার করে চলে। বুঝবে এদের বিবেকে শয়তান বাসা বাঁধতে পারেনি। আবার কিছু কিছু লোক দেখবে তারা ভালো কাজও করে, আবার মন্দ কাজও করে! ভালো করার চেষ্টা করে, কোনো কোনো সময় ভুলে খারাপ কাজও করে ফেলে। খারাপ কাজ করার পর তাদের হুঁশ হয়, বুঝতে পারে এ কাজটা করা ঠিক হলো না। এ জন্যে তারা দুঃখিত হয়, অনুতপ্ত হয়। ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না বলে ওয়াদা করে, শপথ করে। বুঝবে, এদের বিবেকে

www.nagorikpathagar.org

শয়তান বাসা বাঁধার চেষ্টা করছে। এখনো পেরে ওঠেনি। তোমাদের তো এ রকম প্রায়ই হয়। মনে খুব রাগ আসে। খুব দুঃখ লাগে। খালি চিন্তা করো, 'কেন এটা করলাম' 'কেন ওটা করতে গেলাম।' ক্ষোভে-দুঃখে, লজ্জায়-শরমে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। এটা কেন হয়? হয় এজন্য যে, বিবেকটা তখনো তোমাদের অধীনে থাকে। লেখাপড়া, আদেশ-নিষেধ, জ্ঞান-গরিমা দিয়ে বিবেককে যেভাবে তৈরি করে রেখেছ তাতে এখনো শয়তান ঢুকে পড়তে পারেনি। সে শুধু সুযোগ খুঁজতে থাকে। যখনই কেউ মনের দিক থেকে দুর্বল হয়। তখনই সে জেঁকে বসে।

এখন রহস্যটা জানা গেল যে, মানুষ কি করে শয়তানের পরমর্শ নেয়। আসল কথা হলো, মানুষের বিবেকটা শয়তানের দখলে চলে গেলে সেখান থেকে কু-চিন্তা, কু-পরামর্শই আসে। এভাবেই মানুষ শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ করে।

শয়তানের জন্ম-কাহিনীটা যদি তোমরা না জান, তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে না। এখানে খুব সংক্ষেপে বলছি। শোনো :

আল্লাহ মানুষের আদি পুরুষ আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে জিন ফেরেশতাসহ সকল জীবকে বললেন, "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, একে তোমরা সেজদা করো।" একে একে সবাই সেজদা করল। কিন্তু 'ইবলিশ' নামের এক জিন সেজদা করল না। সে বললো, "আমি জিন, আগুনের তৈরি আর মানুষ সামান্য মাটি থেকে তৈরি। সে হিসেবে মানুষ আমাদের থেকে নীচু-ছোট। এই ধরনের নীচু জাতের জীবকে আমি সেজদা করতে পারি না।" সে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেল এবং আল্লাহর কাছে মানুষকে খারাপ পথে নেয়ার জন্য কিছু ক্ষমতা চাইলো। আল্লাহ তাকে সে ক্ষমতা দিলেন। এই ক্ষমতার কারণেই শয়তান মানুষের চিন্তায়, চেতনায়, স্বপ্নে, কল্পনায় বিচরণ করতে পারে। সেই থেকে শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন। ইহকাল ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে মানুষকে শয়তান বানাবার কাজে ব্যস্ত থাকবে।

এ জন্যই যারা দুষ্টামি করে, তাদেরকে সবাই শয়তান বলে। শয়তান মানুষের মনে লোভ, লালসা, হিংসাসহ সমস্ত খারাপ ইচ্ছার সৃষ্টি করে। এর ফলেই মানুষ খারাপ পথে পা বাড়ায়। অথচ এই শয়তানই আবার কিছু কিছু লোককে খুব ভয় করে। শুনবে সে কাহিনী?

একদিন নবীজীর কাছে কয়েকজন মেয়েলোক উপদেশ শুনছিলেন। এমন সময় ওমর (রা.) নবীজীর সাথে দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। ওমরের (রা.) গলার আওয়াজ শুনেই মেয়েলোকেরা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর চলে গেল।

ওমর (রা.) ঘরে ঢুকে দেখলেন, নবীজী মুচকি-মুচকি হাসছেন। ওমর এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজী বললেন, "আপনার গলার আওয়াজ পেয়ে মেয়েলোকেরা এখান থেকে চলে গেল। আপনাকে তারা খুব ভয় করে। এই দেখেই আমি হাসছিলাম।"

ওমর এই কথা শুনে আক্ষেপ করে বললেন, "হে মহিলাগণ, আফসোস, তোমরা আমাকে এত ভয় করো, অথচ আমি যাকে ভয় করি, সেই নবীজীকে তোমরা এতটুকু ভয় কর না। এ তোমাদের কেমন ধরনের ভয়।"

ভেতর থেকে একজন মহিলা বললেন, "নবীজীর চেয়ে আপনাকেই আমরা বেশি ভয় করি। আপনার মতো কঠোর, কোমল ও ভয়ঙ্কর মানুষ কোথাও দেখিনি।"

মহিলাদের এ জবাব শুনে নবীজী হেসে বললেন, "ফারুক, এরা ঠিকই বলেছে, আপনি যে রাস্তা দিয়ে চলা-ফেরা করেন, শয়তানও সেই রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় পায়।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে ওমর (রা.)-এর মতো তোমরা যদি নিজের জীবন গড়ে তোলো, তাহলে শয়তানও তোমাদের ধারে-কাছে আসতে পারবে না। তোমরা কি পারবে তেমনভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে?

www.nagorikpathagar.org

ওয়াদা পালন

ওমরের (রা.) বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা। অর্ধেক দুনিয়া তখন ইসলামী শাসন মেনে নিয়েছে। তিনি সারা জাহানের সমস্ত মুসলমানদের নেতা। তাঁর নামে আদালতে মামলা! তোমরা হয়তো ভাবছ, যে মামলা দায়ের করেছে এবং যে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাদের ঘাড়ের ওপর আর মাথা থাকবে না। ন্যায়বিচারক হিসেবে সারা দুনিয়ায় যাঁর সুনাম ছড়িয়ে আছে, তাঁর বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের নালিশ! ভাবতেও কেমন বেমানান মনে হয়। যিনি মামলা দায়ের করেছেন তিনি অমুসলমান তো ননই, বরং একজন ভক্ত মুসলিম। কত বড় সাহস এই মুসলিমের। যে কি না তাঁর খলীফার বিরুদ্ধেই নালিশ করেছে।

আদালতে মামলা গৃহীত হলো। মামলার তারিখ ঠিক হলো। ওমর (রা.) নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজির হলেন। আদালতে হাজির হওয়ার সাথে-সাথেই কাজী ওমর (রা.)-কে খলীফা হিসেবেই সম্মান দেখালেন। উঠে দাঁড়ালেন। ওমর (রা.) এতে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। একজন আসামির প্রতি কাজীর এই সম্মান প্রদর্শনকে তিনি ভালো চোখে দেখলেন না।

তিনি বললেন, "আমি খলীফা হিসেবে এখানে আসিনি, এসেছি আসামি হিসেবে। একজন আসামির প্রতি আপনি যে সম্মান দেখালেন তা কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। আপনি তো এ আচরণের দ্বারা বাদীপক্ষের প্রতি অবিচারই প্রদর্শন করলেন। এটা আপনার প্রথম ভুল বলে আপনাকে প্রথম বারের মতো ক্ষমা করলাম।"

এই কথা বলে তিনি কাজীর এজলাসে না বসে বাদীর কাছে গিয়ে বসলেন।

মামলা আরম্ভ হলো। বাদী দাঁড়িয়ে বললেন, ওমর (রা.)-কে তাঁরই মতো আদালতের শপথ গ্রহণ করতে হবে।

কাজী দাঁড়ালেন। বাদীর উদ্দেশে বলল, "আদালতে সবাইকে শপথ গ্রহণ করতে হয়, একথা ঠিক। কেননা আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু এখানে যাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তিনি আমাদের সম্মানিত খলীফা-আমীরুল মোমেনীন! আমীরুল মোমেনীন সত্যবাদী হবেন, এটা তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে কি কোনো সন্দেহ থাকা উচিত? আমি অনুরোধ করছি, খলীফার শপথ গ্রহণের ব্যাপারে আপনি চাপাচাপি করবেন না। খলীফা নিশ্চয়ই সত্য গোপন করে আদালতের অবমাননা করবেন না।"

তোমরা হয়তো ভাবছ, ওমর (রা.) কাজীর ভাষণে খুবই খুশি হয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছেন। হয়তো এটাও তোমরা ভাবছ, হ্যাঁ ঠিকই তো, খলীফাকে আবার সাধারণ মানুষের মতো শপথ নিতে হবে কেন? বাদীর প্রতি তোমরা হয়তো একটু ক্ষেপেই উঠেছ। হয়তো ভাবছো, লোকটা একেবারেই বেয়াদব-নচ্ছার, নিজের স্বার্থের জন্য ভদ্রতা, নম্রতা ও সৌজন্য সবকিছু সে খেয়ে বসেছে।

www.nagorikpathagar.org

না, তোমাদের ধারণা ভুল। খলীফা ওমর (রা.) কাজীর ভাষণ শুনে এবার ভীষণভাবে রেগে গেলেন। দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি আবারও ভুল করলেন। শপথ নেয়ার ব্যাপারে বাদী যা বলছে, তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। আদালতে সবাই সমান। সবাইকে একইভাবে শপথ গ্রহণ করতে হবে। আমিও শপথ গ্রহণ করব। আপনি এই মামলা যেভাবে পারেন শেষ করুন। এরপর একজন কাজী হিসেবে আপনি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, মানুষে মানুষে যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন, আইনের চোখে সবাই সমান–এর যে অবমাননা করছেন, তার বিচার আমি করব। আপনি কাজীর উপযুক্ত নন।"

খুব উল্টা-পাল্টা লাগছে ব্যাপারটা, তাই না? তোমরা যা ভেবেছিলে, ঘটনা ঘটল তার ঠিক উল্টো। আমাদের যুগে যেখানে সম্মান না দেখালেই চাকরি যেত, সেখানে কি না সম্মান দেখাতেই চাকরি চলে গেল। শুধু চাকরি গেল তাই নয়, আদালতে তার উপযুক্ত বিচারও হলো।

কাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো। তিনি ইসলামের বিধান–"আইনের চোখে সবাই সমান" লঙ্ঘন করেছিলেন। কথা এবং কাজে মিল ছিল না বলেই খলীফা কাজীর উপযুক্ত সাজা দিয়েছিলেন। তিনি আগেই ওয়াদা করেছিলেন। তিনি যা ঘোষণা করবেন, তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবেন। আদালতে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ হচ্ছিল বলে তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। রেগে গিয়েছিলেন।

এবার হযরত ওমরের (রা.) আর একটি ওয়াদা পালনের কাহিনী তোমাদের শুনাচ্ছি।

'হরমুজান' নামে পারস্যে এক গভর্নর ছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামের বড় দুশমন। পারসীদের সাথে মুসলিমদের কতো যুদ্ধ হয়েছে- এই সব যুদ্ধের জন্য তিনিই ছিলেন দায়ী। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি বন্দি হন। বন্দী হওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন, এবার আর রক্ষা নেই। ইসলামের তিনি জাতশত্রু। সুতরাং হাতে-নাতে পেয়ে মুসলিমরা তাঁকে এবার কোনোভাবেই ছেড়ে দেবে না। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল, যদি না মেরে ফেলে তাহলে অন্তত ক্রীতদাস হিসেবে তাঁকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেবে। ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু না! ওমরের (রা.) দরবার থেকে হুকুম এলো, হরমুজান যদি কিছু খাজনা প্রদান করে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। হরমুজান একথা শুনে তো অবাক। বলে কি? এ আবার কেমন ধরনের শাস্তি। মাত্র কয়েক টাকা খাজনার বিনিময়ে আমার মতো এতবড় শত্রুকে তারা ছেড়ে দিলো? হরমুজান খাজনা দেয়ার ওয়াদা করে মুক্ত হলেন। তারপর নিজ রাজধানীতে গিয়ে পৌছলেন। কিন্তু তার মাথায় আবারও বদ-বুদ্ধি এলো। তিনি ভাবলেন, মুসলিমরা নিশ্চয়ই দুর্বল। তা না হলে তারা আমাকে ছেড়ে দিলো কেন? আর একবার হামলা করলে হয়তো মুসলিমদের চিরতরে ধ্বংস করা যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। হরমুজান বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। যুদ্ধ হলো। তুমুল যুদ্ধ। মুসিলমদের কাছে হরমুজান আবারও পরাজিত হলেন। বন্দি হলেন। এবার ভাবলেন, আর তো কোনোভাবেই রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। গতবার না হয় রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু এবারতো আর রক্ষা পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

খলীফা ওমর (রা.) দরবারে বসে আছেন। বন্দি হরমুজানকে নিয়ে আসা হলো।

ওমর : আপনি কি 'নাহাওয়ান' প্রদেশের গভর্নর?

www.nagorikpathagar.org

হরমুজান : জি, জাঁহাপনা।

ওমর : আপনি কি সেই ব্যক্তি, যে বারবার মুসিলমদের সাথে সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করেছেন?

হরমুজান : (কম্পিত কণ্ঠে) জি, জাঁহাপনা। আমি তা করেছি।

ওমর : আপনি জানেন না এই অপরাধের শাস্তি কঠিন মৃত্যু?

হরমুজান : জি জাঁহাপনা, আমি তা জানি।

ওমর : ঠিক আছে। আপনি কি এখন সে শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত?

হরমুজান : জি, জাঁহাপনা, আমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কিন্তু মৃত্যুর আগে আপনার কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন।

ওমর : বলুন, কি আবেদন আপনার?

হরমুজান : আমি তৃষ্ণার্ত। আমাকে কি এক গ্লাস পানি পান করতে দেবেন?

ওমর : কেন নয়, অবশ্যই দিবো। ওমরের নির্দেশে এক গ্লাস পানি আনা হলো এবং তা হরমুজানকে দেয়া হলো।

হরমুজান : আমীরুল মোমেনীন, আমি ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। পানি পান করার সময় কেউ যদি আমার মাথা গর্দান থেকে কেটে ফেলে।

ওমর : কখনো না। এই পানি পান করার আগে কেউ আপনার চুলে হাত দেবে না।

হরমুজান : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আমীরুল মোমেনীন, আপনি ওয়াদা করেছেন যে, এই পানি পান করার আগ পর্যন্ত কেউ আমার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করবে না। আমি এই পানি পান করব না। (সে পানির গ্লাস দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো) এখন তো আপনি আর আমাকে হত্যা করতে পারবেন না।

ওমর : (মৃদু হেসে) গভর্নর, এটা নিশ্চয়ই তোমার চালাকি। কিন্তু যাই হোক, ওমর যেহেতু ওয়াদা করেছে, সে তা রক্ষা করবেই। কেউ তোমাকে হত্যা করবে না। যাও, তুমি মুক্ত।

এর বেশ কিছুদিন পর হরমুজান আবার মদীনায় এলেন। না, এবার যুদ্ধের জন্য নয়। বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি ওমর ফারুকের সামনে হাজির হলেন এবং বিনীতভাবে বললেন,"আমরা মুসলিম হতে এসেছি। আপনি আমাদের ইসলামে দীক্ষিত করুন।"

দেখলে তো, খলীফা ওমর (রা.) অক্ষরে অক্ষরে কিভাবে নিজের ওয়াদা পালন করেছিলেন। আজও যদি মুসলিম শাসকরা ইসলামের বিধান মতে নিজেদের ওয়াদা পালন করতেন, তাহলে ইসলামের সৌন্দর্যে দুনিয়া আবারও বিমোহিত হয়ে উঠত। মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে এসে সমবেত হতো।

www.nagorikpathagar.org

বড়লোকদের দাপট

আমাদের সমাজে বড়লোকদের কত দাপট! বড়লোক বলতে আমরা বুঝি যারা ধনী, যাদের অনেক টাকা-পয়সা আছে, যাদের বাড়ি-গাড়ি আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, যারা চাকরি-বাকরি করে, যাদের জমিজমা আছে, যারা সমাজের হর্তাকর্তা, শাসনকর্তা ইত্যাদি। এ ধরনের লোকদের মান, সম্মান, ইজ্জত আমাদের সমাজে অনেক। গরিব, মূর্খ, সাধারণ মানুষরা এদের ভয় করে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে। এদের ভাগ্যবান মনে করে। এ ধরনের ভাগ্যবান লোকদের সংখ্যা কিন্তু আমাদের সমাজে খুব বেশি নয়। এরা মূলত শহরে-বন্দরে বাস করেন। গ্রামে বড়লোক হলেন-চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডমাস্টার। উপজেলা শহরগুলোতে-দারোগা, পুলিশ, সার্কেল অফিসার, ইউএনও, সকল শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটসহ সকল শ্রেণির অফিসার, কন্ট্রাকটর, ব্যবসায়ী, কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা। এদের 'সুবিধাভোগী' বলা হয় কেন, বল তো? যেহেতু এরা রাষ্ট্রের দেয়া সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অধিকার বলে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, সেগুলো তো তারা ভোগ করেনই, উপরন্তু সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, ঠকিয়ে, তাদের অংশ এরা অন্যায়ভাবে ভোগদখল করেন।

তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এটা আবার কি করে সম্ভব ? সম্ভব এ কারণেই যে, রাষ্ট্র বা সমাজের দেয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো এই 'সুবিধাভোগী' লোকেরাই বিচার-বিবেচনা করে বণ্টন করেন। এরাই সমাজের হর্তাকর্তা বলে আইন-কানুন, নীতি-নিয়মও এরা তৈরি করেন। আইন তৈরি করতে গিয়ে, বিলি-বণ্টন করতে গিয়ে এরা নিজেদের ভাগে বেশির ভাগ অংশ রেখে দেন। অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্য যে অংশ বরাদ্দ করা হয়, সেগুলো নানা ছুতা-নাতায় ওদের ভাগে এসে পড়ে। তোমরা যারা গ্রামে বাস করো, তারা তো নিশ্চয়ই দেখেছ, গ্রামের একশ্রেণির লোকের ভাগ্য দিন দিন ভালো হতে থাকে। ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে সরকারি তরফ থেকে যেসব জিনিস এসে পৌঁছে, সেগুলো ঐ শ্রেণির মানুষরাই পায়। সরকার গরিব চাষিদের জন্য 'কৃষিঋণ' বরাদ্দ করেন, সব গরিব চাষি তা পায় না। ঝড়-বন্যা হলে সরকার যে টিন, কাঠ সরবরাহ করে তাও তারা পায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চাল, গম, আটা, লবণ অর্থাৎ সরকার যা গরিবদের জন্য দিয়ে থাকেন, বেশির ভাগ সময় তাও পায় ঐ শ্রেণির লোকেরাই। নানা ছলচাতুরী করে, বুদ্ধি-কৌশল খাটিয়ে, সরকারি কর্মকর্তাদের হাত করে এরা গরিবের পাওনা অংশ লুটে নেয়। সমাজের সকল কিছুর ওপর এরা একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে।

এদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে কোন অসুবিধা হয় না। হাসপাতাল ও সরকারি ডাক্তারখানা থেকে চিকিৎসা ও ওষুধ পেতে এদের অসুবিধা হয় না। কৃষিঋণ, সার, বীজ এসব পেতেও এদের কোনো অসুবিধা হয় না। রেশন, ন্যায্যমূল্যের জিনিসপত্র, ব্যবসার জন্য ব্যাংক ঋণ, বাড়ি করার জন্য সরকারি ঋণ, এসবও পেতে এদের কোনো অসুবিধা হয় না। অথচ গরিবরা এসবের কোনো কিছুই পায় না।

www.nagorikpathagar.org

সুবিধাভোগী এই শ্রেণির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তোমাদের ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই একথা জাগছে, আহা সমাজ থেকে যদি এসব অন্যায়-অবিচার দূর হতো তাহলে কত না ভালো হতো। কিন্তু এগুলো দূর হবে কেমন করে? সমাজের ওপরতলায় যারা বাস করেন, শাসন ক্ষমতা থাকে তাদের হাতে। তারা যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নেয়, তাহলে এসবের প্রতিকার কোনোদিনই সম্ভব নয়। আইনের চোখে সবাই সমান। এ কথা আমরা অহরহই বলে থাকি। কিন্তু আমাদের সমাজে এ কথাটি যে সত্য, এর প্রমাণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না। গরিব, ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে যে চুরি করে অথবা চুরি করতে বাধ্য হয়, ধরা পড়লে এদের আমরা পিটিয়ে মেরে ফেলি। থানায়-পুলিশে দেই। অথচ শাসন ক্ষমতায় বসে অথবা সরকারি অফিসে বসে যারা কায়দা-কৌশল করে গরিব জনসাধারণের লাখ লাখ টাকা চুরি করছেন, জেনে-শুনেও তাদের আমরা অনেক সময় ধরছি না। আবার ধরা পড়লেও এদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না। এরা সব কিছুর উর্ধ্বে। অথচ খুব সহজেই কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ আছে। খলীফা ওমর (রা.)-এর কথাই ধর না।

একবার তিনি তার কর্মচারীদের হজের সময় তার সাথে দেখা করতে বললেন। যে যেখানে ছিল সবাই এসে হাজির হলো। বুঝতেই পারছ, ওমরের নির্দেশ, কার বুকের পাটা আছে তা অমান্য করে? সবাই এসে হাজির হলো। হজের মৌসুমে অন্যান্য দেশের জনগণও ঐ সময় মক্কায় হাজির ছিল। বিরাট জনসমাগম হলো। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "ভাইসব, সততার সাথে আপনাদের দেখাশোনা ও সেবা করার জন্যই আমি এসব কর্মচারী নিয়োগ করেছি। আপনাদের জান-মাল ও মানসম্মান রক্ষার দায়িত্বও এদের দেয়া হয়েছে। এর অমান্য যদি কেউ করে থাকে, তাহলে এখনই অভিযোগ পেশ করুন।"

এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার অমুক কর্মচারী আমাকে অন্যায়ভাবে মেরেছে।"

ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এর প্রতিশোধ নিতে চান? তাহলে আসুন। প্রতিশোধ নিন।"

তখন মক্কার গভর্নর দাঁড়িয়ে বললেন, "আমীরুল মোমেনীন, সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আপনি আর একটু সদয় হোন।"

ওমর : তাই বলে কি একে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেবো না? এটা হয় না। আইন সবার জন্য সমান। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি।

গভর্নর : আমাদের একটু সময় দিন। আমরা চেষ্টা করে দেখি, লোকটাকে খুশি করাতে পারি কি না।

ওমর (রা.) অনুমতি দিলেন। গভর্নরসহ সকল কর্মচারী গিয়ে লোকটির সাথে আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসা করলেন। লোকটিকে তারা ২০০ দিনার ক্ষতিপূরণ দিলেন। লোকটি সুবিচার পেয়ে উক্ত সরকারি কর্মচারীকে ক্ষমা করে দিলো।

কিছুক্ষণ পর গভর্নরের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, সে অন্য দেশের এক ছেলেকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। ওমর (রা.) সরাসরি প্রতিশোধ গ্রহণ করার হুকুম দিলেন। হুকুম অনুযায়ী সমবেত জনতার সামনে গভর্নরের ছেলেকে সেই বিদেশী ছেলে প্রহার করে প্রতিশোধ নিলো। গভর্নর টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেননি। স্বয়ং গভর্নরকেও অন্য অপরাধে প্রহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বিদেশী লোকটি গভর্নরকে কোনো প্রতিশোধ না নিয়েই ক্ষমা করে দিলেন। গভর্নরের ছেলের প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ওমর (রা.) বলেছিলেন, এই বড় লোকের ছেলেকে প্রহার করো।

আর একদিনের ঘটনা। ওমর (রা.) কিছু টাকা-পয়সা বিলি-বন্টন করছিলেন। খুব ভিড় ছিল। লাইন ধরে একে একে লোকেরা টাকা-পয়সা নিচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে লোকেরা অপেক্ষা করছিল। একজন বিশিষ্ট সাহাবী জনতার লাইন ভেঙে ওমর (রা.)-এর কাছাকাছি চলে গেলেন। ওমর (রা.) এই কাণ্ড দেখে খুব বিরক্ত হলেন। কেননা তার চোখে তো সবাই সমান। লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ একজন দায়িত্বশীল লোক হয়ে তিনি জনতার লাইন ভাঙলেন। ওমর (রা.) সরাসরি তাকে থাপ্পর মেরে দিলেন এবং বললেন, আপনি দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন মানেন না। অথচ আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনার এই প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনো মূল্য নেই, কানাকড়িও মূল্য নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান। এটা দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সমাজে যদি এই ধরনের শাসন চালু হতো তাহলে দেখতে সমাজে বড়-ছোট বলে কিছু থাকত না। সবাই এক আল্লাহর বান্দা বলেই বিবেচিত হতো। তখন বড় লোকেরা বা 'সুবিধাভোগী' শ্রেণি গরিবের হক মেরে খেতে পারত না।

এখন তোমরাই বলো, ওমর (রা.)-এর সমাজ ভালো ছিল ? না আমাদের এই সমাজ ভালো?

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় নবী নড়েচড়ে বসলেন

প্রিয় নবী তাঁর সাথীদের নিয়ে প্রাণ খুলে আলাপ-আলোচনা করছেন। সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসেছেন। হঠাৎ তিনি গুছিয়ে বসলেন। ঠিক তোমরা যেমন বন্ধু-বান্ধবরা বসে আছ, গল্প-গুজব করছ। এমন সময় তোমাদের কোনো শিক্ষক সেদিকে এলে তোমরা কি করো? নড়েচড়ে ভালো হয়ে বসো বা দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাও, তাই না? প্রিয় নবীও তেমন নড়েচড়ে খুব আদবের সাথে বসলেন। সবাই তো অবাক। দেখলেন, একজন শরীফ খান্দানের নামজাদা লোক এদিকে এগিয়ে আসছেন। কি সুন্দর তাঁর হাঁটা! কত বিনয়ী তাঁর পা ফেলা! কি কোমল শান্ত সরল তাঁর চেহারা! মুখে তাঁর কি সুন্দর হাসি! সবাই মুগ্ধভাবে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। প্রিয় নবী বললেন, ফেরেশতারা এই মহান ব্যক্তিকে সম্মান করেন, আমি কেন সম্মান করব না?'

সাথীরা প্রিয় নবীর এই নড়েচড়ে আদবে বসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এভাবে না বসলে তিনি বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না। না থাকলে দরকারি আলাপও করা যাবে না।'

এর অনেক পরের ঘটনা। তখন তিনি শাসনকর্তা। নানা কারণে তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়।

একদিন বিদ্রোহীদের উদ্দেশে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। বার বার বলছেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি, তোমাদের মাথায় তুলে নিয়েছি, তোমাদের গালি-গালাজ করি নাই—মারি নাই। তবু তোমরা আমার বিরোধিতা করছ কেন? এতটুকু বলতেই তাঁরই এক সাথী কি বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে বলছেন, আমি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলছি, মাঝখানে তুমি আবার কথা বলতে দাঁড়ালে কেন?"

বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছে। তাঁকে যে কোনো সময় হত্যা করা হবে। চারিদিকে তাঁর শত্রু আর শত্রু। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা আলোচনায় বসেছেন। একজন বললেন, এখনও সময় আছে, বিদ্রোহীদের কয়েকজন মাতব্বরকে হত্যা করলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন, 'মুসলিমদের মধ্যে তিনি রক্তারক্তি শুরু করতে পারেন না। তার জান যায় যাক, তবুও এ কাজ তিনি কোনোভাবেই করতে পারেন না।' একজন বললেন, সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেই তারাই আপনাকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ভাবলেন, খলীফা তো বিনা পাহারায় সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবেন। ভিড়-জটলা দেখলে সেখানে একা একা উপস্থিত হবেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধা করবেন। কাউকে ঝগড়া বিবাদ করতে দেখলে তিনি মীমাংসা করবেন। মসজিদে গায়ের চাদর মাথার নিচে দিয়ে বিশ্রাম করবেন। মসজিদে দাঁড়িয়ে পিতার মতো, ভাই-এর মতো, বন্ধুর মতো উপদেশ দেবেন। তাদের খবরাখবর নেবেন। অভাব-অভিযোগের কথা শুনবেন। রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেন। বাজারের দর-দামের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আজান দিলে নামাজ পড়াবেন। খোতবা

www.nagorikpathagar.org

দেবেন। সেই খলীফাকে পাহারা দেয়ার জন্য রক্ষীবাহিনী? না, তা হতেই পারে না।

বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করল। তবু তিনি নামাজ পড়তে মসজিদে আসতেন। ইমামতি করতেন। তাদের বোঝাতেন, তোমরা যা করছ তা অন্যায়। এটা মুসলিমদের কাজ নয়। বিদ্রোহীরা শুনত না। তারা দিন দিন অত্যাচার অবিচারের মাত্রা বাড়াতে লাগল। একদিন তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। এক বিদ্রোহী তার হাতের লাঠিটি নিয়ে দুই টুকরা করে ফেলে দিলো। কে বা কারা তাঁর উপর ইট ছুড়ল। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর পর বিদ্রোহীরা তাঁকে ঘরেই বন্দি করে রাখলো। তাঁর বাড়িতে খাদ্য-পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। তিনি ময়লা পানি খেতে বাধ্য হলেন। তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হলো না। নামাজ পড়তে মসজিদে আসতে দেয়া হলো না।

এ অবস্থায় মদীনাবাসীরা বলল, 'আপনি হুকুম দিন। আমরা এই বিদ্রোহীদের চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে ফেলি। আমাদের চোখের সামনে এত সব অন্যায় অবিচার হচ্ছে, আমরা এর কোনোটাই বরদাস্ত করতাম না। আপনি হুকুম দিলে এখনই এর প্রতিকার করি।'

সেই ভদ্র, শান্ত, সৌম্য ব্যক্তিটি অধীর হয়ে উঠে বললেন, "না না, এমন হুকুম আমি দিতে পারি না। আমি মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাতে পারি না। মুসলিমরা এক ভাই আর এক ভাই-এর রক্ত নেবে, এক ভাই আরেক ভাই-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। এ অপরাধ সমস্ত দুনিয়ার সব অপরাধের চেয়েও বড়। এতবড় অপরাধ আমি করতে পারি না। আমি তোমাদেরকে তখনই আমার প্রকৃত বন্ধু মনে করব, যখন দেখব তোমরা তরবারি ফেলে দিয়েছ।"

কে এই সম্মানিত ব্যক্তি? কে এই সহনশীল ব্যক্তি? কে এই ব্যক্তি যিনি মনের উদারতা দিয়ে, সরলতা দিয়ে সব কিছু বিচার করেছেন। তোমরা সকলেই তাকে চেনো এবং জানো। তিনি ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.)।

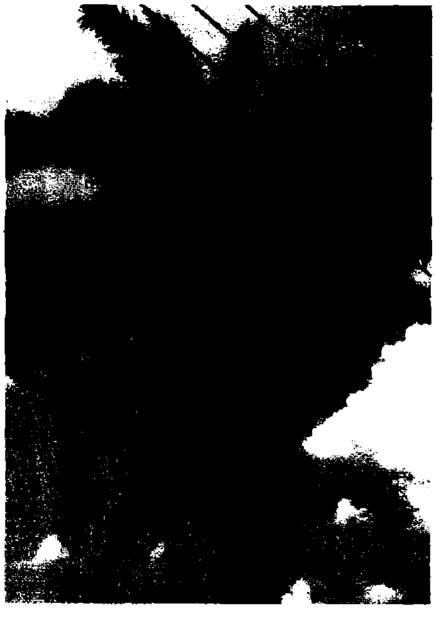

www.nagorikpathagar.org

ভালোবাসার প্রতিদান

কোরাইশ বংশের ফুলের মতো ছেলেটি, যাকে দেখে মক্কার লোকেরা বলত এ তো ইউসুফ (আ.)। সত্যিই ওসমান (রা.) ইউসুফের (আ.) মতোই সুন্দর ছিলেন। লম্বায় ছিলেন মধ্যম ধরনের। গায়ের রঙ ছিল দুধে-আলতা মিশানো। নাক ছিল খাড়া ধনুকের মতো। লাল ঠোঁট সাদা ধবধবে দাঁত। নীল চোখ। লম্বা চুল ও দাড়ি। লাবণ্যময় চেহারা। সব কিছু মিলে তিনি ছিলেন সারা আরবের সেরা যুবক। এই সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারার মতো মনও ছিল সুন্দর। আচার-ব্যবহার, চরিত্রও ছিল সুন্দর। ঠোঁটের কোণে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। সব সময় সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলতেন। হাসি মুখে তাকাতেন, কথা বলতেন। তাঁর সাথে কথা বলে সবাই মোহিত হয়ে যেত। মক্কায় এ ধরনের যুবক আর একজন ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবুবকর (রা.)। সৌন্দর্যে তাঁর মতো না হলেও স্বভাব, চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে তারা সমকক্ষ ছিলেন। এজন্য তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁরা ছিলেন একে অপরের বন্ধু। লোকেরা তাদের প্রশংসা করত। ভালোবাসতো শ্রদ্ধাও করতো। কেননা তারা মদ পান করতো না। জুয়া খেলতো না। আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতো না। আড্ডাবাজী করতো না। এমনকি তারা দেব-দেবীর পূজা অর্চনাও করত না।

ওসমান (রা.) তখন বয়সে তরুণ। পিতা ছোটকালেই মারা গেছেন। দাদার হাতেই লালিত-পালিত। দাদা ভাবলেন ওসমানের ব্যবহারে মানুষ যেভাবে আকৃষ্ট হয়, বিমোহিত হয়, যদি তাকে ব্যবসায়ে লাগানো যায়, তাহলে নিশ্চয়ই ওসমান (রা.) নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তরুণ ওসমানকে তাঁর দাদা ব্যবসায়ে নামালেন। ব্যবসায়ে রাতারাতি তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর স্বভাব চরিত্র এবং ব্যবহারে দিন দিন তাঁর ব্যবসার প্রসার বাড়তে থাকল। শুধু দেশেই নয়, তাঁর খ্যাতি আশ-পাশের প্রতিবেশী দেশেও ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ল। দেখতে দেখতে তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী হলেন। অতিব্যস্ত ব্যবসায়ী। হাতে কোনো সময় নেই। দেশ থেকে বিদেশে মাল নিয়ে যাওয়া, আবার বিদেশ থেকে মাল নিয়ে আসা, এই কাজেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। বলতে গেলে অনেকটা এ যুগের আমদানি-রফতানিকারকের মতো। আরবে যেসব জিনিস পাওয়া যেত না, তা তিনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর–এসব দেশ থেকে আনতেন। আবার সিরিয়া, ইরাক ও মিসর দেশে যেসব জিনিস পাওয়া যেত না, তা তিনি আরব দেশ থেকে নিয়ে যেতেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি ধনী ব্যবসায়ী হলেন। কিন্তু ধনী হলে কি হবে? তাঁর ব্যবহারে কোন অহঙ্কার ছিল না। দম্ভ ছিলো না। অথচ তাঁর পরিবারের অন্যদের মধ্যে দম্ভ-অহঙ্কার পুরোপুরি ছিলো। তাঁরা ভালো বংশের ও ধনী পরিবারের লোক ছিলেন বলে গর্ববোধ করতেন। নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করতেন। ওঠা-বসা, চাল-চলনে তারা দাম্ভিকতার ছাপ রাখতেন। মানুষের সাথে সহজ-সরলভাবে মিশতেন না। ভালো ব্যবহার করতেন না। অন্যান্য লোককে নীচু শ্রেণির বলে মনে করতেন। তাই কারো

www.nagorikpathagar.org

সাথে ভালো ব্যবহার করতেন না। সবার সাথে অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করতেন।

ওসমান (রা.)-এর মধ্যে এ সবের বালাই ছিল না। ছোট-বড় সবার সাথেই তিনি মিষ্টি-মধুর ব্যবহার করতেন। আরবের সেরা ধনী হলেও তিনি কারো সাথে কটু ব্যবহার করেননি। এ কারণে সাধারণ মানুষেরা তাঁকে ভালোবাসতো। শ্রদ্ধা করত।

আমাদের প্রিয় নবী যখন ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করেন তখন ওসমান (রা.) ছিলেন সিরিয়ায়। ব্যবসার কাজে তিনি সিরিয়া গিয়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি ফিরে এলেন। এসেই শুনতে পেলেন, আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ (সা.) দেশবাসীকে নতুন কথা শুনাচ্ছেন। লোকদের বলছেন, "আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নাই। আপনারা দেব-দেবীর পূজা বন্ধ করুন এবং সত্য ধর্মে দীক্ষিত হোন।" কথাটা শুনেই ওসমান (রা.) লাফিয়ে উঠলেন। কেননা ছোটবেলা থেকেই তিনি মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করতেন না। কি করে দেব-দেবীর পূজা বন্ধ করা যায় তাই তিনি চিন্তা করছিলেন। তার মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বন্ধু আবু বকরের কাছে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন আবু বকর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আবু বকর (রা.) তার কাছে সব কিছু খুলে বললেন। ওসমান মুগ্ধ মনে সব শুনলেন। শুনে নতুন ধর্ম সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হলেন। এরপর যারা ইসলাম ধর্ম কবুল করেছে তাদের সাথে তিনি একে একে দেখা করেন। নতুন ধর্ম সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানলেন।

কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দিলো। মুহাম্মদ (সা.) এবং ওসমান (রা.)-এর গোত্রের মধ্যে অনেক আগে থেকেই শত্রুতা ছিল। জাত শত্রুতা । বংশগত শত্রুতা এমন ছিল যে, কেউ কারো ভালো দেখতে পারত না। কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করত না। নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও মানত না। উভয় গোত্রই নিজেদের অন্য গোত্র অপেক্ষা সম্মানীয় বলে মনে করত। প্রিয় নবীর ধর্মে দীক্ষিত হওয়া মানে প্রিয় নবীকে মানা। ওসমান–এর বংশের পক্ষে এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ওসমান (রা.) মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। পড়ার তো কথা। কেননা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে জীবনও চলে যেতে পারে। নিজের বংশের লোক, আত্মীয়-স্বজন শত্রু বনে যেতে পারে। এই চিন্তায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। কেননা সবার সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কোমল ও মধুর। লোকেরা তাঁর ওপর বিরক্ত হবে, অসন্তুষ্ট হবে–এটা ভেবে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। একদিকে ন্যায় ও সত্যের আহ্বান, অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-ভালোবাসা, দীর্ঘকালের সম্পর্ক কোনোটাই তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। নিজের মনের মধ্যে তাঁর দ্বন্দ্ব সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। কোনো সিদ্ধান্তেই তিনি পৌঁছতে পারলেন না।

এমন সময় একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাঁকে ডেকে বলছেন, "ঘুমিয়ে আছো কেন? ওঠো, জাগো, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।' ঘুম থেকে তিনি জেগে উঠলেন। অবাক হলেন, হতবাক হলেন। সারা রাত অস্থিরতায় কাটালেন। এই আহ্বান যে কার আহ্বান তা তিনি বুঝেছিলেন। প্রিয় নবীর আহ্বান যে সত্য তাও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কি করা, বংশের লোকেরা যে তাঁকে অপমান ও লাঞ্ছিত করবে! এ অবস্থায় কি করে তিনি পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করবেন। মনের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে কয়েকদিন কেটে গেল। অবশেষে একদিন তিনি বন্ধু আবু বকরের কাছে গেলেন। স্বপ্নের কথা বললেন। নিজের অস্থিরতার কথা বললেন। আবু বকর (রা.) বন্ধু ওসমানের এই অস্থিরতার কারণ বুঝে ফেললেন।

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে গেলেন মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে। প্রিয় নবী ওসমানকে দেখেই বললেন : "ওসমান, আল্লাহর প্রেরিত সত্য গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের পথ দেখাতে এসেছি।" প্রিয় নবীর কথা শোনা মাত্রই ওসমান (রা.) অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই প্রিয় নবীর সাথে সাথে তিনি কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করলেন।

মুহূর্তেই ওসমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। ওসমান (রা.) ছিলেন উমাইয়া গোত্রের লোক। প্রিয় নবী ছিলেন হাশেমী গোত্রের লোক। মক্কার নেতৃত্ব তখন উমাইয়া গোত্রের হাতে। সেই উমাইয়া গোত্রের ওসমান (রা.) হাশেমী গোত্রের মুহাম্মদ (সা.)-এর শিষ্য হবে–এ কথা ভেবে উমাইয়াদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। ওসমানের এই ইসলাম গ্রহণের অর্থ হলো মক্কার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হাশেমীদের ওপর ছেড়ে দেয়া। আর তাছাড়া ওসমান (রা.) ছিলেন ধনী ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁর ধর্ম ত্যাগ করা মানে তাঁর নিজের বংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেননা তারাই তখন ছিল মক্কার পুরোহিত। সাধারণ লোকদের কাছ থেকে নজরানা হিসেবে তারা অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করত। এই সব কারণে উমাইয়া বংশের লোকেরা ওসমান (রা.)-কে ধরে হাত-পা বেঁধে তাঁর চাচা হাকামের কাছে নিয়ে গেল। হাকাম তাঁকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে বললেন। ওসমান (রা.) চাচার কথা শুনলেন না। চাচা শাসালেন। ধমক দিলেন। নির্যাতনের হুমকি দিলেন। কিন্তু কিছুতেই ওসমান (রা.) চাচার কথা শুনলেন না। মানলেন না। আত্মীয়-স্বজনরা আরও বিগড়ে গেল। তারা হাকামের কাছে ওসমানের বিচার চাইল। হাকাম ওসমানের ওপর নির্যাতনের নির্দেশ দিলেন। বললেন: "যতদিন ওসমান তার পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আসে, ততোদিন তার ওপর নির্যাতন চালাও।" হাকামের নির্দেশ পেয়ে ক্ষুব্ধ আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য জোরজবরদস্তি করতে লাগল। কিন্তু ওসমান (রা.) কারো কথা শুনলেন না। আত্মীয়-স্বজনের প্রহারে তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। মক্কার ধূলিকণা তাঁর রক্তে লাল হয়ে গেল।

এভাবে হাজারও অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে যখন আত্মীয়-স্বজনরা ওসমানকে পৈতৃক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে পারল না, তখন তারা তাঁকে সমাজচ্যুত করে দিলো। বংশের লোকেরা তাঁর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিলো। ওসমান (রা.) প্রিয় নবীর সাথে ইসলাম প্রচারে লেগে গেলেন।

দেখতে দেখতে কোরাইশ বংশ থেকে শুরু করে মক্কাবাসীরা সবাই ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে শত্রুতা শুরু করে দিলো। যে মক্কায় প্রিয় নবী, আবুবকর, ওসমান ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্র, যে মক্কাবাসীরা এদের জন্য গর্ব করতেন, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন, তারাই আজ এদের চরম শত্রু বনে গেল। প্রিয় নবী, আবুবকর, ওসমান, যাকে যেখানে যে অবস্থায় তারা পেতেন, সে অবস্থায়ই তাদের ওপর অকথ্য কথা ও অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতেন।

এমন অবস্থায় একদিন প্রিয় নবীর দুই বিবাহিত কন্যা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে প্রিয় নবীর ঘরে ফিরে এলেন। জানা গেল, তাঁদের স্বামীরা তাঁদের বিদায় করে দিয়েছে। কারণ অন্য কিছু নয়। তারা পৈতৃক ধর্মের বিরোধিতাকারীর মেয়ে ঘরে রাখতে রাজি নয়। তাই কোনো রকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই নিরীহ মেয়ে দুটিকে তারা ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এই ঘটনায় প্রিয় নবী খুব দুঃখ পেলেন। প্রিয় নবীর স্ত্রী খাদিজা (রা.)ও খুবই মর্মাহত হলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এটা ছিল একটা বড় ধরনের আঘাত। প্রিয় নবীর

www.nagorikpathagar.org

বড় মেয়ের নাম ছিল রোকাইয়া এবং ছোট মেয়ের নাম ছিল উম্মে কুলসুম। তাদের কারো বয়স তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল না। সেকালে ছোটতেই বিয়ে হতো বলে প্রিয় নবী তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয় নবীর পরিবারের এই দুর্দশা দেখে ওসমানের মনে সহানুভূতিতে ভরে গেল। তিনি এই দুঃখের দিনে প্রিয় নবীর সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইলেন। এই অবস্থায় তিনি প্রিয় নবীর বড় মেয়ে রোকাইয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। প্রিয় নবীর জন্য এই প্রস্তাব কোনোমতেই খারাপ ছিল না। এই প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত সুখের, আনন্দের ও মর্যাদার। কেননা বংশ মর্যাদায়, অর্থ-সম্পদে ওসমানের সমকক্ষ কোনো মুসলিম তখন ছিল না।

কিন্তু প্রিয় নবী ভাবলেন-এই বিয়ে হলে ওসমানের ওপর অত্যাচার-অবিচার আরও বেড়ে যাবে। কারণ ওসমানের আত্মীয়-স্বজনরা একে সহজভাবে মেনে নিতে পারবে না। তিনি ওসমান (রা.)কে ডেকে অনেক বুঝালেন। এই ঝুঁকি না নেয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু ওসমান (রা.) তাঁর সংকল্পে অটল থাকলেন। নির্যাতনের শিকার হবেন জেনেও তিনি বিয়ে করতে চাইলেন। অবশেষে এ বিয়ে হয়ে গেল। প্রিয় নবীর কথাই ঠিক হলো। বিয়ের পর ওসমান (রা.)-এর ওপর আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচার-অনাচার বহুগুণে বেড়ে গেল। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলা অবশেষে নিরুপায় হয়ে স্ত্রী রোকাইয়াকে সাথে নিয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করলেন। মক্কা থেকে অনেক দূরে আফ্রিকা মহাদেশের আবিসিনিয়ায় গমন করলেন। সেখানে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে সুবিধা করতে পারেননি। তাই বহু দুঃখ-কষ্টে তাঁরা নয়টি বছর সেখানে কাটান। আবিসিনিয়ায় তাঁদের স্বাস্থ্য কখনও ভালো কাটেনি। প্রিয় নবীর কন্যা রোকাইয়া অসুখ-বিসুখে ভেঙে পড়েছিলেন। নয় বছর পর তাঁরা যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখনও মুসলিমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রিয় নবীর কন্যা রোকাইয়ার তখন ভীষণ অসুখ। ওসমান (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। এ অবস্থায় রোকাইয়া ইন্তেকাল করলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিজয়ী প্রিয় নবী (সা.) মেয়ের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়লেন। কেননা মাত্র কিছুদিন আগে নয় বছর পর তাকে তিনি দেখেছিলেন। ওসমান (রা.) খুব দুঃখ পেলেন। এরপর বহুদিন তিনি বিয়ের কথা বলেননি। মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন প্রিয় নবীর সাথে আমার আর আত্মীয়তা রইল না। কথাটা প্রিয় নবীর কানে যাওয়ার পর তিনি ওসমান (রা.)-এর আক্ষেপ দূর করার জন্য ছোট মেয়ে উম্মে কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। এইভাবে প্রিয় নবী তাঁকে আবার নিকট আত্মীয় বানিয়েছিলেন।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, প্রিয় নবী এবং ওসমানের মাঝে কী গভীর সম্পর্ক ছিল। ওসমান (রা.) নিজের মান-মর্যাদা, অর্থ-সম্পদ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে প্রিয় নবীর ভালোবাসা কামনা করেছিলেন। বিপদে-আপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রিয় নবীও নিজের আদরের দু'টি মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে এই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ভাগ্যবান ব্যক্তি

বল তো দুনিয়াতে ভাগ্যবান ব্যক্তি কে? তোমরা হয়তো চট করে বলবে যার টাকা-পয়সা আছে, অর্থ-সম্পদ আছে তিনিই ভাগ্যবান। কেউ হয়তো বলবে যারা রাজা-বাদশাহ বা শাসনকর্তা–তারাই তো ভাগ্যবান। কিন্তু আসলে কি তাই? দুনিয়াতে তিনিই ভাগ্যবান যিনি সুখী। যিনি সুখে-দুঃখে সব অবস্থায়ই সুখী থাকেন। শোকর করে থাকেন। তিনিই ভাগ্যবান ব্যক্তি। এ ছাড়া সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান যিনি শত্রু-মিত্র সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, সম্মানের পাত্র। দুনিয়াতে এমন লোকের সংখ্যা কোনো সময়েই বেশি থাকে না। যারা এগুলোর অধিকারী হন তারা নিজের জাতির, সমাজের, দেশের অনেক উপকার করেন।

ওসমান (রা.) ছিলেন এই ধরনের একজন মানুষ, যাকে সবাই শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাতো, ভালোবাসত। তিনি মক্কার সম্মানীয় বংশের লোক ছিলেন। এ কারণে ইসলামের শত্রু হলেও মক্কাবাসীরা ওসমান (রা.) কে সমীহ করত এবং মনের অজান্তেই শ্রদ্ধা করত।

মুসলিমরা মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাওয়ার অনেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে মুসলিমরা কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। মুসলিমদের শক্তি সামর্থ্য অনেক বেড়েছে। প্রিয় নবীসহ সকল মুসলিমের মনে হজ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। বহুদিন তাঁরা হজ করেননি। তাই হজ করার জন্য তাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এ নিয়ে পরামর্শ হলো। সিদ্ধান্ত হলো, এবারের হজ মৌসুমে মুসলিমরা হজ করতে যাবেন। সময় বেশি ছিল না। প্রিয় নবী সবাইকে তৈরি হতে বললেন। দিন এবং সময় ঠিকঠাক হলো। প্রিয় নবী চৌদ্দশ' সাহাবা নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাথে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নিলেন না। দরকারি কাপড়-চোপড় ও খাবার নিলেন মাত্র। মদীনা থেকে মক্কা আসার পথে বহু গোত্রের বহু লোকের সাথেই মুসলিমদের দেখা হলো। তাঁরা বিনয়ের সাথে সবাইকে জানালেন যে, তাঁরা হজ করতেই মক্কায় যাচ্ছেন। তাদের সামনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

মুসলিমদের এই কাফেলা যাঁরা দেখেছেন, তাদের সবাই তো আর মুসলিমদের বন্ধু ছিলেন না। তাদের কেউ কেউ মক্কায় গিয়ে খবর দিলেন যে, মুসলিমরা মক্কা আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছেন। মক্কার সবাই বসে সভা করল। সিদ্ধান্ত নিলো। কোনো অবস্থাতেই মুসলিমদের মক্কায় ঢুকতে দেয়া হবে না। জীবন দিয়ে হলেও মুসলিমদের প্রতিহত করা হবে। মক্কায় সর্দাররা তাই মক্কাবাসীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলল। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কেউ কেউ মুসলিমদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য গোপনে খোঁজ খবর নিলো।

কাফেলা মক্কার কাছাকাছি আসতেই শুনল, মক্কাবাসীরা তাদের ঢুকতে দেবে না। মুসলিমরা মক্কার দিকে অগ্রসর হলে মক্কাবাসীরা তা প্রতিহত করবে। প্রিয় নবী মক্কাবাসীদের বন্ধু বিভিন্ন গোত্রের লোকের দ্বারা খবর পাঠালেন যে, মুসলিমরা এবার শুধু হজ পালন করতেই মক্কায় আসছে। হজ পালন শেষেই তারা আবার মদীনায় ফিরে যাবে। এক দণ্ডও তারা মক্কায় অবস্থান করবে না। তাদের সাথে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেই। সুতরাং আক্রমণ করা বা যুদ্ধ করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। মক্কাবাসীরা বুঝল। কিন্তু কারো কথা

www.nagorikpathagar.org

শুনল না। মানল না। তারা ভাবল এই তো বড় সুযোগ। এই সুযোগেই দুনিয়া থেকে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই চলল। কিন্তু বেশি হৈ চৈ করল না। যদি মুসলিমরা টের পেয়ে যায়।

ধীরে ধীরে মুসলিমদের কাফেলা এগিয়ে এলো। তারা প্রায় মক্কার কাছাকাছি চলে এলো। এমন সময় প্রিয় নবী খবর পেলেন, মক্কার চারদিকে মক্কাবাসীরা সৈন্য সমাবেশ করছে। কোনো অবস্থাতেই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। তিনি সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন এবং পরামর্শ মতো কাফেলার অভিযান আপাতত বন্ধ রাখলেন। আর না এগিয়ে সেখানেই ছাউনি ফেললেন। তারপর এক ব্যক্তিকে তিনি মক্কায় পাঠালেন। মক্কাবাসীরা তাঁর কোনো কথাই শুনতে রাজি হলো না। তারা তাঁর উটের পা কেটে দিলো এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য বন্দি করে রাখল। মক্কাবাসীদের শুভাকাংক্ষী সৈন্যরা ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল। তিনি মুসলিমদের ছাউনীতে ফিরে এলেন। এই ঘটনায় মুসলিমদের মনে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। তারা ছাউনি উঠিয়ে পুনরায় রওনা হওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল। প্রিয় নবী সবাইকে শান্ত করলেন, বুঝালেন এবং মক্কায় একজন সম্মানিত দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। কে এই দূত হবেন? কে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে যুদ্ধবাজ মক্কাবাসীদের সাথে কথা বলবেন? মক্কাবাসীরা কোনো মুসলিম নেতার কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করবেন? কোন্ নেতার কথা শুনবেন? মানবেন? মক্কাবাসীদের উপর কোন মুসলিমের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে? কে এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ থেকে, অনিবার্য রক্তপাত থেকে দুই পক্ষকে বাঁচাবেন? কে তার চরিত্র-মাধুর্য দিয়ে শত্রু ও মিত্রের মধ্যে সমঝোতা করবেন? সবাই মিলে অনেক ভেবে-চিন্তে, আলাপ-আলোচনা করে ঠিক হলো ওসমান (রা.) প্রিয় নবীর দূত হিসেবে মক্কায় যাবেন। এই কাজের জন্য তিনিই হলেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। মক্কাবাসীদের চোখে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, সম্মানের পাত্র। তারা তাঁর কথা শুনবে, মানবে।

তোমরা সকলেই জানো, ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পরই ওসমান (রা.) নিজের দেশ মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই যে গেলেন, তার পরে প্রায় এক যুগ পার হয়ে গেছে। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেও তিনি মদীনাতেই বসবাস করছিলেন। অন্য মুসলিমদের মতো তিনিও মক্কায় ফিরে যেতে পারেননি। এবারই প্রথমবারের মতো হজ করার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে মুসলিমদের দূত হিসেবে মক্কাবাসীদের কাছে যেতে হচ্ছে। সহজেই অনুমান করতে পারছো যে, কাজটা খুব সহজ ছিল না। বরং বড় কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। জীবনের আশঙ্কা ছিল। প্রিয় নবী যখন ওসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে একা একা মক্কায় যাওয়ার আদেশ দিলেন তখন তিনি আনন্দের সাথেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কোনো সন্দেহ-সংশয় ভয়-ভীতি মনে আনেননি। সরাসরি তিনি মক্কাবাসীদের সামনে হাজির হলেন।

মক্কাবাসীরা তাঁকে সম্মানের সাথেই অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আগেই শপথ করেছে যে, সমস্ত রক্তের বিনিময়েও মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না তাই তারা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে পারল না। তবুও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে ওসমান (রা.)-কে বললেন: "আপনি হজ করতে চাইলে করুন। আমরা আর কাউকেও হজ করতে দেবো না।" ওসমান (রা.) তাদের কথা মানলেন না। তিনি বললেন : "প্রিয় নবীকে বাদ দিয়ে আমি হজ পালন করবো, এ কথা তোমরা ভাবলে কি করে? কোনো অবস্থাতেই আমি প্রিয় নবীকে বাদ দিয়ে হজ পালন করতে পারবো না।"

www.nagorikpathagar.org

ছাউনিতে ফিরে আসতে ওসমান (রা.)-এর দেরি হচ্ছিল। এদিকে কে বা কারা রটিয়ে দিলো যে, মক্কাবাসীরা ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এ কথা শোনার পর মুসলিমদের মনের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা তো তোমরা আঁচ করতে পারছ। মুসলিমরা শপথ পরিচালনা করলেন যে, সমস্ত জীবনের বিনিময়েও ওসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণ না করে একজন মুসলিমও মদীনায় ফিরে যাবে না। এই অবস্থায় মুসলিমদের মনে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তোমরা আগেই জেনেছ যে, মুসলিমদের কাছে কোনো রকম অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। অস্ত্র ছাড়াই তারা মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো।

মুসলিমদের ছাউনিতে যুদ্ধের প্রস্তুতি দখে মক্কাবাসীরা ভয় পেয়ে গেল এবং মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে রাজি হলো। ওসমান (রা.) ফিরে এসে মক্কাবাসীদের মনোভাব প্রিয় নবীর কাছে জানালেন।

এই কাহিনী থেকে তোমরা কি জানতে পারলে? নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ যে, ওসমান (রা.) মুসিলমদের কাছে নয়, কাফেরদের কাছেও কত বড় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কত বড় সম্মানের পাত্র ছিলেন। যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি শত্রুদের কাছ থেকে যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পেয়েছিলেন। কত বড় সম্মান কাফেররা তাঁর প্রতি দেখিয়েছিল, তা কি তোমরা আঁচ করতে পারো? যেখানে তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল কোন মুসলিমকেই মক্কায় ঢুকতে দিবে না। সেখানে ওসমান (রা.)কে তারা মক্কায় ঢুকতে তো দিয়েছিলই উপরন্তু হজ পালন করারও অনুরোধ জানিয়েছিল। সে সময় এটা কম বড় কথা ছিল না। শত্রুদের কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার আশা করাও ছিল বাতুলতা। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ওসমান (রা.)-এর জন্য। কারণ ওসমান (রা.)-কে তারা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারেনি।

অন্যদিকে মুসলিমরা তাঁর প্রতি কত শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা পোষণ করত, তা তো তোমরা দেখলেই। এক ওসমান (রা.)-এর বদলা নেয়ার জন্য স্বয়ং প্রিয় নবী গোটা মুসলিম কাফেলাকে শহীদ হওয়ার শপথ করালেন। নিরস্ত্র অবস্থায় জীবন দেয়ার জন্য মুসলিমরা প্রস্তুত হয়ে গেল। মানুষের প্রতি মানুষ কি আর কোনো দিন এ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে? ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। এদিক থেকে ওসমান (রা.) ছিলেন সত্যিই ভাগ্যবান ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

স্বজন-পরিজনের সেবা

আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই গরিব। কিছু লোক আছেন যারা আবার খুব ধনী। তাঁদের অনেক টাকা-পয়সা। তাঁরা খুব আরাম-আয়েশে জীবন কাটান। অভাব-দারিদ্র তাদের জীবনে আসে না। এসবের মর্মার্থ তারা বুঝতে পারে না। এদের মধ্যে কারো কারো একটির জায়গায় কয়েকটি বাড়ি, গাড়ি রয়েছে। দিন দিন এরা ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে। ব্যাংকে বেশি বেশি টাকা জমা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এদের নামে জমিজমা, বাড়িঘর হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দান-খয়রাত যে করে না, তা নয়। স্কুল, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে এরা টাকা-পয়সা দান করেন। কেউ কেউ নিজের এলাকায় রাস্তাঘাট, দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠা করেন। এসব দানে দেশ, সমাজ ও গরিব জনসাধারণের অনেক উপকার হয়। আবার দেখা যায় এসব দানশীল ব্যক্তিরাই দান-খরাতের বিনিময়ে সমাজের নেতা হন। মেম্বার হন। চেয়ারম্যান হন। মন্ত্রী হন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমাজের কল্যাণে যত টাকা তারা দান করেন, তার অনেক বেশি তাঁরা আয় করে নেন। গরিব জনসাধারণের পয়সা আত্মসাৎ করে নিজের নামে দান করেন। একেই বলে "গরু মেরে জুতা দান।"

এসব ধনী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাই যে আবার ধনী তেমন কিন্তু নয়। এদের মধ্যে অনেকেই দীন-দরিদ্র ও গরিব রয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে শতকরা ৮৫ জন যেখানে কৃষিজীবী হালচাষ করে খায়। এই চাষিদের শতকরা ৭৫ জনেরই জমিজমা নাই। তাদের ভূমিহীন বলা হয়। বুঝতেই পারো, কত গরিব আমাদের দেশের লোক। সুতরাং ধনী লোকের যে অনেক গরিব আত্মীয়-স্বজন থাকবে এতে আর সন্দেহ কি? গরিব আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায় সময় আশা করে যে, ধনী আত্মীয়ের কাছে কিছু না কিছু সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। কিন্তু আশা–আশাই থেকে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গরিব আত্মীয়ের এই আশা পূরণ হয় না। ধনী আত্মীয় আরও ধনী হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই গরিব আত্মীয়-স্বজনরা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর ধনী আত্মীয়ের কাছেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ধনী আত্মীয় সুযোগ বুঝে কম দামে এসব কিনে বাহ্‌বা লুফে নেয়। ধনী আত্মীয়ের পক্ষ থেকে গরিব আত্মীয়ের জন্য এটাই বড় সাহায্য ও সহযোগিতা। নামমাত্র দামে গরিব আত্মীয়ের সহায়-সম্বল নিজের করে নিয়ে এরা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায় "তমুকের জমিটা, বাড়িটা যদি ওসময়ে না নিতাম তা হলে বেটা পরিবার-পরিজন নিয়ে মারা যেত।" গরিব অসহায় আত্মীয়ের করার কিছুই থাকে না। তিনিও মনে করেন : হ্যাঁ তাইতো, উনি সাহায্য না করলে সে সময় তো ঠিকই মারা যেতাম। এই হলো আমাদের সমাজের সাহায্য-সহযোগিতার নমুনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজে এই হচ্ছে।

তোমরা সকলেই জানো, ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওসমান (রা.) বিরাট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা এটা জান যে, তিনি অতি বড় দানশীল ছিলেন। নিজের অর্থ-সম্পদের বেশির ভাগই তিনি ইসলামের জন্য দান করেছিলেন। তাঁর দানের পরিমাণ এত বেশি যে, সাধারণভাবে সেটা কল্পনাও করা যায় না। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, প্রিয় নবী এবং খেলাফতকালে শত্রুদের সঙ্গে মুসলিমদের যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, তার বেশিরভাগ ব্যয়ভারই তিনি বহন করেছিলেন।

তাবুক যুদ্ধের ঘটনাই ধর না। তখন ছিল খুব অভাব-অনটনের যুগ। মানুষের আয় বলতে তেমন কিছুই ছিল না। যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রিয় নবী ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। রোমের রাজার সাথে যুদ্ধ। রোমের রাজা

www.nagorikpathagar.org

খুব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজা। কোনো কিছুই তার অভাব নাই। সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, খাদ্য-রসদ কোনো কিছুরই তার অভাব ছিল না। অপর দিকে মুসলিমদের মনোবল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রিয় নবী মুসলিমদের সামরিক খাতে ধন-সম্পদ দান করতে বললেন। মুসলিমরা তার আদেশ মতো যে যা পারল দান করল। ওসমান (রা.) যুদ্ধের সব খরচের তিন ভাগের এক ভাগ বহন করার দায়িত্ব নিলেন। যতদূর জানা যায়, এই যুদ্ধে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল। এ থেকে ধরে নেয়া যায় প্রায় ১২/১৩ হাজার সৈন্যের অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য রসদ, কাপড়-চোপড় এমনকি জুতার ফিতাও তিনি দিয়েছিলেন। এরপরও তিনি এক হাজার উট, ৭০টি ঘোড়া এবং রসদের জন্য এক হাজার দিনারও অতিরিক্ত দান করেছিলেন। এছাড়া মদীনায় অবস্থিত "মসজিদে নববী" নামের মসজিদটি বড় করার জন্য তিনি বিপুল অর্থ দান করেছিলেন।

খেলাফত আমলে তিনি বহু জনহিতকর কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন। মদীনার অদূরে অবস্থিত 'মাহযোর" বাঁধ তিনি নির্মাণ করেছিলেন। এই বাঁধ নির্মাণের আগে মদীনায় বন্যার পানি আসত। এতে জনবসতির খুব ক্ষতি হতো। বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যার পানি আর মদীনায় আসতে পারত না। জনসাধারণের জন্য তিনি রাস্তা, পুল, মসজিদ নির্মাণ করেন। 'কুফা' শহরে কোনো 'মুসাফিরখানা' ছিল না। তিনি মুসাফিরখানা তৈরি করেন। রাজ্যের বড় বড় রাস্তাঘাটগুলো আরও বড় করেন। রাস্তার পাশে পুলিশ ফাঁড়ি, সরাইখানা ও নহর তৈরি করেন।

মদীনায় তিনি সরাইখানা, বাজার ও মিঠা পানির কুয়াও খনন করেন। ঘোড়া ও উট পালনের জন্য সারা দেশে তিনি বড় বড় চারণ ক্ষেত্র তৈরি করেন। এই চারণ ক্ষেত্রের কোনো কোনোটি দশ মাইল লম্বা এবং দশ মাইল চওড়া ছিল। চারণ ক্ষেত্রের কাছে অনেক কূপ খনন করেন। পালকদের জন্য চারণ ক্ষেত্রের আশপাশে গৃহ নির্মাণ করেন। এসব দান-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ ছাড়াও তিনি প্রতিদিন অনেক ছোট-বড় দান খয়রাত করতেন। প্রতি জুমআর দিন তিনি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতেন। বিধবা, এতিমদের নিয়মিত সাহায্য করতেন।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি ওসমান (রা.) ইসলাম, মুসলিম ও জনসাধারণের জন্য কিভাবে দান-খয়রাত, সাহায্য-সহযোগিতা ও কল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। এখন আমরা আলোচনা করব– আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তিনি কেমন উদারভাবে নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশের ধনীদের মতো তিনি শুধু ধন-সম্পদের পাহাড় গড়েননি। অথবা নিজের ভোগের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করেননি। তিনি বহু আত্মীয়-স্বজনকে লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করতেন। আত্মীয়-স্বজনকে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় জমি দান করেছেন। নিজের চাচাকে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ১ লাখ দিরহাম দান করেন। তিনি নিজের কন্যাকে বিয়ের উপহার স্বরূপ এক লাখ দিরহাম দান করেন। এভাবে আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনে তিনি হাজার হাজার দিরহাম দান করেছেন। বন্ধু-বান্ধবদের প্রয়োজনে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ ও দান করতেন। বেশিরভাগ সময় তা আর ফেরত নিতেন না। কেউ ফেরত দিতে চাইলে তিনি তা নিতেন না। এইভাবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে তিনি স্বাবলম্বী করে তুলেছিলেন। তার কোনো আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবই তার আমলে গরিব ছিল না।

এভাবে একই সাথে দেশ, জাতি, ধর্ম, জনসাধারণ ও আত্মীয়-স্বজনের সেবা কতজনই বা করতে সক্ষম হয়েছেন? ইতিহাসে এর নজির মেলা ভার।

আমাদের দেশের ধনীরা যদি ওসমান (রা.)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গরিব আত্মীয়-স্বজনকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করতেন তাহলে আমাদের সমাজে ধনী আর গরিবের এত ব্যবধান সৃষ্টি হতো না। তোমরা বড় হলে তোমাদের ধনী আত্মীয়-স্বজনকে ওসমান (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করার জন্য বলবে।

www.nagorikpathagar.org

এক হাজার ভাগ লাভ

দুর্ভিক্ষের কথা শুনেছ। যখন সারাদেশের মানুষ খাদ্যের অভাবে খেতে পায় না, না খেয়ে অনেকে মারা যায়। অনেকে আজেবাজে জিনিস খেয়ে দারুণ অসুখে পড়ে, সে অবস্থাকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলে। আমাদের দেশে অনেকবার এ অবস্থা হয়েছে। বেশি দিনের কথা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও একবার দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের সে দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা গিয়েছিল। খাদ্যের অভাবে মানুষ শহরগুলোর দিকে ছুটে এসেছিল। কিন্তু শহরে খাদ্য না পেয়ে অনেকেই রাস্তা-ঘাটে মারা গেছে। তোমাদের মত কত শিশু-কিশোর যে না খেয়ে এবং আজেবাজে জিনিস খেয়ে মারা গেছে তার কোনো লেখা-জোখা নেই। তোমরা নিজেরাও নিশ্চয়ই এসব দেখেছ। সারাদেশে তখন চালের সের দু'টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল দশ টাকা, আটার সের হয়েছিল আট টাকা। তেল আর ঘি এক দামে বিক্রি হয়েছিল। চিনি থেকে লবণের দাম বেশি হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় কি দেখেছ? দেখেছ জিনিসের দাম মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ে। ব্যবসায়ীরা লোভী হয়ে ওঠে। তারা জিনিসের দাম বাড়াতে থাকে। জিনিসের অভাব থাকে বলে এর কোনো প্রতিকারও হয় না। দুর্ভিক্ষের সময় কোনো ব্যবসায়ীকে কম দাম নিতে দেখেছ কি? অসম্ভব। কোত্থেকে দেখবে? ওরা তো তখন কসাই হয়ে যায়, মানুষের গলা কেটেই পয়সা আদায় করে। কে কত বেশি নিতে পারে, তখন তাদের সেই প্রতিযোগিতা।

কিন্তু দুনিয়াতে এমন দুর্ভিক্ষও হয়েছে, যখন কোনো কোনো ব্যবসায়ী বেশি দাম নেন নাই। লাভ করেন নাই। সেসব কাহিনী তোমরা বড় হলে জানতে পারবে। আজ এমন এক ব্যবসায়ীর কথা তোমাদের বলব, যিনি দুর্ভিক্ষের সময় দাম বেশি নেয়া তো দূরের কথা, কোনো দাম না নিয়েই সমস্ত খাদ্যশস্য দান করে দিয়েছিলেন। খুব আশ্চর্য লাগে তাই না?

আবুবকর (রা.) তখন খলীফা। হঠাৎ খাদ্যের অভাব দেখা দিলো। মানুষ খুব কষ্টে পড়ে গেল। সরকারি সাহায্য পুরোপুরি প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না। ওসমান (রা.) তখন খুব ধনী ব্যবসায়ী। শত শত উটের পিঠে করে মালপত্র নিয়ে দেশ-বিদেশে তিনি ব্যবসা করেন। আরবের বড় ধনীদের মধ্যে তিনিও একজন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখে তাঁর মন কেঁদে উঠল। তিনি তাঁর শত শত উটের পিঠে করে হাজার হাজার মণ খাদ্য-শস্য বিদেশ থেকে আমদানি করলেন। খাদ্য-শস্যগুলো মদিনায় পৌছতেই ব্যবসায়ীরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। বললেন "এগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করুন। আমরা আপনাকে শতকরা ৫০% ভাগ লাভ দেবো।" অনেক কথার পর তারা এ কথাও বলল যে, এগুলো তারা দুর্ভিক্ষে জর্জরিত জনগণের মধ্যেই কম দামে বিক্রি করবেন। ওসমান (রা.) ভাবলেন, এগুলো বিক্রি করলেই ওরা দাম বাড়িয়ে দেবে। এতে সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধা হবে। এতদিন খাদ্যের অভাবে তাদের কষ্ট হচ্ছিল, এবার খাদ্য সরবরাহের

www.nagorikpathagar.org

কারণে তাদের কষ্ট হবে। এ কষ্ট তিনি কী করে দেখবেন। কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন, তারপর ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ করে বললেন, "তোমরা কি আমাকে এক হাজার ভাগ লাভ দিতে পার? তা হলে আমি খাদ্যশস্যগুলো দেবো।"

ব্যবসায়ীরা অবাক হয়ে গেল। তারা বলল, "আপনার এ দাবি একেবারে অযৌক্তিক। কে আপনাকে এত লাভ দেবে?"

ওসমান (রা.) বললেন, কেন আল্লাহ দেবেন? ব্যবসায়ীরা বলল, কেমন করে দিবেন? ওসমান (রা.) বললেন, "ওহ্ এই কথা। আমি এই সমস্ত খাদ্যশস্য গরিব, দুঃখী, অভাবী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। আর এর প্রতিদানে আল্লাহ্ আমাকে এক হাজার ভাগ লাভ দেবেন।"

ব্যবসায়ীরা অবাক হয়ে গেল। সত্যি সত্যি তিনি সমস্ত খাদ্যশস্য মদীনাবাসীদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

তিনি অনেক বড় দয়ালু, অনেক বড় দানশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি কাহিনী রয়েছে।

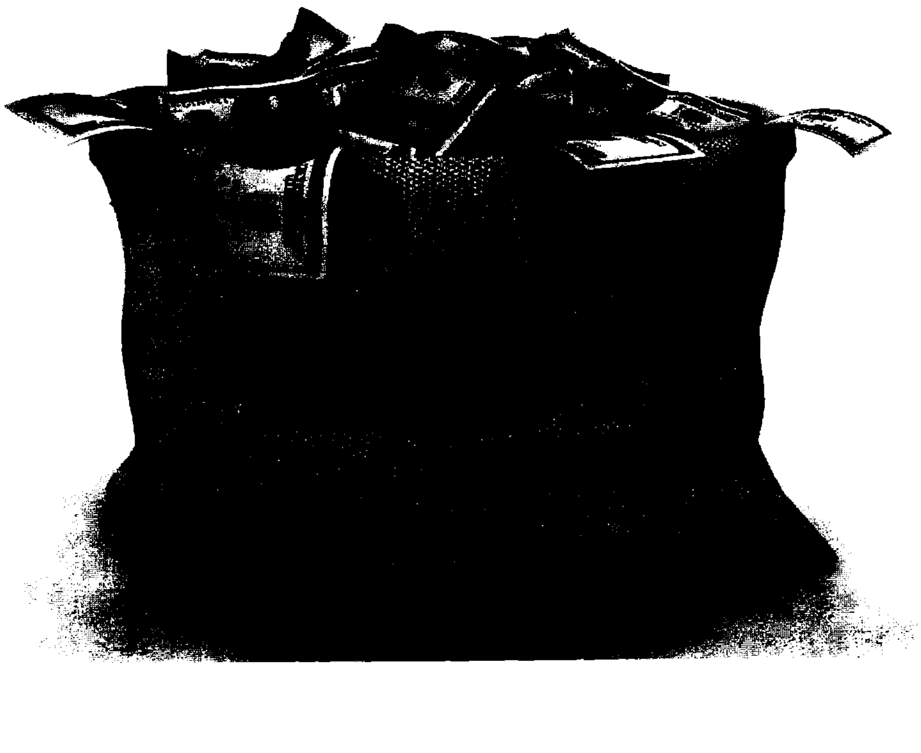

www.nagorikpathagar.org

সারি সারি উট

এক গরিব লোকের ঘরে বিয়ের বয়সী মেয়ে ছিল। গরিবের মেয়ে বলে বিয়ের প্রস্তাব আসত না। কেন না, বিয়েতে তিনি ঢাক-ঢোল পিটাতে পারবেন না। খানা-পিনার দাওয়াত দিতে পারবেন না। জামাই-বউ সাজিয়ে দিতে পারবেন না। যৌতুক দিতে পারবেন না। গরিব লোকটি চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। কোনোভাবেই টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। বহু খোঁজাখুঁজির পর, সামান্য যৌতুকের বিনিময়ে এক যুবক ঐ গরিবের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হলো। কিন্তু সেই সামান্য যৌতুক দেয়ার টাকাও তো তার কাছে নেই। মহা ফাঁপরে পড়লেন তিনি। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে তিনি প্রিয় নবীর কাছে গেলেন এবং সব কথা খুলে বললেন। প্রিয় নবীর দরদী মন তাকে সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু তার যে কিছুই করার নেই। কেননা তিনিও তো তারই মতো দীন-হীন দরিদ্র। কি করে তিনি সাহায্য করবেন। অনেক ভাবলেন তিনি, তারপর ঐ গরিব বেচারাকে বললেন, আপনি ওসমান (রা.) কাছে যান। তিনি দয়ালু দানশীল ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁকে প্রচুর দিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবেন। আপনি তার কাছেই যান।

প্রিয় নবীর কথামতো লোকটি ওসমান (রা.)-এর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। মনটা তার আশায় ভরে উঠল। ভাবলেন, এবার হয়তো তিনি মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবেন। তার চোখের সামনে বিয়ের কনে বেশি মেয়ের চেহারা ফুটে উঠতে লাগল। যতই তিনি ওসমানের (রা.) বাড়ির কাছাকাছি হন, ততই তিনি আশান্বিত হয়ে উঠেন। না, এবার আর কোনো চিন্তা নেই। প্রিয় নবীর পরামর্শ বৃথা যেতে পারে না। আর তাছাড়া সারা আরবে ধনী ও দাতা হিসেবে ওসমানের কত নামডাক। ধনীতো কতই আছেন, কিন্তু ওসমানের (রা.) মতো দাতা আছে কয়জন? নিজের সর্বস্ব উজাড় করে তিনি দান-খয়রাত করেন, সাহায্য এবং সহযোগিতা করেন। কত গরিব কাঙ্গাল তার সাহায্য-সহযোগিতায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। কে তার হিসাব দেবে। মনের অজান্তে তিনি ওসমান (রা.)-এর জন্য দোয়া করলেন। ওসমান (রা.)-এর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখেন ওসমান (রা.) মাটিতে বসে কি যেন তালাশ করছেন, আর কাকে যেন একটু কড়া সুরে কি বলছেন। লোকটি কাছে গিয়ে দেখেন, ওসমান (রা.) বালুর মধ্যে পড়ে থাকা যবের দানা তুলছেন। সামান্য একটু জায়গায় কিছু যবের দানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রখর রোদের মধ্যে বসে ওসমান (রা.) তাই তুলছেন। এই দৃশ্য দেখে লোকটির তো চোখ ছানাবড়া! আক্কেল গুড়ুম। এ আবার কি! এত বড় ধনী লোক কি না কয়েকটি যবের দানার জন্য এত কষ্ট করছেন। এ কয়েকটি দানা না তুললেই বা কি হতো। এগুলো তো কোন কাজেই আসবে না। তিনি ভাবলেন, তাঁর ব্যবহার দেখে তো মনে হয় তিনি আদতে একজন কৃপণ লোক। তা না হলে বালুতে পড়ে থাকা যবের দানার জন্য অতো ব্যতিব্যস্ত তিনি হবেন কেন? তিনি আচমকা খুব নিরাশ হলেন। ভাবলেন, যিনি এত ক্ষুদ্র জিনিসের জন্য এত সজাগ, তিনি কি ভাবে আমাকে সাহায্য করবেন। না, তিনি সাহায্য করতে পারেন না। তিনি

www.nagorikpathagar.org

পুরোপুরি নিরাশ হলেন। ওসমানের কাছে গেলেন না, সাহায্যও চাইলেন না। যে পথে এসেছিলেন সে পথেই ফিরে গেলেন। বুকটা তার খান খান হতে লাগল। কত আশা-ভরসা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু সব আশার গুড়েই যেন বালি পড়ল।

দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু কোনোভাবেই তিনি বিয়ের টাকা জোগাড় করতে পারেন না। বহু জনের দ্বারে ঘুরেও কিছু করতে পারেননি। অবশেষে হতাশ হয়ে পুনরায় তিনি প্রিয় নবীর কাছে ফিরে এলেন। প্রিয় নবী তার কাছে তার মেয়ের বিয়ের খবরা-খবর জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সব কথা প্রিয় নবীর কাছে খুলে বললেন। প্রিয় নবী তো অবাক। বললেন, যাই হোক না কেন ওসমানের কাছে আপনার সব কথা খুলে বলা উচিত ছিল। সাহায্য না চেয়ে ফিরে আসা উচিত হয়নি। তিনি তাকে বললেন, আপনি আবার ওসমান (রা.) কাছে যান। তার কাছে আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা খুলে বলুন। নিশ্চয়ই তিনি আপনার দুঃখ বুঝবেন এবং সাধ্যমত সহযোগিতা করবেন।

প্রিয় নবীর আদেশে তিনি আবার ওসমান (রা.)-এর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে বেলা শেষ হয়ে এলো, সন্ধ্যা আগত প্রায়। মাগরিবের নামাজের পর তিনি ওসমান (রা.)-এর বাড়ির সামনে পৌঁছলেন। দেখলেন ওসমান (রা.) কার সাথে যেন কথা বলছেন-টিম টিম করে একটু আলো জ্বলছে। লোকটি আরো এগিয়ে গেলেন। গলা বাড়িয়ে দেখলেন, ওসমান (রা.) আগুনের সলতা ধরে আছেন, আর টিম টিম করে প্রদীপের আলো জ্বলছে। সলতাটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে প্রদীপটি আরও বেশি আলোকিত হতো কিন্তু ওসমান (রা.) চেষ্টা করছেন সলতা যাতে বেশি পোড়া না যায়। তেল যাতে বেশি খরচ না হয়। প্রায় অন্ধকারে বসেই তাঁরা আলাপ করছেন। এই দৃশ্য দেখে লোকটির মনে হলো হয়তো তিনি ওসমান (রা.) নন। কিন্তু যতবার সন্দেহ হয়, ততবার তিনি ভালো করে দেখেন, নাহ তিনি ওসমান (রা.)ই। তবে কেন তিনি সামান্য তেল খরচের ভয়ে এত কষ্ট করে সলতে ধরে আছেন? তাঁর মতো ধনী লোকের এই কৃপণতা কেন? কেনইবা তিনি এত কষ্ট করছেন। এর কোনো সদুত্তর তিনি খুঁজে পাননি। মনে মনে ভাবেন, যে ব্যক্তি সামান্য তেল খরচ করতে রাজি নয় তিনি কেমন করে তাঁকে সাহায্য করবেন। এত ছোট মন কি করে এত উদার হবে, এতো মহানুভব হবে? নাহ, তিনি কোনোভাবেই আমাকে সাহায্য করতে পারেন না। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ নেই, হয়তো অযথাই তাঁর কড়া কড়া কথা শুনতে হবে। বিফল মনোরথ হয়ে কাউকেও কিছু না বলে চুপিচুপি তিনি ফিরে এলেন। যে পথে এসেছিলেন, সে পথেই আবার ফিরে গেলেন।

বেশ কিছুদিন পর প্রিয় নবীর সাথে তার আবার দেখা হলো। প্রিয় নবী তার খবরাখবর জানতে চাইলেন। তিনি তার সব কথা প্রিয় নবীকে খুলে বললেন। প্রিয় নবী বিস্মিত হলেন। একদিকে খুশিতে তাঁর মন ভরে গেল। অন্যদিকে লোকটিকে এখনও কোন সাহায্য করা গেল না বলে তিনি মনে খুব দুঃখ পেলেন। খুশি হলেন এ কারণে যে, ধনী দাতা ওসমান (রা.) প্রয়োজনে অপচয়ও রোধ করতে পারেন। ব্যয় সংকোচও করতে পারেন। তিনি অনেক ভাবলেন। লোকটিকে উপদেশ দিলেন যে, ওসমানের (রা.) এসব আচরণ দেখে আপনার বিচলিত হওয়া উচিত হয়নি। আপনি সরাসরি তাঁর কাছে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে সহযোগিতা করবেন।

www.nagorikpathagar.org

তোমরা বুঝতেই পারছ, দু'বার ফিরে আসার পর আবার ওসমানের (রা.) কাছে যাওয়ার কোনো আগ্রহই তার ছিল না। থাকার কথাও নয়। এমন অবস্থায় কেই বা আবার আশাবাদী হয়। তবু প্রিয় নবী যখন বলেছেন, প্রিয় নবীর আদেশ কি করে তিনি অমান্য করেন? এক রকম হতাশ মনে তিনি আবার ওসমান (রা.)-এর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে চললেন। ওসমান (রা.)-এর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। কোন রকম সংকোচ ছাড়াই তিনি এবার সরাসরি ওসমানের (রা.) নিকট তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললেন। লোকটির কথা শুনে ওসমান (রা.)-এর নরম মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল। কিন্তু সাহায্য করার মতো তাঁর কাছে তখন তেমন কিছুই ছিল না। তিনি লোকটিকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললেন।

এক কর্মচারীকে ডেকে তিনি বললেন, কয়েকদিন পর সিরিয়া থেকে সারিবদ্ধ উটের পিঠে করে টাকা-পয়সা, মাল-সামান আসবে। সবচেয়ে সামনে যে উটটি থাকবে সেই উটটি ওনাকে দিয়ে দেবে। সাবধান, ঐ উটের পিঠে রক্ষিত কোনো মালামালই তোমরা সরাবে না। মালামালসহই উটটি তাঁকে দেবে।

ওসমানের (রা.) কাছে আশ্বাস পেয়ে মনের আনন্দে লোকটি বাড়ি ফিরে গেলেন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে এই কথা জানালেন। সবাই শুনে মহা খুশি হলো। অবশেষে তাদের মেয়ে বিয়ের সাজে সাজতে পারবে এটাই তাদের বড় সান্ত্বনা।

দিন যায়। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কখন তাদের বাড়িতে ওসমানের (রা.) মালামাল বোঝাই উট এসে হাজির হবে। দেখতে দেখতে একদিন সত্য-সত্যিই মালপত্র বোঝাই উট এসে হাজির হলো। কিন্তু একি! বাড়ির দরজায় এতো উট কেন? শত শত উটের সারি দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা অবাক হয়ে দেখছে। উট চালকরা প্রথম উটটি রেখে বাকি উটগুলো ওসমানের (রা.) বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। প্রথম উটটি যেদিকে যায়, পেছনের উটগুলোও সেদিকে রওনা হয়। কোনোভাবেই এগুলোকে ঠেকানো যায় না। সবাই চিন্তিত হলো। বুদ্ধি-পরামর্শ দিলেন। কেউ কেউ ওসমান (রা:)কে পরামর্শ দিলেন প্রথম উটটি বাদ দিয়ে আপনি সারির শেষ উটটি দান করুন না কেন? এতে তো কোনো অসুবিধা নেই। প্রতি উটের পিঠে মাল-সামান রয়েছে প্রায় একই রকম। ঐ লোকটিকে তো আর ঠকানো হচ্ছে না। কিন্তু প্রথম উটটি দান করলে পেছনের উটগুলো তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

ওসমান (রা.) বললেন, প্রথম উটটি দেয়ার জন্যই আমি ওয়াদা করেছি। ওয়াদা আমি নড়চড় করতে পারি না। উটগুলো যদি না আসে, তবে তাই হোক। সমস্ত উট মালামালসহ ঐ লোককেই দান করা হোক। ওসমান (রা.)-কে অনেকেই বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তিনি তাঁর ওয়াদার ওপর অচল-অটল রইলেন। বহু চেষ্টা করেও একটি উটকেও ফিরিয়ে আনা গেলো না। অবশেষে ওসমানের (রা.) ইচ্ছায় মালামালসহ সমস্ত উটই ঐ গরিব বেচারাকে দান করা হলো।

এমন দানের কথা কি তোমরা কখনও শুনেছ? বহু লাখ টাকার মালামাল ওভাবে তিনি দান করেছিলেন। তাই না? এত দান করেও তিনি কোনো দিন গরিব হননি। বরং যত দান করেছেন, আল্লাহ তাঁকে তত দিয়েছেন। দান করলে আল্লাহ ধন সম্পদ বাড়িয়ে দেন। এই বিশ্বাসে তিনি বলীয়ান ছিলেন। তাই দান-খয়রাতে তিনি কোনোদিন কার্পণ্য করেননি। গরিব-দুঃখীদের অকাতরে তিনি দান করেছেন। বড় হলে তোমরা কি ওসমানের (রা.) দানশীলতার আদর্শ গ্রহণ করবে?

www.nagorikpathagar.org

শেরে খোদার বিয়ে

প্রিয় নবীর কন্যা ফাতেমা (রা.) বড় হয়েছেন। বিয়ের উপযুক্ত হয়েছেন। কোরাইশ বংশের ধনী তরুণদের মধ্যে অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। অনেকে নানাভাবে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু প্রিয় নবী কারো কোনো প্রস্তাবেই রাজি হলেন না। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললেই তিনি বলতেন, আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছি। যখন তাঁর হুকুম হবে তখন মা ফাতেমাকে বিয়ে দেবো। প্রিয় নবীর সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য মক্কা-মদীনার ধনী ও সম্মানী সকল পরিবারই আগ্রহী ছিল। ফাতেমাও ছিলেন রূপে গুণে সবার সেরা। ধীরে ধীরে ফাতেমার বিয়ের আলোচনা লোকের মুখে মুখে চলে গেল। আবুবকর (রা.) ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। তিনি প্রিয় নবীর কাছে গেলেন। ফাতেমার বিয়ের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না, তা জানতে চাইলেন। প্রিয় নবী আবুবকর (রা.)-কে একইভাবে বললেন, আল্লাহর হুকুম যখন হবে তখনই হবে। এ ব্যাপারে ওমর (রা.)ও তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। প্রিয় নবী তাঁকেও একই জবাব দিলেন।

ওমর (রা.) ও আবুবকর (রা.) দু'জনই চিন্তিত হলেন। দু'জনই মনে মনে বিয়ের উপযুক্ত ভালো ছেলে খুঁজতে লাগলেন। আবুবকর (রা.) একদিন এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর আলীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। ভাবলেন, আরে এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি হতে পারে। প্রিয় নবীর আত্মীয় আলীর কত নাম-ডাক, সৌর্যে-বীর্যে সারা আরবে তাঁর জুড়ি নেই। বিদ্যা-বুদ্ধিতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

প্রিয় নবীর জামাতা হওয়ার জন্য তাঁর যে গুণ ও যোগ্যতা রয়েছে সারা আরবে আর কারো তা' নেই। তিনি খুব খুশি হলেন। প্রিয় নবী এ প্রস্তাবে রাজি হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু তবু তিনি বিষয়টি ওমরের (রা.) সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে ওমরের (রা.) পরামর্শ চাইলেন, তিনি তো মহাখুশি। এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর কি হতে পারে! আলী (রা.) কোনো দিকেই কমতি নেই। শুধু তিনি গরিব। ওমর (রা.) বললেন, গরিব হওয়ার কারণেই হয়তো আলী (রা.) এতদিন চুপ করে আছেন। তা না হলে এতদিন তিনি এ প্রস্তাব দিতেন। আবুবকর (রা.) বললেন, গরিব হওয়া তো কোনো অপরাধ নয়। প্রিয় নবী বা তাঁর কন্যার কাছে এটা কোনো বড় প্রশ্নও নয়। আলী (রা.) যদি শুধু অভাবের কারণেই এ প্রস্তাব না দিয়ে থাকেন, তাহলে বিয়ের যাবতীয় খরচ আমরা সংগ্রহ করে দেবো। ওমর (রা.) বললেন, খুবই ভালো কথা। আমরা সবাই মিলে এই শুভ কাজ অবশ্যই সমাধা করার চেষ্টা করব।

আবুবকর (রা.) আলীর (রা.) নিকট গেলেন। আলী (রা.) ঐ সময় ফলের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। দূর থেকে আবুবকর (রা.)-কে দেখে তিনি তাঁর কাছে ছুটে এলেন, খবরা-খবর জানতে চাইলেন। একে অপরের খবরা-খবর নেয়ার পর আবুবকর (রা.) তাঁকে বিয়ে সংক্রান্ত সব কথা খুলে বললেন। আলী (রা.) বললেন, আমি গরিব মানুষ, আমার তো কিছুই নেই, কি দিয়ে আমি বিয়ে করব। আর সংসার পাতবই বা কি দিয়ে। আমার তো জমি-জমা, বাড়িঘর, সহায়-সম্বল বলতে কিছুই নেই। আছে শুধু একটি উট, একটি তলোয়ার, আর একটি যুদ্ধের পোশাক। আবুবকর (রা.) বললেন, আপনি ভাববেন না, প্রিয় নবী নিশ্চয়ই ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। সময়মতো সব কিছুর বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আপনি উদ্যোগ নিন। প্রিয় নবীর কাছে যেয়ে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিন। আমার তো মনে হয় আল্লাহ আপনার

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে মঞ্জুর করে রেখেছেন। এ জন্যই বোধহয় ফাতেমার বিয়ে দেরি হচ্ছে। আবুবকর (রা.)-এর কথায় আলী (রা.) রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে আমি প্রিয় নবীর কাছে গিয়ে নিজেই প্রস্তাব দেবো।

প্রিয় নবীর দরবারে মাথা নিচু করে আলী (রা.) একদিন বসে আছেন। প্রিয় নবী দেখলেন। বললেন, মনে হয় তুমি কিছু বলতে চাও, লজ্জাবশত বলতে পারছ না। আলী (রা.) আরও লজ্জা পেলেন। তিনি চুপচাপ থাকলেন। প্রিয় নবী তাকে সাহস যোগালেন। মনের কথা খুলে বলতে বললেন। আলী (রা.) সাহসে ভর করে বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, ছোটকাল থেকেই আমি আপনার সাথে আছি। আপনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। বড় করেছেন। পথ দেখিয়েছেন। অধর্ম থেকে ধর্মে এনেছেন। জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়েছেন। আমার শরীরে যা কিছু আছে সবই আপনার দান। আপনার খেয়েছি, আপনার পরেছি, আমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তো আপনি বহন করেছেন। আমার স্বভাব-চরিত্র, মনোবল, শৌর্য-বীর্য, যে সব কারণে লোকেরা আমাকে স্নেহ করে, ভালোবাসে, তার সবই তো আপনার দান। আপনি তো জানেন, আমার ঘর নেই, বাড়ি নেই এবং একজন স্ত্রীও নেই। যিনি সুখে-দুঃখে আমার সাথী হবেন, ন্যায় ও সত্য কাজে প্রেরণা যোগাবেন। অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।

প্রিয় নবী হাসলেন। বললেন-হ্যাঁ, বলো কি বলতে চাও। আলী (রা.) বললেন, ফাতেমা বড় হয়েছে। তার সাথে কি আমার বিয়ে হতে পারে না? আমি কি তার উপযুক্ত বর নই। প্রিয় নবী আবারও হাসলেন, বললেন-নিশ্চয়ই তুমি উপযুক্ত বর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বিয়ের জন্য যা যা দরকার, তা কি তোমার আছে? আলী (রা.) বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার চেয়ে আর কেউ বেশি জানেন না। আপনি জানেন আমার কি আছে, আর কি নেই। আমার জমি-জমা, সহায়-সম্পত্তি কিছুই নেই; আছে শুধু একটি উট, একটি তলোয়ার ও একটি যুদ্ধের পোশাক। যা আপনি আমাকে দান করেছিলেন। প্রিয় নবী বললেন, "উট এবং তলোয়ার তোমার কাজে লাগবে। যাও, যুদ্ধের পোশাকটি বিক্রি করে বিয়ের প্রস্তুতি নাও।"

আলী (রা.) ফিরে এলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি ওসমানের (রা.) কাছে গেলেন। সমস্ত কথা তাঁর কাছে খুলে বললেন। যুদ্ধের পোশাকটি তাঁর কাছে বিক্রি করতে চাইলেন। যুদ্ধের পোশাকটি ওসমান (রা.) রেখে তাঁকে সাড়ে চারশ' দিরহাম দিলেন। আলী (রা.) খুব খুশি হলেন। কেননা অন্য কেউ এত দামে এ পোশাকটি কিনত না। খুশি মনে তিনি ওসমানের (রা.) কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বিদায় দেয়ার আগে ওসমান (রা.) আলীকে (রা.) বললেন-এই যুদ্ধের পোশাকের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি বীর। এই পোশাকটি আপনাকেই মানায়। আমি এটা আপনাকে উপহার দিলাম। আলী (রা.) অবাক হলেন। তিনি কিছুই বললেন না, কেননা ওসমানের উদারতা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন।

মনের আনন্দে আলী (রা.) প্রিয় নবীর কাছে গেলেন। প্রিয় নবীর সামনে যুদ্ধের পোশাক ও দেরহামগুলো রাখলেন। এতগুলো টাকা এবং যুদ্ধের পোশাক দেখে প্রিয় নবী বিস্মিত হলেন। কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জানতে চাইলেন কি করে এতগুলো টাকা তিনি সংগ্রহ করলেন। আলী (রা.) সব কথা খুলে বললেন। শুনে প্রিয় নবীর বুক গর্বে ফুলে উঠল। তিনি ওসমানের (রা.) জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এই ছিল প্রিয় নবীর জামাতা ওসমান (রা.)-এর দানশীলতার নমুনা। সারা জীবন তিনি সকলের জন্য এমনিভাবে অকাতরে দান করেছেন। আমাদের সমাজেও তো বহু লোক অভাবের তাড়নায় বিয়ে-শাদী করতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে পারেন না। কত তাদের কষ্ট! কিন্তু কে এমন করে কার সমস্ত দায়িত্ব বহন করবে? কে কার সমস্যা এমনভাবে দূর করে দিবে? ওসমান (রা.)-এর মতো আমাদের সমাজের ধনীরা যদি অন্যের দুঃখ লাঘবে সচেষ্ট হন, তাহলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনেকাংশে দূর হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ভারতের প্রথম মুসলিম

এ উপমহাদেশে প্রথম কে মুসলিম হয়েছিলেন তা কী তোমরা জান? হয়তো জান না। সে এক মজার কাহিনী। শোনো তা-হলে।

ওসমানের (রা.) খেলাফতকাল। চারদিকে মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠানো হচ্ছে। রাজ-রাজড়ার দরবারে মুসলিম সেনাপতিরা যাচ্ছেন। ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। সেনাপতি মুগিরাকে একদল সৈন্যসহ ভারতে পাঠানো হলো। কোথায় মদীনা আর কোথায় ভারত ! হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। অথচ আসতেই হবে, ইসলামের দাওয়াত তো দুনিয়ার সব দিকে পৌছাতেই হবে। এ যে এক বিরাট দায়িত্ব। মুগিরা বহুদিন পরে বহুদেশে ঘুরে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মালাবার উপকূলে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন জমুর নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। রাজধানীর নাম কালিকট। রাজা তখন রাজধানীতে। মুগিরা রাজার কাছে চিঠি দিয়ে দূত পাঠালেন। দূত রাজদরবারে রাজার সামনে হাজির হয়ে বললেন, আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লার উম্মত। আমরা তৌহিদের বাণী প্রচার করি। আমরা অত্যাচারী রাজার রাজত্ব ধ্বংস করি। যে রাজা অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ করে না, মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দেয় না, আমরা তাদের বরদাস্ত করি না, আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করি। আমরা তাদের নির্যাতন-এর পরিবর্তে শাস্তি দান করি। পরাধীনকে স্বাধীনতা দান করি। মানুষকে আমরা জানিয়ে দেই, মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাস। অন্য কারো দাস নয়। তাদের আমরা বলি, তোমরা চোখ খোল, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার-অবিচার করছে, তোমরা তাদের থেকে হীন নও, দুর্বল নও, তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও। এ সবই আমাদের প্রিয় নবীর শিক্ষা। তাই আপনাকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি সত্য পথে, ন্যায় পথে ফিরে আসুন। আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মানুষের সেবা করুন, নয়তো সন্ধি করে ন্যায় ও ইনসাফের দ্বারা দেশ শাসন করুন। এর কোনোটাই যদি আপনি না করেন, তবে আমরা আপনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হবো।"

থমথমে রাজদরবার। পাত্র-মিত্র, সভাষদ সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মাত্র একটি লোক! অথচ কী সাহসই না তার! রাজার সামনে দাঁড়িয়ে রাজাকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছে। সবাই মনে করল, এখনই এর গর্দান যাবে। কেউ কেউ মনে করল, বেটা একটা পাগল। মাথা খারাপের মতো আবোল-তাবোল বকছে। কি যে শাস্তি হয়, এই চিন্তায় সবার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলতে লাগল। এতক্ষণ নীরব থেকে রাজা উঠে দাঁড়ালেন, দূতকে অভিনন্দন জানালেন।

বললেন : আপনার সাহসী বক্তব্য শুনে আমি খুশি হয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

দূত : আলহামদুলিল্লাহ!

রাজা : ওটা বললেন কেন ?

দূত : আমরা মনে করি সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য।

রাজা : মনে হচ্ছে, সত্যি আপনারা মহান।

এরপর রাজা জমুর সেনাপতি মুগিরার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। রাজা জমুর মুগিরার সাথে সন্ধি করলেন। মুগিরা রাজা জমুরকে মদীনায় দাওয়াত করলেন। জমুর খুশিমনে দাওয়াত কবুল করলেন। কয়েকদিন পর মুসলিম বাহিনীর সাথে রাজা জমুর মদীনায় এলেন। এসে তো অবাক! কোথায় রাজপ্রাসাদ, কোথায় রাজ-দরবার, কোথায় সিংহাসন, কিছুই যে নেই! রাজধানীরও নেই কোন শান-শওকত। সারা দুনিয়া যার ভয়ে কাঁপছে সেই খলীফার দম্ভ নেই, অহঙ্কার নেই, মেজাজ নেই। শাহানশাহী পোশাক নেই। সাধারণ মানুষের মতো তিনি উঠছেন, বসছেন, হাঁটছেন। মসজিদে নামাজ পড়াচ্ছেন। আবার মসজিদে বসেই লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন। নির্দেশ দিচ্ছেন। এই নির্দেশের দ্বারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় হচ্ছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! মন্ত্রের মতো মানুষ কাজ করছে, কথা শুনছে। কোন জুলুম নেই। নির্যাতন নেই। আপনাআপনি একটা নিয়মের অধীনে যেন সব কিছু হয়ে যাচ্ছে। রাজা জমুর যতই দেখেন ততই মুগ্ধ হন। ভাবেন, এভাবে যখন একটা বিরাট সাম্রাজ্য চলছে তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে সৃষ্টিকর্তার হাত রয়েছে। তিনি মুগ্ধ মনে ইসলাম কবুল করেন। আরও কয়েকদিন জমুর ওসমানের (রা.) অতিথেয়তা গ্রহণ করে অবশেষে আবার ভারতে ফিরে আসেন।

এভাবে রাজা জমুরই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুসলিম।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমদের রক্তপাত চাননি

মুসলিমদের এখন কত দল, উপদল– বলতে গেলে আগের মতো আর একতা নেই। প্রিয় নবীর জামানায় এবং খলীফাদের আমলে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা একক নেতৃত্বের অধীনে ছিল। মদীনা ছিল মুসলিমদের রাজধানী। ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, জেরুজালেম, মিসরসহ সমস্ত আরব দেশগুলো এ সরকারের অধীন ছিল। একই আইন ও শাসনের অধীনে এই সমস্ত দেশ শাসিত হতো। খলীফাদের বলা হতো "আমীরুল মোমেনীন।" তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সকল মুসলিমদের নেতা। এই বিরাট বিপুল সাম্রাজ্যকে ইসলামী রাষ্ট্র না বলে "ইসলামী কমনওয়েলথ" বলা যেতে পারে। ওমরের (রা.) আমলে প্রায় ৩টি মহাদেশে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। রাজাধানী মদীনা থেকে এক একটি প্রদেশ ছিল বহু দূরে। তবুও মুসলিমরা এক খলীফার নির্দেশে উঠতেন, বসতেন, নিজেদের জীবন পরিচালনা করতেন। ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে কোনো অনৈক্য বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। মুসলিমরা খলীফাদের প্রতি বরাবর আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ওসমানের (রা.) সময়ই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। সেই বিচ্ছিন্নতা আজও বিরাজমান। ওসমান (রা.)-এর আমলে যে বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছিল ক্রমে তা প্রসার লাভ করে। আজ তোমরা দেখছ যে, আরব দেশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান প্রত্যেকটি এখন আলাদা রাষ্ট্র। প্রত্যেকটি দেশের শাসন পদ্ধতি ভিন্ন। এই দেশগুলো এখন আর একই শাসনের অধীন নয়। অথচ এই দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। ইসলামী অনুশাসন তাঁরা মেনে চলেন। তাঁরা নামাজ পড়েন, হজ্ব করেন, জাকাত দেন। ঐসব দেশের মুসলিমদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ-এ কোনো প্রভেদ নেই। তারা একই ভাষায় কথা বলে। তবুও তারা বিচ্ছিন্ন। শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, তাদের মধ্যে আগের মতো সেই একতাও নেই।

শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবেই নয়, ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলিমরা এখন ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসারী। সকল দেশের সকল মুসলিম একভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করে না। একই দেশের ভেতরে আবার ভিন্ন ভিন্ন মতের মুসলিম রয়েছে। আগেই বলেছি, মুসলিমদের মধ্যে এই যে বিচ্ছিন্নতা, এর শুরু হয় ওসমান (রা.)-এর আমল থেকে। কিন্তু এর জন্য ওসমান (রা.) দায়ী ছিলেন না। তিনি যখন খলীফা হন, তখন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন উদার, মহৎ, পরোপকারী, দানশীল। ব্যবহারে ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, শালীন এবং রুচিবান। মন ছিল অত্যন্ত কোমল ও নরম। সবাইকে তিনি ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কারো প্রতি দুর্ব্যবহার করতেন না। তাঁর এই নমনীয়, ভদ্র, শালীন ব্যবহারে দুষ্ট লোকেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

ওমর (রা.)-এর মতো তিনি দুষ্টের দমন করতে পারলেন না। তিনি ভেবেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে সবার মন জয় করবেন। বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নররাও সুযোগ বুঝে তাঁর বিরোধিতা শুরু করল। তিনি তাঁদের

www.nagorikpathagar.org

চিঠিপত্র দিয়ে, লোক পাঠিয়ে সৎ পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কেউ শুনল, কেউ শুনল না। যাঁরা শুনল না, তাঁরা বুঝল খলীফা বৃদ্ধ, তদুপরি উদার ও নমনীয় মনোভাবের লোক। তিনি কঠোর হতে পারবেন না। এই সুযোগে তারা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। জনগণের ওপরও অত্যাচার-অবিচার চালাতে লাগলেন।

গভর্নরদের অত্যাচার অবিচারের ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তারা গভর্নরের ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে খলীফার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করল। দুষ্ট লোকেরা প্রচার করতে লাগল, খলীফার নির্দেশে সব কিছু হচ্ছে। খলীফার কাছে কোন গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গেলে খলীফা অত্যাচারী গভর্নরকে বাদ দিয়ে নতুন গভর্নর নিয়োগ করেছেন। কোনো কোনো রাজ্যে নতুন গভর্নর ক্ষমতায় বসতে গিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছেন। কেননা পূর্ববর্তী গভর্নররা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হননি। ওসমান (রা.) মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের লেলিয়ে দেননি। নতুন শাসনকর্তাকে তিনি বলেছেন– প্রথমেই আক্রমণ করো না। প্রথমে পূর্বতন গভর্নরকে খলীফার নির্দেশ গ্রহণের আহ্বান জানাবে। যদি সে আহ্বান না শোনে, তাহলে সালিশ ধরবে। সাধারণ মুসলিমদের কাছে বিচার দেবে। এরপরও যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে, তাহলে তার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করবে। চাপের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে যদি তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে পাল্টা আক্রমণ করবে। সাবধান! অযথা মানুষের রক্ত নষ্ট করো না। নারী, বৃদ্ধ ও শিশুকে হত্যা করো না। যত কম রক্তপাতে এসব কাজ সমাধা হয় ততই মঙ্গল। খলীফার উদারতা ও মহত্ত্বের সুযোগে কোনো কোনো রাজ্যে এমন সব নতুন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন, যারা ইসলামের শাসিত বিধি-বিধান ভুলে গিয়ে রাজা-বাদশাহর মতো দেশ শাসন করেছে। এসব গভর্নর শাসন ক্ষমতাকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োজিত করেছে। তারা আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে গিয়েছে। প্রজা সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দেখা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন। জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়ে তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। চতুরতার সাথে খলীফার নির্দেশ-ফরমান এরা লুকিয়ে রাখতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খলীফার নামে নিজেদের মনগড়া ফরমান তারা জারি করতেন।

এসব কারণে রাজ্যে-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অত্যাচারী গভর্নরের শোষণ-নির্যাতনে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দুষ্ট লোকেরা আগে থেকেই প্রচার করে আসছিল খলীফার নির্দেশেই গভর্নররা জনগণের ওপর অত্যাচার-অবিচার চালাচ্ছে, অতিরিক্ত ট্যাক্স-জাকাত আদায় করছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কোনো খোঁজখবর রাখে না। কৌশলী প্রচারণার ফলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে বিভ্রান্ত হলো, তারাও না বুঝে না শুনে খলীফার বিরোধিতা শুরু করল।

এদিকে খলীফার উদারতার সুযোগ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন যে যা পারল, খলীফার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে টাকা-পয়সা আদায় করল, উপঢৌকন নিলো অনেকেই। নিজেদের নামে জমিজমা বাড়িঘর আদায় করে নিলো।

তোমরা সকলেই জানো, ওসমান (রা.) খুব ধনী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর অর্থ-সম্পদ থেকেই এসব দান-দক্ষিণা করেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা প্রচার করে বেড়াতো যে, খলীফা সরকারি তহবিল থেকে তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অকাতরে দান করছেন। গভর্নরদের জুলুম-নির্যাতন, বিলাসী জীবনযাপন,

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা, সাধারণ মুসলিমদেরও খলীফার প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলল।

দেখতে দেখতে দুষ্ট লোকদের সহায়তায় বিদ্রোহী দল গড়ে উঠল। তারা রাজ্যে রাজ্যে খলীফার বিরুদ্ধে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল।

খলীফার সহযোগী, সহকারীরা খলীফাকে বার বার পরামর্শ দিতে লাগল কঠোরভাবে এই বিশৃঙ্খলা দমন করতে। কিন্তু দয়ালু খলীফা রক্তপাত করতে চাইলেন না। তিনি ভাবলেন এতে আরও বিশৃঙ্খলা বাড়িবে। আরও অরাজকতা সৃষ্টি হবে। মুসলিমদের হাত মুসলিমদের রক্তে তিনি রঞ্জিত করতে চাইলেন না।

খলীফার ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতার সুযোগে বিদ্রোহীরা আরও উৎসাহ পেল। তারা ধীরে ধীরে রাজধানী মদীনা ঘিরে ফেলল। মদীনার সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা বুঝতে পারল, বিপদ আসন্ন। তারা খলীফাকে বার বার বোঝাতে লাগল, আপনি হুকুম দিন আমরা জীবন দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করব। খলীফা অনুমতি দিলেন না। বিদ্রোহীরা আরও সুযোগ পেল, তারা বুঝল খলীফা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। তারা খলীফাকে মসজিদে ঘেরাও করে অপমান করতে লাগল। ঢিল ছুড়তে লাগল। আহত করতে লাগল। কিন্তু দয়ার সাগর ওসমান (রা.) তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

খলীফার এই সহনশীল ব্যবহারে বিদ্রোহীরা আরও সাহস পেল। তারা খলীফার বাড়ি ঘেরাও করল। খলীফাকে মসজিদে আসতে দিলো না। খলীফার বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। বহুদিন ধরে কষ্ট দিলো। এই অবস্থার মধ্যেও খলীফার অনুগত গভর্নর ও সেনাপতিরা এবং মদীনার সম্মানিত মুসলিমরা বার বার খলীফার কাছে অনুরোধ জানাতে লাগলেন : আপনি হুকুম দিন, আমরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি। খলীফা হুকুমতো দিলেনই না বরং তাঁর অনুগত গভর্নর, সেনাপতি এবং রাজকর্মচারী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শপথ করিয়ে নিলেন যে, তারা মদীনায় রক্তপাত করবে না। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করবে না। বিদ্রোহীরা আরো সাহসী হয়ে উঠল।

একদিন তাদের মধ্যে দুইজন দেয়াল টপকে খলীফার বাড়িতে প্রবেশ করল। খলীফা তখন কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। শত্রুরা সে অবস্থায় তাঁকে হত্যা করলো।

মৃত্যুর পূর্বে ওসমান (রা.) হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-আমার রক্তপাতের মধ্যেই যেন মুসলিমদের ঝগড়া বন্ধ হয়–রক্তপাত বন্ধ হয়। সবাই যেন ভেদাভেদ ভুলে আবার একতাবদ্ধ হয়।

এই কাহিনী থেকে বুঝতে পারছ, খলীফা ওসমান (রা.) কত ধৈর্যশীল, কত সহনশীল, কত উদার, কত মহৎ ছিলেন।

দুনিয়ার আর কোনো রাজা-বাদশাহ বা শাসনকর্তা যদি ঐ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, তাহলে কি করতেন, সহজেই তা তোমরা অনুধাবন করতে পারো। কিন্তু খলীফা ওসমান (রা.) নিজের জীবনের বিনিময়েও মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

অনুকরণীয় জীবন

ওসমান (রা.) সম্পর্কে এত কিছু জানার পর তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, তিনি কেমন ছিলেন? কি খেতেন? কি করতেন? কি পরতেন? আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্রে তিনি কেমন ছিলেন-তাই না? তোমরা সকলেই জান, আমাদের প্রিয় নবী লেখাপড়া জানতেন না। সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা লেখা-পড়া জানতেন, তাঁদের মধ্যে ওসমান (রা.) ছিলেন অন্যতম। আল্লাহর তরফ থেকে প্রিয় নবীর ওপর যে বাণী অবতীর্ণ হতো, ওসমান (রা.) তা লিখে রাখতেন। সেই হিসেবে তিনি কোরআনের লেখক। তিনি সুন্দর ভাষায় লিখতে পারতেন। তাঁর লেখা পড়ে সবাই মুগ্ধ হতো। প্রভাবিত হতো। তিনি খুব ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন না। কিন্তু অল্প কিছু যা বলতেন তাই শ্রোতাদের বিমোহিত করে তুলত।

তিনি কোরআনে হাফেজ ছিলেন। সব সময় তিনি কোরআনের আয়াত পাঠ করতেন। তিনি কোরআন হেফাজত করেছেন। আমাদের ঘরে যে কোরআন শরীফ আছে এটা তাঁরই অবদান। রাসূলের বাণী "কোরআন পড়া ও পড়ানো সব চাইতে উত্তম কাজ" এই কথা তিনি সব সময় বলতেন। তিনি অংকশাস্ত্র ভালো জানতেন। এ কারণে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি তা সমাধান করে দিতেন।

তিনি ছোটকাল থেকেই সৎ, খোদাভীরু, বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তোমরা সকলেই জান, ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবের ঘরে ঘরে মদের প্রচলন ছিল। ছেলে-বুড়ো সবাই মদ পান করত। অথচ শুনে আশ্চর্য হবে যে, সে কালেও তিনি মদ পান করতেন না। মদের আসর থেকে তিনি দূরে সরে থাকতেন। ছোটকাল থেকেই তিনি চরিত্রবান ছিলেন। সবাই যখন মিথ্যা, অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে ছিল, তখন তিনি এসব থেকে দূরে থেকেছেন।

তিনি খোদাভীরু ছিলেন। খোদার ভয়ে তিনি প্রায়ই কাঁদাকাটি করতেন। মৃত্যু ও পরকালের চিন্তা থেকে তিনি কখনও মুক্ত হতে পারেননি।

প্রিয় নবীকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। প্রিয় নবীর দীন-দরিদ্র অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং নানা ছুতা-নাতায় তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। একবার প্রিয় নবীর বাড়িতে চার দিন পর্যন্ত কোনো খাবার ছিল না। পরিবারের সবাই এই চার দিন কিছুই খেতে পাননি। ওসমান (রা.) এ কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। দুঃখে কেঁদেছিলেন। সাথে সাথে তিনি প্রচুর খাবার ও টাকা-পয়সা প্রিয় নবীর বাড়িতে পৌছে দিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে, প্রিয় নবীর চাল-চলন, ওঠা-বসা সবই তিনি অনুকরণ করতেন। একবার নামাজের অজু করে তিনি হাসলেন। হঠাৎ হাসলেন বলে লোকদের মনে প্রশ্ন জাগল। তাঁরা জিজ্ঞাসা করল, হাসলেন কেন? ওসমান (রা.) জবাব দিলেন : একবার প্রিয় নবীকে অজু করার পর

www.nagorikpathagar.org

এভাবে হাসতে দেখেছিলাম। আর একবার মসজিদের দরজায় বসে তিনি ছাগলের গোশত নিয়ে খেলেন এবং খাওয়ার পর অজু না করেই নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল-আপনি অমন করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন : একবার প্রিয় নবী এখানে বসে খেয়েছিলেন এবং এভাবেই নামাজ আদায় করেছিলেন। আমিও তাই করলাম।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, শান্ত ও সরল ছিলেন। তাঁর বাড়িতে বহু গোলাম-বাঁদী ছিল, কিন্তু নিজের কাজ তিনি নিজেই করতেন। কাউকেও কষ্ট দিতেন না। গভীর রাতে নামাজ পড়তে উঠলে নিজেই অজুর পানির ব্যবস্থা করতেন। চাকর-বাকর, দাস-দাসী কাউকেও কষ্ট দিতেন না। তিনি কারো সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন না। কেউ কটু ব্যবহার করলে তিনি ধীর-স্থির শান্তভাবে ভাল কথা বলে তার জবাব দিতেন। জনসাধারণ তাঁর কাছে যে কোনো ব্যাপারেই প্রশ্ন করতে পারত, জবাব চাইতে পারত। কারো প্রতি তিনি বিরক্ত হতেন না।

একবার এক লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে ওসমান (রা.)-এর উদ্দেশে বললেন, "আপনি তওবা করুন, অন্যায় থেকে বিরত হোন"। হাজার হাজার লোকের সামনে তাঁকে এভাবে বলা হয়েছিল। তিনি লজ্জা পেলেন না। কোনো রকম সংকোচ বোধ করলেন না। সরাসরি পশ্চিম দিকে ফিরে তিনি হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ, আমার তওবা কবুল করো, আমি তোমার দিকেই মুখ ফিরিয়েছি।"

তিনি খলীফা হিসেবে কোনো সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। প্রায় ১২ বছর তিনি শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। সেই হিসাবে তাঁর পাওনা ছিল ৬০ হাজার দিরহাম। জনগণের কল্যাণেই এ অর্থ তিনি গ্রহণ করেননি।

দিনের বেলায় তিনি শাসনকাজে ব্যস্ত থাকতেন আর সমস্ত রাত ধরে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। প্রায় রাতেই তিনি জেগে থেকে নামাজ পড়তেন। কোনো কোনো সময় এক রাকাত নামাজেই তিনি সমস্ত কোরআন শরীফ পড়তেন। প্রায়ই তিনি রোজা রাখতেন। প্রতি বছরই তিনি হজ করতেন। তিনি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। প্রতিদিন গোসল করতেন। ভালো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতেন। আতর ব্যবহার করতেন। কখনো ময়লা জামা কাপড় পড়তেন না। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। খুব ফর্সা ছিলেন। তিনি ছিলেন মাঝারি ধরনের। খুব বড় করে তিনি চুল রাখতেন। চুল ছিল খুব ঘন ও লম্বা। বুড়ো বয়সে তিনি চুলে মেহেদি লাগাতেন।

www.nagorikpathagar.org

পেটে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি

একটা পেটমোটা ছেলে ধীরে-ধীরে হাঁটছে। খেলার সাথীরা চিৎকার করে উঠল, 'এই পেটমোটা, এই পেটমোটা। ছেলেটা রেগে গেল না। বরং হাসলো। হেসে হেসে বলল, পেটটা মোটা কেন হয়েছে জান? ওতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি আর জ্ঞান জমা করেছি বলেই ওটা এত মোটা হয়েছে। সাথীরা হেসেই লুটোপুটি। ওরা ভাবে, বিদ্যা আবার পেটে থাকে নাকি?

কারো পেটে না থাকলেও ঐ কিশোর বালকের যে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ততদিনে বালক বড় হয়েছেন। দু'জন লোক তার কাছে বিচারের জন্য এলো। তিনি বললেন, 'বলো- তোমাদের কি ব্যাপার'। একজন বলল, দুই পথিক এক জায়গায় খেতে বসেছিলাম। আমার কাছে ছিল তিনটি রুটি আর তাঁর কাছে ছিল পাঁচটি রুটি। খেতে বসতেই একজন মুসাফির এসে বললেন, তিনি ক্ষুধার্ত, তাঁর কাছে কোনো খাবার নেই। আমরা তাঁকে আমাদের সাথে খেতে বললাম। তিনিও বসলেন। আমরা তিন জনই রুটিগুলি সমান ভাগে ভাগ করে খেলাম। বিদায়ের সময় মুসাফির আট আনা পয়সা খুশি হয়ে দিয়ে গেলেন। এখন পয়সার ভাগা-ভাগি নিয়ে আমরা একমত হতে পারছি না। আমার দাবি হলো, আমরা যেহেতু দু'জন সুতরাং তিনি পাবেন অর্ধেক আর আমি পাব অর্ধেক। তিনি তা মানতে রাজি নন। তাঁর কথা, যেহেতু পাঁচটা রুটি ছিল, সেহেতু তিনি পাবেন পাঁচ আনা আর আমার রুটি ছিল তিনটা, সুতরাং আমি পাব তিন আনা। আমি এটা মানতে রাজি নই। এবার আপনি এর ফয়সালা করে দিন।

বিচারক বললেন, তিনজনেই সমান ভাগ খেয়েছ তো? উভয়ে বলল, হ্যাঁ আমরা সমান সমানই খেয়েছি। বিচারক রায় দিলেন, তাহলে যার পাঁচটা রুটি ছিল সে পাবে সাত আনা আর যার তিনটা রুটি ছিল সে পাবে এক আনা। বড় প্যাঁচের রায় তাই না। মাথায় ঢুকছে না কেমন। শোন তাহলে।

তারা ছিল তিনজন, খেয়েছেও সমান সমান। তিনজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করার জন্য একটা রুটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এতে আটটা রুটিতে মোট চব্বিশ ভাগ হয়। এক একজনের ভাগে পড়ে আট টুকরা রুটি। যার তিনটা রুটি ছিল, তার রুটিতে নয় টুকরা হয়েছে। নয় টুকরার আট টুকরা তো সে নিজেই খেয়েছে। মুসাফির তার অংশ থেকে এক টুকরা খেয়েছে, সুতরাং সে পাবে এক আনা। অপর দিকে, অন্যজনের পাঁচটি রুটিতে হয়েছে পনর টুকরা। তার মধ্যে সে খেয়েছে আট টুকরা আর বাকি সাত টুকরা খেয়েছে মুসাফির, সুতরাং সে পাবে সাত আনা। এবার বুঝলে তো। কি সূক্ষ্ম বিচার তাই না?

একবার এই বিচারককে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব কতখানি? ঝটপট তিনি জবাব দিলেন : সূর্যের এক দিনের সফর।' দেখলে তো কেমন উপস্থিত বুদ্ধি।

এই বিচারকই আবার খুব বড় যোদ্ধা, খুব বড় বীর ছিলেন। জীবনের প্রথম যুদ্ধ। অথচ কী তাঁর তেজ, কী তাঁর বীরত্ব। তাঁর সাথী মাত্র তিনশ' তের জন। অথচ বিপক্ষে সৈন্য হাজারেরও বেশি। কুচপরওয়া নেই।

www.nagorikpathagar.org

যে দুশমনের সামনে যাচ্ছেন, তাকেই শেষ করছেন। তাঁর লক্ষ্য বড় বড় সরদার, বড় বড় সেনাপতি, বড় বড় যোদ্ধা। যাদের খুব নাম-ডাক অথচ যুবক যোদ্ধা কারো ভয়ে ভীত নয়। তলোয়ার উঁচু করে শুধু সামনেই এগোচ্ছেন। দুশমনরা শুধু তার সামনে লুটে পড়ছে।

ঐ দেশে আরেক যুদ্ধ। এক পক্ষে তিন হাজার সৈন্য। অপর পক্ষে মাত্র সাতশ'। আমাদের যুবক যোদ্ধা সাতশ'র একজন। তিনি অন্যতম সেনানায়ক। শুরু হল মল্লযুদ্ধ। মুহূর্তেই ধরাশায়ী হলো অপর পক্ষের সেরা বীর। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। জীবন-মরণ যুদ্ধ। আবার সেই দৃশ্য। যুবকের -তিরবারি আগের মতোই ঘুরছে। দুশমনরা তাঁর সামনে আসতেই পারছে না। একাই একশ'। হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। কেউ মরছে। কেউ পালাচ্ছে।

আরেক যুদ্ধ। দুশমনের পক্ষে দশ হাজার সৈন্য। আর আমাদের বীরের পক্ষে মাত্র তিন হাজার। দুশমনের সরদার এসে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালো। জানালো একবার, দুইবার, তিনবার। কারো সাড়া নেই। সে বলতে লাগল, ডাকতে ডাকতে আমার গলা ভেঙে গেল। তোমাদের দলে এমন কেউ কি নেই যে, আমার ডাকে সাড়া দিতে পারে? সে কবিতা আওড়ালো :

আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি যোদ্ধা রূপে

আমি দেখছি এই সাহসীরা কত ভীরু

হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এলেন বীর। তিনিও কবিতা আওড়ালেন :

ব্যস্ত হয়ো না। কম সাহসী লোক

আসেনি তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে।

দুশমন : কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?

বীর সবিনয়ে তাঁর পরিচয় জানালো।

দুশমন : 'তুমি তো আমার ভাতিজা! তোমার কোনো চাচাকে পাঠাও। আমি তোমার রক্তপাত করতে চাই না।'

বীর : আমি চাই।

দুশমন : কী ! এত বড় সাহস। তবে রে...? বলে দুশমন বীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুশমন ঘোড়ার পিঠে। বীর মাটিতে।

বীর : বীরের মতো মাটিতে নেমে আসুন। সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি।

দুশমন নেমে এলো। মুহূর্তেই বীরের মাথায় আঘাত করল। ঢাল কেটে গিয়ে মাথায় লাগল বীরের। বীরও আঘাত হানল। এক আঘাতেই সে লুটিয়ে পড়ল। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সহযোদ্ধারা বলল, 'দুশমন বীরের যুদ্ধের পোশাকটা খুলে আননি?

বীর : না।

সহযোদ্ধারা : কেন? ওটা যে এ যুগের সেরা যুদ্ধ পোশাক।

বীর : তিনি তখন উলঙ্গ ছিলেন। আমি লজ্জায় সে দিকে তাকাতে পারিনি।

www.nagorikpathagar.org

আরেক ঘটনা। মল্লযুদ্ধ হয়েছে। বীর দুশমনকে কাবু করে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসেছেন। এখনই তাকে হত্যা করবেন। তলোয়ার গলায় বসিয়েছেন। দুশমন দেখল প্রাণের আর আশা নেই। সে বীরের মুখে থু থু ছুড়ে মারল। বীর ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তারপর তলোয়ার না চালিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুশমন ছাড়া পেলো। কিন্তু সে তো অবাক। এ আবার কী হলো। মাথা-মুন্ডু কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সাহস করে জিজ্ঞেস করল : আমায় হত্যা করলেন না কেন?

বীর : ন্যায়ের জন্য এবং অন্যায়কে খতম করার জন্য তোমার গলায় তলোয়ার বসিয়েছিলাম। তুমি থু থু দিলে। মাথায় খুন চড়ে গেল। মুহূর্তে তুমি আমার ব্যক্তিগত দুশমন হয়ে গেলে। সে অবস্থায় হত্যা করলে প্রতিশোধ নেয়া হতো। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না।

এই বীর, এই বিচারক, এই বুদ্ধিমান জ্ঞানীকে দেশের সবাই মিলে শাসনকর্তা বানালো। তিনি হতে চাইলেন না। জোর করে বানালো। দশের কথা ফেলেন কি করে?

তিনি শাসনকর্তা হয়ে বিচার বিভাগ আলাদা করলেন। বিচার-আচারের জন্য কাজী নিয়োগ করলেন। একবার তাঁর যুদ্ধের পোশাক পাওয়া গেল না। খুব খুঁজলেন, কোথাও পেলেন না। কিছু দিন পর দেখলেন পোশাকটি এক ইহুদির গায়ে। তিনি কাজীর কাছে বিচার দিলেন। কাজী সাহেব উভয়কে ডেকে পাঠালেন। তারা আদালতে হাজির হলেন। কাজী সাহেব শাসনকর্তাকে একটা চেয়ার দিতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমি এখানে বাদী হিসেবে এসেছি, শাসনকর্তা হিসেবে নয়। আপনি ভুল করছেন।

শাসনকর্তার অভিযোগ শুনে কাজী সাহেব ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিছু বলার আছে কি ?

ইহুদি : হুজুর, এটা আমার এবং এটা এখনও আমার গায়েই আছে।

কাজী শাসনকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ পোশাক যে আপনার তার কোনো প্রমাণ আছে?

শাসনকর্তা : হ্যাঁ আছে। আমার ছেলে এবং চাকরই সাক্ষী দেবে যে ওটা আমারই।

কাজী : আমি দুঃখিত। ওদের দাবি গ্রহণ করা যাবে না। কেননা ওরা আপনার নিজের লোক।

এর পরে কাজী ইহুদির পক্ষেই মামলার রায় দিলেন।

শাসনকর্তা কাজীর ওপর খুব সন্তুষ্ট হলেন।

কে এই জ্ঞানী-গুণী, কে এই বিচারক, কে এই অমিততেজ বীর, কে এই শাসনকর্তা? তোমরা সকলেই তাঁকে চেনো—জান। শক্তি পরীক্ষার সময় এখনো যার নাম সবাই নেয়। ইয়া আলী, ইয়া আলী, বলে চিৎকার দেয়।

ইনি সেই মহান বীর। ইনি সেই শেরে খোদা। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)। কত গুণে যে তিনি গুণান্বিত ছিলেন তার কোনো লেখাজোখা নেই। আলী মানে সুন্দর ও সুউচ্চ। সত্যিই তিনি সবদিক থেকে সুন্দর ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আসল নামাজ নকল নামাজ

আমরা আল্লাহকে ভয় করি। আমরা জানি আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। সব কিছু শুনছেন। আমরা আরও জানি আল্লাহর ক্ষমতা সব জায়গায় বিরাজমান। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহর কাছেই আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে। পরকালের দুনিয়ায়। ভালো-মন্দ আচরণের জন্য আমাদের বিচার হবে। এসব কারণেই আমরা আল্লাহকে ভয় করি। আর ভয় করি বলেই আমরা ভালো কাজ করি। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি।

খুব ছোটকালেই আমরা আল্লাহর কথা শুনেছি তাই না? শুনেছি, ভালো কাজ করলে তিনি খুশি হন। খারাপ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আরও শুনেছি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে দুনিয়াতেও আমাদের ওপর বিপদ-আপদ নেমে আসে। আবার পরকালের জীবনেও আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য খুব ছোটকাল থেকেই মনে মনে আমরা আল্লাহকে ভয় করি। ভালো-মন্দ যাই করি, আল্লাহর কথা আমরা কখনও ভুলি না। ভালো কাজ করলে আমরা খুশি হই। কেননা আমরা জানি আল্লাহতায়ালাও খুশি হন। খারাপ কাজ করলে আমাদের মন খারাপ হয়। কেননা আমরা জানি, দুনিয়া এবং আখেরাতে এর ফলাফল আমাদের ভোগ করতে হবে। অসুখ-বিসুখ হলে, কোনো প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে, পরীক্ষায় খারাপ করলে আমরা অনেক সময় ভাবি, আল্লাহ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমরা যখন সুস্থ-সবল জীবনযাপন করি, একের পর এক প্রতিযোগিতায় জয়ী হই, পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হই, তখন আমরা অনেক সময় মনে করি আল্লাহ আমাদের ওপর খুশি হয়েছেন।

সত্য কথা বলা, সদ্ব্যবহার করা, গুরুজনকে ভক্তি করা, পিতা-মাতাকে মানা, পরোপকার করা, ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া, নিয়মানুবর্তী হওয়া, সৎ-চিন্তা করা, দয়িত্ববান হওয়া, জ্ঞানী-গুণী হওয়া, ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া, এসব কাজ যে ভালো কাজ, কে আমাদের শিখিয়েছেন? আবার মিথ্যা কথা বলা, গুরুজনকে অসম্মান করা, মাতা-পিতাকে না মানা, লেখাপড়া না করা, চুরি করা, ধোঁকা দেয়া, অপকার করা, এসব যে মন্দ বা খারাপ কাজ, এসবও আমাদের কে শিখিয়েছেন? সবই আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন। যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে, কোরআন কিতাব নাজিল করে আল্লাহ আমাদের সরাসরি শিখিয়েছেন কোন্ কাজটি ভালো এবং কোন্ কাজটি মন্দ। মানুষকে তিনি যেমন ভালো কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি মন্দ কাজ করারও স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে বলে দিয়েছেন—যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে, তারা দুনিয়াতে সুখ-শান্তি লাভ করবে। পরকালের জীবনে অনন্ত সুখ ভোগ করবে। আর যারা মন্দ কাজ করবে তারা যেমনি দুনিয়াতে লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে তেমনি পরকালের জীবনে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাবে। অর্থাৎ যারা ভালো কাজ করবে, তারা সব দিক দিয়ে জয়ী হবে। আর যারা মন্দ কাজ করবে তারা ব্যর্থ এবং পরাজিত। ছোটকাল থেকেই এসব কিছু আমরা শুনে এসেছি। তাই আমরা বুঝতে পারি যে, কে

www.nagorikpathagar.org

কত আল্লাহকে ভয় করে। কেমন করে বুঝি বলতো? যারা বেশি বেশি ভালো কাজ করে, আমরা বুঝি এরা আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে। আর যারা মন্দ কাজ করে বেড়ায় আমরা বুঝি তারা আদৌ ভয় করে না। আল্লাহকে ভুলে গেলে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ আছেন জানলে মানুষ অতো স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

একটা উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। মনিব একজন চাকর রেখেছেন। তিনি চাকরকে ডেকে বললেন, এগুলো তোমার কাজ। এগুলো যত ভালোভাবে করবে তত আমি খুশি হবো, তোমার প্রতি তত আমি সদয় হবো। তোমাকে পুরস্কৃত করব। বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেবো। আর এ কাজগুলো করো না, এগুলো করলে আমি অসন্তুষ্ট হবো, শাস্তি দেবো। এমনকি তোমার চাকরিও থাকবে না। বল তো, সাধারণ একজন চাকর, যার বিদ্যা-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই, সেও কিন্তু মনিবের কথামতো কাজ করে মনিবকে খুশি করবে এবং ধীরে ধীরে বেতন-ভাতা বাড়িয়ে নিবে। আর বোকা হলে মনিবের শাস্তির কথা উপেক্ষা করে যে কাজগুলো করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই করবে। পরিণামে শাস্তি ভোগ করবে। চাকরি হারাবে। মনিবের উপস্থিতি জেনে শুনেও খুব কম চাকরই এমন অপরিণামদর্শী কাজ করবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনিবের ভয়ে কেউই মনিবের অবাধ্য হয় না।

আল্লাহ আমাদের মনিব, আমরা আল্লাহর বান্দা-দাসানুদাস। আল্লাহকে সর্ব অবস্থায় সবখানে উপস্থিত জেনে আমরা মন্দ কাজ করতে পারি না। আমরা যারা মন্দ কাজ করি, বুঝতে হবে মুখে আল্লাহর কথা স্বীকার করলেও বাস্তবে আল্লাহর কথা সবসময় মনে থাকে না। অর্থাৎ ঐ বোকা চাকরের মতো সবসময় মনিবের উপস্থিতি মনে রাখি না।

অথচ আমরা সবাই সবসময় বলি, আমরা আল্লাহকে ভয় করি। পরকাল, দোজখ, বেহেস্ত বিশ্বাস করি। কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা যায় নামাজ, কলেমা, ইবাদত-বন্দেগী করেও অনেকে আমরা মিথ্যা কথা বলি, মানুষের ক্ষতি করি, অপরের ধন-সম্পদ হরণ করি, হিংসা করি। আমাদের মনে যদি আল্লাহর ভয় থাকত, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করতাম, আল্লাহকে সব সময় বিরাজমান মনে করতাম, আল্লাহর দেয়া শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমরা মন্দ কাজে এত উৎসাহ পেতাম না। আল্লাহর ভয়েই আমরা মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতাম। আল্লাহ ভীতির কারণেই আমরা ইবাদত-বন্দেগী করি, নামাজ-কালেমা পড়ি, কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীতে যতটুকু একাগ্র হওয়া দরকার ততটুকু আমরা হই না। হতে পারি না। আমরা ইবাদত করি কার উদ্দেশে, কাকে স্মরণে রেখে এবং কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য? নিশ্চয়ই আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর হুকুমে এবং আল্লাহকে উপস্থিত জেনে। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমরা ইবাদত বন্দেগী করি।

অথচ নামাজে দাঁড়িয়ে আমাদের কত শত কথা মনে পড়ে। আমরা নামাযও পড়ি, সাথে সাথে দুনিয়ার অন্য চিন্তা-ভাবনাও করি। সব কথাই নামাজের মধ্যে আমাদের মনে পড়ে। তোতা পাখির মতো কিছু শেখানো কথা আমরা পড়ি এবং ওঠাবসা করি কিন্তু আমাদের মনেই থাকে না, আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁরই উদ্দেশে, তাঁরই হুকুম মতো নামাজ আদায় করছি। আমাদের দেহটা জায়নামাজে থাকে। কিন্তু মনটা পড়ে থাকে দুনিয়ার নানা কাজে। নানা ঘটনায়। দুনিয়ার কোনো মনিবের সামনে কোনো চাকর কি এমন অমনোযোগী হতে পারে? এমন অমনোযোগী হলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

তাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনোযোগী হতে হয়। মনোযোগী না হলে চাকরি থাকে না। এখানেও তো আমরা দিন ও দুনিয়ার মালিক ও মনিবের সামনে দাঁড়াই, কিন্তু মনিবের কথা কোনোভাবে মনে থাকে না বরং দুনিয়ার মানুষ মনিবের চেয়ে দ্বীন ও দুনিয়ার মালিক—মনিবের কথা বেশি স্মরণে থাকা দরকার। তাঁর সামনে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার। তাঁর সামনে আরও বিনয়ী, আরও জড়োসড়ো এবং ভয়ে থর থর হওয়া দরকার। কেননা তার শাস্তি এবং পুরস্কার দুটোই দুনিয়ার মনিবের চেয়ে অনেক বড়।

ইবাদতে কত মনোযোগী, কত একাগ্র হতে হয় এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি করে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে থাকা যায়-আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নামাজে কত একাত্ম হওয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়া যায়, আলী (রা.)-এর নীচের ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

একবার এক যুদ্ধে তাঁর এক হাতে তীর এসে বিদ্ধ হয়েছিল। কোনোভাবেই তীরটি খোলা যাচ্ছিল না। বহু চেষ্টা করেও যখন কিছু হলো না, তখন নবীজী অন্যদের পরামর্শ দিলেন, আলী যখন নামাজে দাঁড়াবে তখনই এ তীরটি তার হাত থেকে খুলে নিতে হবে। কারণ তিনি যখন নামাজ পড়বেন তখন কোনো দিকেই তার মন থাকবে না। সেই সুযোগে তীরটি টেনে বের করলে তিনি আদৌ টের পাবেন না। নামাজের সময় ছাড়া এই তীর টেনে খুলতে গেলে তিনি খুব বেশি কষ্ট পাবেন।

আলী (রা.) নামাজে দাঁড়ালেন, তন্ময় হয়ে গেলেন। নিজেকে আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিলেন। এই সুযোগে একজন এগিয়ে গিয়ে হাতে বিদ্ধ তীর টান দিলেন। তীরটি উঠে এলো। দর দর করে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। আলী (রা.)-এর সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেল। তিনি একটু আহ্ -উহ্ও করলেন না! যে একাগ্রচিত্তে তিনি নামাজ পড়ছিলেন সেভাবেই পড়তে থাকলেন।

আল্লাহকে আমরাও ভয় করি। আলী (রা.)ও ভয় করতেন। আমাদের ভয় আলী (রা.)-এর ভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ! তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আল্লাহকে ভয় করলে আলী (রা.)-এর মতোই ভয় করতে হবে। তা হলেই মহান আল্লাহতাআলা আমাদের ওপর খুশি হবেন। দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

এসো, আমরা শয়নে-স্বপনে, কাজে-কর্মে, ওঠা-বসা, খেলা-ধুলা সব সময়ই আল্লাহকে স্মরণ করি এবং আল্লাহর ভয় জাগরূক রেখে মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখি।

www.nagorikpathagar.org

মাটির মতো সাদামাটা

তোমরা তো রাজা-বাদশাহ দেখনি–শুনেছ মাত্র। দুনিয়ায় এখন রাজা-বাদশাহ খুব বেশি একটা নেই। রাজা-বাদশাহদের স্থান দখল করেছেন শাসনকর্তারা। এসব শাসনকর্তার বিলাস বহুল জীবন সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই কিছু খোঁজ-খবর রাখো। যারা রাজধানী শহর বা মফস্বল শহরে বাস করে তারা তো নিশ্চয়ই জান, ছোট থেকে বড় সব দেশের শাসনকর্তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কত সুযোগ-সবিধা পান। তারা অনেক বেতন-ভাতা পান। গাড়ি-বাড়ি এবং পরিবারের খরচসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পান। তাদের কোনো দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না। আমাদের যে গরিব দেশ তবু এখানে একজন থানার শাসনকর্তাও গাড়ি পান, বাড়ি পান, চাকর-বাকর, বেয়ারা-চাপরাশিসহ খুব শান-শওকতে দিন কাটান। মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রেসিডেন্ট তাদের কথা তো আলাদা। জনগণের অবস্থা যাই থাক, জনগণ যদি ভুখা-নাঙ্গা হয়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়, তবুও এসব শাসনকর্তার আরাম-আয়েশ, বেতন ও ভাতার কোনো হেরফের কখনও হয় না।

অথচ তোমরা তো জানো, আলী (রা.) কত বড় শাসনকর্তা ছিলেন। কত বড় সেনাপতি ছিলেন। কত বড় খলীফা ছিলেন। তাঁর রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল অনেক বড়। বলতে গেলে দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক। তিনটি মহাদেশে তাঁর রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল। অথচ তিনি মোটা কাপড় পরতেন। তাঁর বাড়ির দরজায় কোনো দারোয়ান ছিল না। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রা.)। তিনি নিজ হাতে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেত। আলী (রা.)-এর কুয়ার পানি তুলতে তুলতে বুক ব্যথা হয়ে যেত। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই দাস-দাসীর সংস্থান করতে পারেননি।

একবার আব্দুল্লাহ নামে এক লোক আলী (রা.)-এর সাথে খেতে বসলেন। খাবারের জিনিস দেখে আবদুল্লাহ তো অবাক। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, দেশের সাধারণ মানুষও তো এর চেয়ে ভালো খাবার খায়। এত মামুলী ধরনের সাদামাটা খাবার পরিবেশন করতে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে পড়লেন। মনের কথা আর ঢেকে রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন-

আব্দুল্লাহ : আমীরুল মোমেনীন, আপনি পাখির গোশত ভালোবাসেন না?

আলী (রা.): আবদুল্লাহ, খলীফা মুসলমানদের সম্পদ থেকে মাত্র দুপেয়ালা আহার পায়, তার একটি পরিবারসহ নিজের জন্য আর অন্যটি আল্লাহর অন্য সৃষ্টির জন্য।

আবদুল্লাহর মুখ থেকে আর কথা বের হলো না।

একবার মসজিদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেনকে আমার তলোয়ারটি কিনবে? লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কেন আপনি তলোয়ারটি বিক্রি করছেন?

www.nagorikpathagar.org

আলী (রা.) : আল্লাহর কসম। আমার লুঙ্গি নেই। লুঙ্গি কেনার পয়সা থাকলে এটি আমি বিক্রি করতাম না। লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন উঠে বললো, আমীরুল মোমেনীন একটা লুঙ্গি কেনার পয়সা আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি। আপনি তলোয়ারটি বিক্রি করবেন না।

তিনি ইরাক দেশে গমন করলেন। ইরাকবাসীরা শাসনকর্তার ভবনে খলীফার সম্মানে মেহমানদারির বিরাট আয়োজন করলেন। কিন্তু আলী (রা.) শাসনকর্তার ভবনে প্রবেশ করলেন না। তিনি বললেন : ওমর (রা.) সবসময় জাঁকজমকপূর্ণ এসব দালান কোঠার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন। আমারও দালান কোঠার প্রয়োজন নেই। খোলা মাঠই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি মসজিদে নামাজ পড়লেন এবং খোলা মাঠেই অবস্থান করলেন।

একবার তাঁকে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: নবীজী কি খেতেন সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণাই নেই।

খলীফা হওয়ার আগেও তিনি খুব দীন-দরিদ্রভাবে জীবনযাপন করতেন। একবার কয়েকদিন ঘরে তাঁর কোনো খাবার ছিল না। মদীনার রাস্তায় তিনি কাজের খোঁজে বের হলেন। অনেক ঘুরে ফিরে দেখলেন, একজন মহিলা কিছু মাটির ঢিল জড়ো করে রেখেছে। তিনি মনে করলেন, হয়তো মহিলা ঢিলগুলো ভিজাতে চায়। তিনি মহিলার কাছে গেলেন এবং পানি উঠাতে চাইলেন। পানি উঠিয়ে কিছু পারিশ্রমিক পাবেন এই ছিল তার আশা। মহিলা রাজি হলেন। ঠিক হলো, পারিশ্রমিক হিসেবে এক বালতি পানির বিনিময়ে একটি খেজুর পাবে। তিনি ষোল বালতি পানি উঠালেন। তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গেল। পানি উঠানোর পর ষোলটি খেজুর পেলেন। তাই নিয়ে নবীজীর (সা.) কাছে হাজির হলেন। নবীজী শুনে খুব খুশি হলেন। খেজুরগুলো দু'জনে মিলে খেলেন।

খলীফা হওয়ার আগে তাঁর ঘরে তেমন কিছুই ছিল না। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে একটি চাদর, খেজুরের পাতা ভর্তি চামড়ার একটি গদি, একটি যাঁতা, একটি মশক ও দু'টি কলস তিনি পেয়েছিলেন। চাদরটি এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা বাইরে থাকত, আর পা ঢাকলে মাথা বাইরে থাকত। বিয়ের খরচ মেটানোর জন্য তিনি জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে শহরে নিয়ে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারেননি। কেননা যে উটের পিঠে করে তিনি ঘাস বহন করার পরিকল্পনা করেছিলেন সেই উটটি লোকেরা জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। ফলে নবীজীর দেয়া যুদ্ধের পোশাকটি বিক্রি করে তিনি বিয়ের জিনিসপত্র কিনেছেন। অনেক সময় তিনি না খেয়ে দিন কাটাতেন। ক্ষুধায় কাহিল হয়ে পড়লে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। অথচ এই অবস্থার মধ্যেও তার দরজায় হাত পেতে কেউ ফিরে যায়নি। যে-ই তাঁর কাছে এসেছেন তাকেই তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। কোনো কোনো সময় নিজের খাবার তিনি না খেয়ে সবটাই বিলিয়ে দিয়েছেন।

একবারের ঘটনা :

সারারাত জেগে মানুষের জমিতে পানি দিয়ে তিনি কিছু যব পেলেন। সকালে বাড়ি ফিরে এসে কিছু যব পরের বেলার জন্য রেখে দিয়ে কিছু হালুয়া পাক করলেন। হালুয়া তৈরির পর এক ভিখারী এসে হাজির হলো। তিনি সমস্ত হালুয়াই ভিখারীকে দিয়ে দিলেন। এরপর কিছু যব দিয়ে আবার হালুয়া তৈরি

www.nagorikpathagar.org

করলেন। আবার একজন ভিখারী এসে হাজির হলো। তিনি রান্না করা হালুয়াটা তার হাতে তুলে দিলেন। এরপর অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, তা দিয়ে নিজের জন্য খাবার তৈরি করলেন। আবারও ভিখারী এসে হাজির হলো। এবারও তিনি আগের মতো সব খাবারই ভিখারীকে দিয়ে দিলেন। এভাবে সারারাত জেগে অমানুষিক পরিশ্রম করে যা পেলেন তার সবটাই তিনি বিলিয়ে দিলেন। ঘরে আর খাবার না থাকাতে সারাদিন তিনি না খেয়ে থাকলেন।

শীতের দিনে তিনি গরম কাপড় পরতেন না। এতে নাকি তাঁর কোনো কষ্ট হতো না। আবার গরমের দিনে শীতের কাপড় পরতেন। ফুলহাতা জামাও তিনি খুব বেশি পরতে পারেননি।

ভীষণ শীতের সময় একবার এক ব্যক্তি আলী (রা.)-এর কাছে এলেন। দেখলেন, তিনি সামান্য একটি চাদর গায়ে দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন :

-আমীরুল মোমেনীন, সরকারের ধন-সম্পত্তিতে আপনার অংশ রয়েছে। সেখান থেকে অর্থ নিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো খরচ করতে পারেন। আপনি শীতে কষ্ট পাচ্ছেন কেন?

আলী : আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ধন-সম্পদ থেকে কিছুই নিতে চাই না। মদীনা থেকে আসার সময় এই চাদরখানা নিয়ে এসেছিলাম।

একদিন এক সাহাবী আলী (রা.)-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন তাঁর নিজের জুতো সেলাই করছিলেন। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন-আপনার জুতার দাম কত?

আলী : আমার এই জুতো আমার কাছে খুবই প্রিয়। এমনকি তোমাদের পৃথিবীর চেয়েও অতি প্রিয়। আমাদের নবীজী নিজে জুতো সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন।

একবার এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল : আপনি তালি দেয়া জামা পরেন কেন? আলী বললেন, তালি দেয়া জামা পরলে নিজেকে ছোট মনে হয়। মন নরম হয়, অহঙ্কার দূর হয়।

তিনি যখন রাস্তায় হাঁটতেন, লোকদের পথ দেখিয়ে দিতেন। যারা বোঝা বহন করত তাদের বোঝা উঠিয়ে দিতেন, নামিয়ে দিতেন। নিজের কাজ তিনি নিজেই করতেন। একবার বাজারে গিয়ে বেশ কিছু খেজুর কিনলেন। একটি বড় কাপড়ের ওপর খেজুরগুলো রাখলেন এবং পুটলী বাঁধলেন। পুটলীটা কাঁধে করে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। একজন লোক এগিয়ে এসে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, বোঝাটা আমাকে দিন। আমি আপনার বাড়িতে পৌছে দেবো। আলী বললেন : না, তা হয় না। আমার বোঝা আমিই বহন করব।

তোমরাই বলো না, কোন রাজা-বাদশাহ-শাসনকর্তা তো দূরের কথা, গ্রামের সাধারণ মাতব্বরও কি বাজারের ব্যাগ নিজে বহন করে? করে না। বোঝা নেয়ার জন্য কেউ এগিয়ে এলে তারা বরং খুশি হয় এবং নিজের বোঝাটা আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

একবার আলী (রা.) ঘরে গিয়ে খাবার চাইলেন। বিবি ফাতেমা বললেন, ঘরে কিছুই যে নেই। আমি আপনাকে কি দেবো? এই অবস্থায়ই তিনি কাজের সন্ধানে বের হলেন। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে তিনি কাজ পেলেন না। হতাশ মনে ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ দেখেন একদল ব্যবসায়ী বিশ্রাম নেয়ার জন্য উটের পিঠের ওপর থেকে জিনিসপত্র নামানোর চেষ্টা করছে। তিনি তাদের কাছে কাজ চাইলেন। তারা

www.nagorikpathagar.org

রাজি হলো। তিনি বোঝা নামাতে লাগলেন। অনেক রাত পর্যন্ত বোঝা নামালেন। তারা কিছু টাকা পয়সা দিলো। কিন্তু হায়! তখন যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। তাঁর যে খাবার না নিয়ে গেলেই নয়। ঘরে যে কিছুই নেই। মনে মনে ভাবলেন, টাকা পেয়েতো লাভ হলো না। অনেক ঘুরে-ফিরেও কোনো দোকান খোলা পেলেন না। অবশেষে একান্ত বাধ্য হয়ে এক দোকানদারকে জাগালেন। তাঁকে বিরক্ত করার জন্য প্রথমে মাফ চাইলেন, তারপর অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে কিছু গম চাইলেন। দোকানদারের কাছ থেকে গম নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন বিবি ফাতেমা তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। ঐ রাতেই তিনি গম ভেঙে আটা বানালেন। আবার আটা দিয়ে রুটি বানালেন। গভীর রাতে মনের আনন্দে রুটি খেয়ে তাঁরা ঘুমালেন।

মেহমান দেখে তিনি খুব খুশি হতেন। ঘরে যা কিছু থাকত তাই এনে মেহমানের সামনে হাজির করতেন। অনেক সময় মেহমানদারি করার পর পরিবার-পরিজনসহ তাঁরা না খেয়ে থাকতেন। মেহমান না দেখলে তিনি চিন্তিত হতেন। একবার লোকেরা দেখল, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি অমনভাবে কাঁদছেন কেন?

আলী (রা.) বললেন : আজ সাতদিন ধরে আমার বাড়িতে একজন মেহমানও আসেনি। মেহমান না আসার কারণ বুঝতে পারছি না। তবে কি আল্লাহ আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন! এই ভয়ে আমি কাঁদছি।

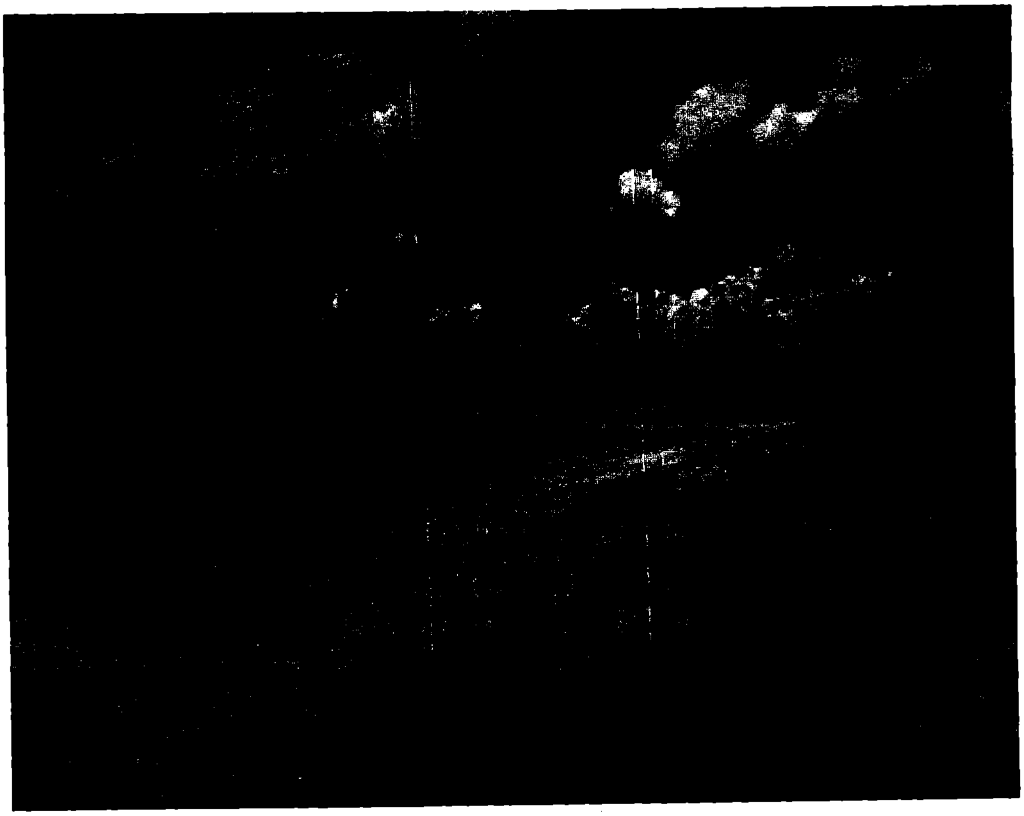

www.nagorikpathagar.org

কথামালার জাদুকর

আলী (রা.) ছিলেন তাঁর জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। বক্তৃতায় বা আলোচনায় তিনি কখনও আবোল-তাবোল কথা বলতেন না। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল জ্ঞানগর্ভ। ধীরস্থির ও শান্ত মেজাজে তিনি কথা বলতেন। বক্তৃতা করতেন। তাঁর ভাষণ শুনে লোকেরা যারপরনাই বিমুগ্ধ হতো। মানুষের মন গলে যেত। মানুষের মনের সকল সংশয়, সন্দেহ, অজ্ঞানতা দূর হয়ে যেত। অত্যন্ত দরদ দিয়ে তিনি কথা বলতেন। তাঁর প্রতিটি কথায় আন্তরিকতা উপচে পড়ত। বলার জন্য তিনি বলতেন না, বক্তৃতার খাতিরে বক্তৃতা করতেন না। দেশ, জাতি ও ধর্মের প্রয়োজনে যখন তিনি মনে করেছেন কিছু বলা দরকার, তখনই তিনি চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। যখন যা বলেছেন লোকেরা মন দিয়ে তা শুনেছে। তাঁর কথা শুনে বহু লোক হেদায়েত লাভ করেছে। এখানে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা তোমাদের জানার জন্য পেশ করছি :

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন : সমস্ত প্রশংসা আর গৌরব আল্লাহর! যাঁর গুণাবলি কোনো যুগের কোনো বক্তাই বলে শেষ করতে পারবে না। যাঁর করুণা আর মেহেরবানির হিসাব কেউ করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও কেউ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করতে পারবে না। তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। যুক্তি ও বিবেচনা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিদ্যা দিয়ে আল্লাহর গুণের পরিধি মাপা যায় না। তাঁর গুণাবলিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। সীমিত ও সংক্ষেপ করে বলাও যায় না। এমন কোনো ভাষা নেই, যা দিয়ে তাঁর গুণাবলি পরিপূর্ণভাব ব্যক্ত করা যায়। তিনি চিরন্তন। চির বিদ্যমান। তাই তাঁর শুরু এবং শেষ কোনোটাই কল্পনা করা যায় না। এই বিশ্বের সৃষ্টি, সারা বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে, তরল মাটির ধীরে ধীরে পাহাড় পর্বতের পরিণত হওয়া– যা এই বিশ্বের জন্য খুঁটি হিসেবে কাজ করছে– এই সবই আল্লাহর অসীম ক্ষমতারই নিদর্শন। মানুষের প্রথম কাজ হলো, আল্লাহকে বোঝা, শোনা এবং তাঁকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া। আল্লাহকে স্বীকার এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করাই ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সত্যিকার ঈমান হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই, তা আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়া। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের সত্যিকার রূপ হচ্ছে সবকিছুর ঊর্ধে, তাঁর সাথে যেমন কোন কিছুর যোগ করা যায় না তেমনি বিয়োগ করা যায় না। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়।

আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করাও ঠিক নয়। যারা তাঁর সত্তা থেকে তাঁর গুণাবলিকে পৃথক মনে করে, তারা ভুল পথে আছে। তারা আসলে আল্লাহর একত্বেই বিশ্বাস করে না। আল্লাহ কোনো এক বিশেষ স্থানে অবস্থান করছেন, কোনো কাল বা সময়ে তিনি ছিলেন না অথবা কোনো ঘটনা তার অগোচরে ঘটে গেছে এসব মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি সর্বকালের, সর্বস্থানের, সব কিছুতেই এবং সব ঘটনার সঙ্গেই জড়িত আছেন। তিনি সব সময়ই কাজ

www.nagorikpathagar.org

করছেন। কোনো সময়ই তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন না। তিনি সব সময়ই দেখেন, সব সময় শোনেন। যখন দেখা ও শোনার কিছুই ছিল না তখনও তিনি দেখতেন, তখনও তিনি শুনতেন। এই মহাবিশ্ব একই সময়ে, একই সঙ্গে তিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মতো আগাম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে তিনি সৃষ্টি করেননি। এত বড় সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। কী নিপুণ সুন্দরভাবে তিনি সবকিছু মুহূর্তেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মতো ধীরে ধীরে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে তিনি সৃষ্টির কাজে হাত দেননি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো তুলনা হয় না।

পরকালের জীবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন : মৃত্যুর পর কি ঘটবে, আহা তা যদি তুমি জানতে, তাহলে তুমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতে আর কাঁদতে। সহজেই আল্লাহর হুকুম মেনে নিতে। মৃত বৃক্তি যা দেখছে, তা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। অচিরেই তা তুমি দেখতে পাবে। জীবনের শেষ পরিণতি কি, ইসলাম তার নিখুঁত চিত্র এঁকে দিয়েছে। আর এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য কি কি করতে হবে, ইসলাম তাও তো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে। ইসলামের শিক্ষা ছাড়া বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে আর মহৎ মানুষের জীবনেও কি যথেষ্ট উপকরণ নেই, যা দেখে তুমি সাবধান হতে পারো? নবীগণ ব্যতীত মানব জাতির ইতিহাসই মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক।

ধনী ও দরিদ্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন : আল্লাহর ইচ্ছাতেই মানুষ পেয়ে থাকে সন্তান, ধনসম্পদ এবং অন্য কিছু। বৃষ্টি যেমন সব জায়গায় একইভাবে পড়ে না, এক এক জায়গায় এক একভাবে পড়ে, মানুষও সন্তান এবং ধনসম্পদ সেভাবেই পায়। সব জায়গা সব মানুষ সমানভাবে সবকিছু পায় না। তাই তোমার কোনো ভাই যদি অনেক সন্তান ও প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়, তাঁকে হিংসা করো না। তাঁর কোনো ক্ষতি করো না। নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে, সাধনা করবে। সৎ চেষ্টা ও সাধনা অবশ্যই সফল হবে। কাজে-কর্মে যিনি সৎ, তেমন ধার্মিক লোকই সুখী। আল্লাহ তাঁকে বিপুল নিয়ামত দান করেছেন। অতএব তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং সততার সাথে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করা। সততা ও সৎকর্মের কারণে একজন সাধারণ মানুষও বেহেস্তে নবী-রাসূলদের সাথে বসবাস করার সুযোগ পাবেন। মনে রেখো, যত ধনীই হোক না কেন, কেউই জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা আর সুনামের উর্ধ্বে নয়। জনসাধারণের সহানুভূতি ছাড়া এক পাও কেউ অগ্রসর হতে পারে না। আপদে-বিপদে জনসাধারণই ধনীদের শ্রেষ্ঠতর বন্ধু। নিন্দা ও অপমান থেকে ওরাই তাকে বাঁচাবে। ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ার চেয়ে দাতার সুনাম রেখে যাওয়া অনেক ভালো। সাধারণ প্রতিবেশীদের অভাব, দারিদ্র্য ও উপবাস দেখে যে ধনী সাহায্যের হাত বাড়ায় না, তার ধন-সম্পদ কিছুতেই বাড়িবে না। যে নিজের আপন লোককে সাহায্য করে না, প্রয়োজনের সময় হাজারও হাত তাকে সাহায্য করতে আসবে না।

সৎকর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন : কাজ আর কাজ। যতক্ষণ জীবন আছে, স্বাস্থ্য আছে, সুযোগ আছে, ততক্ষণ কাজ করে যাও। কিন্তু কি কাজ? অবশ্যই সৎকাজ। সৎকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। অনুতপ্ত হও। ক্ষমা চাও। সৎকাজ করো। যতক্ষণ প্রাণ আছে, শক্তি আছে, সৎকাজের সুযোগ আছে। নিজের জন্য ভালো কাজ করো। জীবন থাকতে অন্যের জন্য কাজ করো। যে নিজের কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে, নিজের বিবেক ও আত্মাকে কুচিন্তা আর পাপ থেকে মুক্ত রাখে আর মনকে আল্লাহর নির্দেশ শুনতে বাধ্য করে রাখে–সেই খাঁটি মানুষ, সেই সত্যিকার বীরপুরুষ।

www.nagorikpathagar.org

মনে রেখো পৃথিবীতে ৪ শ্রেণির মানুষ আছে :

১. যারা ভীরু-কাপুরুষ– ধন-সম্পদ লাভের সুযোগ-সুবিধা নাই বলে তারা অন্যায় ও অবিচার থেকে দূরে থাকে।

২. যারা বুক ফুলিয়ে নিজেদের পাপের কথা বলে বেড়ায়– অন্যায়, অবিচার, খুন-জখমসহ সব ধরনের পাপকে তারা সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। কোনো কাজকে তারা অন্যায় মনে করে না। দুনিয়ার সামান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য শয়তানের কাছে তার নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দেয়।

৩. যারা আন্তরিকার সাথে সৎকাজ করে কিন্তু আল্লাহর করুণা লাভের চেষ্টা না করে দুনিয়ায় সততার ভান করে উচ্চ পদ পেতে চায়, তারা মুনাফিক। নম্রতা, সততা, সংযম– এইগুলো তাদের ভান মাত্র। সাধুতা দেখিয়ে তারা নিজেদের পাপ ঢাকতে চায়।

৪. যাদের মন দুর্বল আর চরিত্র বিকৃত, তারা না পারে কিছু করতে, না পারে কারো সাহায্য নিতে। ফলে ধনীও হয় না, ক্ষমতাসীনও হয় না। এরা ধর্ম আর আত্মতৃপ্তির আড়ালে নিজের দারিদ্র্য আর হীনতা ঢাকতে চায়। দুনিয়ার মানুষের কাছে এরা খুব সাধু এবং সুখী। অথচ এই ধরনের লোকেরা সব সময় চিন্তা করে কি করে তারা ধনসম্পদ উপার্জন করবে। আর কি করেই বা উচ্চ পদ লাভ করবে।

এছাড়া একটি ক্ষুদ্র দল আছে, যারা সংখ্যায় খুব কম। যারা আল্লাহকে ভয় করে। যারা সত্যের জন্য লড়াই করে। সত্য ও ন্যায়ের পথে অকুতোভয়ে এগিয়ে যায়। যারা অত্যাচার, অনাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। এদের কেউ কেউ নীরব কর্মী। আন্তরিকতার সাথে এরা মানুষকে ধর্মের পথে, ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে আহ্বান জানায়। নিজের সংকল্পে অটুট থেকে নির্জনে চরম দারিদ্র্যতার মধ্যে জীবন কাটায়। তাদের অবস্থা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হাত-পা, মুখ বাঁধা মানুষের মতো। সাঁতার কেটে কূলে উঠতে পারে না, আবার সাহায্যের জন্যও চিৎকার করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের জীবন অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য, ইতিহাসের পাতায় পরিণত হওয়ার আগে তুমি অন্যের জীবন থেকে সাবধানতা শিক্ষা করো।

কেমন লাগল বক্তৃতাগুলো। এমন বক্তৃতা কি আগে কোনোদিন শুনেছ? কেউ কি আর ভবিষ্যতে তোমাদের এমনভাবে বলবে বা বলতে পারবে? হয়তো পারবে না। তাই এসো, আলী (রা.)-এর বক্তৃতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। সত্যি তিনি ছিলেন কথামালার যাদুকর।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধের ময়দানে হৃদয় জয়

মানুষ যুদ্ধ করে দুশমনকে খতম করার জন্য। যুদ্ধের ময়দানে মঙ্গল চিন্তা কেউ করে না। করার কথাও নয়। কে আগে দুশমনকে শেষ করতে পারবে, তখন তো শুধু সেই চিন্তা, সেই কাজ। বলতে গেলে দুশমন খতমের প্রতিযোগিতা চলে যুদ্ধের ময়দানে। এসব তো তোমরা জানই। এখন এমন সব যুদ্ধের ছবি তোমাদের কাছে তুলে ধরব, যা দেখে তোমরা সত্যি অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, এ আবার কেমন যুদ্ধ? ভাববে, আসলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নয়তো?

দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ। এক পক্ষে সবকিছুই কম। সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র, উট, ঘোড়া, খাদ্য, পানীয় সবকিছুই কম। অন্যপক্ষে সবকিছুই কয়েকগুণ বেশি। যাদের বেশি, তারা তো কোনো কিছুর চিন্তা না করে বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করছে। সৈন্য শেষ হলে তারা সৈন্য আনছে। অস্ত্র শেষ হলে অস্ত্র। কোনো কিছুরই তাদের অভাব নেই। তারা সব কিছুই বেহিসাব খরচ করছে। আর অন্য পক্ষ খুব হিসাব করে যুদ্ধ করছে। তারা শুধু সামনাসামনি যুদ্ধ করে দুশমন খতম করছে। দুশমন উটের পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে বসে আর ওরা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। এভাবে যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ দুই পক্ষের দুই সেনাপতি সামনাসামনি এসে পড়ল। উভয় উভয়কে চিনতে পারল। শক্তিশালী পক্ষের সেনাপতি হুঙ্কার দিয়ে দুর্বল পক্ষের সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। বলল, "আজ আর কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না"বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শরীরের সমস্ত শক্তি এবং যুদ্ধের সমস্ত কৌশল সে ব্যবহার করল। তারপরও সে মোটেই পেরে উঠছে না। তরবারির সমস্ত আঘাত অপর সেনাপতি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে আঘাত করছেন। সে আঘাত ঢাল-তলোয়ার যার ওপরই পড়ছে সেখানেই বিদ্যুত চমকাচ্ছে। ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। এমন অবস্থায় দুর্বল পক্ষের সেনাপতির এক আঘাতে সবল পক্ষের সেনাপতির তরবারি ভেঙে খান খান হয়ে গেল। মুহূর্তে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেনাপতির। ভাবল, এখনই, এই মুহূর্তেই এক আঘাতেই তার মাথা ঘাড় থেকে পড়ে যাবে। আহা, কি অসহায়ভাবে আজ আমাকে মরতে হচ্ছে, নিজের ওপরই সেনাপতির ভীষণ ঘৃণা হল। ক্ষোভে, দুঃখে আত্মহত্যা করতে চাইল। কিন্তু তারও তো কোন উপায় নেই। হাতে যে ধারালো অস্ত্র নেই। কি দিয়ে আত্মহত্যা করবে? দুশমনের হাতে মরার চেয়ে নিজের হাতে মরা ভালো। কিন্তু উপায় কি? হঠাৎ অপর পক্ষের সেনাপতি খোলা তরবারি কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বললেন : আমরা অসহায় লোককে আঘাত করি না।

পরাজিত সেনাপতি : তাই নাকি? তা'হলে আমাকে একটা তরবারি দিন।

বিজয়ী সেনাপতি : এই নিন– বলে নিজের তরবারীখানা দিয়ে দিলেন।

পরাজিত সেনাপতি : আসুন, আবার যুদ্ধ করি।

বিজয়ী সেনাপতি : কি দিয়ে যুদ্ধ করব?

পরাজিত সেনাপতি : কেন, আর কোনো তরবারি নেই আপনার কাছে?

www.nagorikpathagar.org

বিজয়ী সেনাপতি : না।

পরাজিত সেনাপতি : তা'হলে এটা আমাকে দিলেন কেন?

বিজয়ী সেনাপতি : আপনি চাইলেন, তাই।

পরাজিত সেনাপতি : চাইলাম বলে দুশমনের হাতে নিজের একমাত্র তরবারিখানাই তুলে দিবেন?

বিজয়ী সেনাপতি : আমি যে সবার প্রার্থনাই পূরণ করি।

পরাজিত সেনাপতি: তাই বলে নিজেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়ে?

বিজয়ী সেনাপতি : মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না।

পরাজিত সেনাপতি : 'এখন আপনাকে কে বাঁচাবে ?'— বলে খোলা তরবারি হাতে নাচাতে লাগল।

বিজয়ী সেনাপতি : যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক সেই আল্লাহই আমাকে বাঁচাবেন।

পরাজিত সেনাপতি : আপনি অতি মহান। আপনার ধর্ম আপনার আদর্শ আরো কত না বড়, কত না মহান! যে বীরের জাতি যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের হৃদয় জয় করে, জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ধুলা মনে করে তাদের ভয় নেই, তাদের ধ্বংস নেই।

প্রচণ্ড যুদ্ধ। শত্রু পক্ষের সেনাপতি মাটিতে পড়ে গেলেন। বিজয়ী সেনাপতি সামনে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন। তার খোঁজ খবর নিলেন। পরাজিত সেনাপতিকে সসম্মানে এক বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। সেই বাড়িতে শত্রু সেনাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে শত্রুরা যখন যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করছিল, তখন তিনি সাধারণ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, পরাজিত সৈন্যদের পেছনে ধাওয়া করা যাবে না, তাদের ধন-সম্পদ লুট করা যাবে না, তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে ঘুরে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের লাশ তিনি দেখছিলেন আর দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। মাঝে মাঝে আহ উহ্ বলে আফসোস করছিলেন।

সেনাবাহিনীর প্রতি তার কঠোর নির্দেশ ছিল, সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখবে। বিশ্বাস করবে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারো না। মনে রেখ ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি আর ভালোবাসা। সাহস, বীরত্ব আর সমতার ক্ষেত্রে সব সময় নবীজীকে মনে করবে আদর্শ। আত্মরক্ষার জন্য কাউকেও হত্যা করবে না। যারা যুদ্ধ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের অনুসরণ করো না। যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের হত্যা করো না। যারা তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করে তাদের হত্যা করো না। বেসামরিক লোকদের হত্যা করো না। নারীদের অপমান অসম্মান করো না। বুড়ো আর শিশুদের কোন ক্ষতি করো না।

সেনাবাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন : নিজেরা প্রথম আক্রমণ করবে না। প্রথমে শত্রুরাই আক্রমণ করুক। আল্লাহর মেহেরবানিতে তোমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে আছ। আক্রমণ না করা পর্যন্ত শত্রুদের উস্কানি দিও না। শত্রুদের যুদ্ধে নেমে পড়তে বাধ্য করো না। যদি ওরা আক্রমণ করে তবে তোমরাও আক্রমণ করবে। কোনো অবস্থাতেই তোমরা যুদ্ধের সূচনা করবে না। আল্লাহর মেহেরবানিতে তোমাদের যদি জয় হয় তাহলে যারা আত্মসমর্পণ করতে চায় তাদের আক্রমণ করো না। আহত, দুর্বল ও পঙ্গু সেনাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে। ওদের আঘাত করবে না। মেয়েরা তোমাদের প্রতি অপমানজনক উক্তি করলেও তোমরা তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের প্রতি কটু কথা বলবে না।

www.nagorikpathagar.org

আততায়ীর হাতে মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মৃত্যু আমার কাছে হঠাৎ আসেনি। কাজেই মৃত্যুর প্রতি আমার কোনো ভয় নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই। শহীদের মৃত্যু আমি সব সময় কামনা করেছি। পিপাসায় তৃষ্ণার্ত মানুষ পানির জন্য যেমন ছটফট করে আমিও মৃত্যুর জন্য ছটফট করেছি। আমিতো নিজেই শাহাদাত খুঁজে বেড়িয়েছি। এখন তা পেয়ে গেছি। আল্লাহর কাছে যা পাওয়া যায় ধার্মিকের জন্য তাই উত্তম।

বিশ্ব বিজয়ী বীর ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) শত্রুদের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন, এতক্ষণ তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো। তোমরা সকলেই জানো তিনি অতি বড় বীর ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইসলাম প্রচারের পর নবীজীর জীবনে এবং খেলাফতের আমলে শত্রুদের সাথে মুসলিমদের যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়, মাত্র কয়েকটি ছাড়া প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। নবীজীর আমলে শুধু 'তাবুক' অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সকল যুদ্ধেই অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। এজন্য তাকে জুলফিকার বা আল্লাহর তরবারি বলা হতো। প্রতিটি যুদ্ধেই আলী (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য বিজয় এনে দিয়েছেন। এ জন্যেই সে সময় 'আলী ছাড়া বিজয় নেই' এই কথা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। আলী (রা.)-এর বয়স তখন পনের কি ষোল। তিনি তো এই বয়সেই বড় বড় বীরদের পাশাপাশি এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন, যার ফলে তাকেই এসব যুদ্ধের নায়ক মনে করা হয়।

যুদ্ধের শুরুতেই 'অলীদের' সাথে তার মোকাবিলা হয়। তরবারির এক আঘাতেই তিনি তাকে দু'টুকরা করে দিলেন। শাইবা নামে এক শত্রু উবায়দা নামে এক সাহাবীকে আক্রমণ করে। উবায়দা আহত হন। আলী (রা.) অন্য একজন সাহাবীর সহযোগিতায় শাইবাকে হত্যা করেন। ওহুদের যুদ্ধে বিপক্ষের সেনাপতির মাথায় এমন জোরে তরবারির আঘাত হানলেন যে, তার মাথা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। খন্দকের যুদ্ধে আরবের বিখ্যাত বীর 'আমর' কে তিনি নিহত করেন। খাইবার যুদ্ধের সেনাপতি মারহাব তরবারি দুলিয়ে কবিতা আবৃতি করতে করতে ময়দানে নামলে তার মোকাবেলায় আলীও কবিতা আবৃত্তি করতে করতে নামলেন। মুহূর্তেই মারহাবের মাথায় এমন জোরে তরবারির আঘাত হানলেন যে, তার মাথা কেটে গেল। সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এইভাবে খাইবার বিজিত হলো। একে একে সমস্ত যুদ্ধে তিনি সৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। এত বড় বীর অথচ তিনি ছিলেন শত্রুর প্রতি অত্যন্ত কোমল, সহানুভূতিশীল। এর প্রমাণতো কিছুক্ষণ আগেও তোমরা পেয়েছ। অকারণে তিনি কাউকে হত্যা করেননি। কারো প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পোষণ করেননি। ধর্মের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্য তিনি শত্রুর মোকাবেলা করেছেন। নিজে কাউকে শত্রু বানাননি। তিনি প্রথমে কাউকে আক্রমণ করেননি। আক্রান্ত হলে জবাব দিয়েছেন মাত্র। দুনিয়ার অন্যান্য যুদ্ধবাজ বীরেরা যেভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়, যেভাবে বেসামরিক লোকদের হত্যা করে, নারী-শিশুদের ওপর অত্যাচার করে, রাজ্য থেকে সাধারণ মানুষকে উৎখাত করে, তিনি কখনও তা করেননি। তিনি সাধারণ অর্থে শুধু বীর ছিলেন না। ইসলামের স্বার্থেই নিজের শক্তি ব্যয় করেছেন। অন্য কোনো স্বার্থে নয়। যুদ্ধে জয় করে অন্য বীরেরা সাম্রাজ্যের মালিক হয়, ধন-সম্পদের মালিক হয়, কিন্তু তিনি কিছুরই মালিক হননি। বরং সারাজীবন দীনহীন বেশে তিনি জীবন কাটিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

সবাই হলেন বিরাগভাজন

তোমরা বড় হলে দেখবে, জানবে, বর্তমান যুগের রাজা, বাদশাহ বা শাসনকর্তারা কিভাবে সরকারি অর্থ খরচ করে। শুধু বর্তমান যুগের কেন অতীতের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ সরকারি তহবিলকে নিজের তহবিল মনে করতেন। নিজেদের খেয়াল খুশিমতো খরচ করতেন। নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য এরা কোটি কোটি টাকা অনায়াসে খরচ করতেন। তোমরা বড় হলে জানতে পারবে, মোগল আমলে বাদশাহ শাহজাহান শুধু নিজের স্ত্রীর স্মৃতিসৌধ 'তাজমহল' নির্মাণের জন্যই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন। যে টাকা তিনি ব্যয় করেছিলেন তা তার নিজের ছিল না। সরকারি তহবিলের টাকাই তিনি খরচ করেছিলেন। এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য জনগণের কাছ থেকে তিনি কোনো অনুমতি নেননি। নেয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি। কারণ দুনিয়ার প্রায় সকল রাজা-বাদশাহর মতো সরকারি তহবিলকে তিনি নিজের তহবিল মনে করতেন।

এ ব্যাপারে অতীতকাল এবং বর্তমানকালের রাজা-বাদশাহদের মধ্যে কোনো তফাত নেই অথচ ইসলামের চার খলিফা সরকারি তহবিল-এর ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি নীতি মেনে চলেছেন। সরকারি তহবিলকে তারা কখনও নিজেদের তহবিল মনে করতেন না। সরকারি তহবিল থেকে খরচ করার ব্যাপারে যে নিয়ম-নীতি ঠিক করা হতো এর বাইরে খলীফার নিজের ইচ্ছামতো এক পয়সাও খরচ করতেন না।

হযরত আলী (রা.) সরকারি তহবিল হতে খরচ করার ব্যাপারে যে উদাহরণ রেখে গেছেন দুনিয়ায় তার দৃষ্টান্ত মেলা কঠিন। তার সময় সরকারি তহবিলে আয় কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবুও যে আয় হতো, তা তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতেন। যারা সরকারি তহবিল থেকে ভাতা পেতেন তাদের তিনি নিয়মিত ভাতা দিতেন। নিজের ইচ্ছামতো কারো ভাতা বেশি, কারো ভাতা কম করতেন না। নিজের পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন কেউ অতিরিক্ত ভাতা বা সুযোগ-সবিধা পেতেন না। এখানে আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব, তার থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে সরকারি তহবিলের ব্যাপারে তিনি কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি আলী (রা.)-এর সামনে হাজির হয়ে বললেন, আপনি এবং আপনার পরিবার-পরিজন বায়তুল মালের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। আমি আপনার অংশ পৃথকভাবে রেখেছি।

আলী : কি রেখে দিয়েছেন?

লোকটি তার সামনে সোনা এবং রুপা ভর্তি একটি পাত্র রেখে দিলো।

আলী : এটা আমার অংশ হলো কিভাবে? কোনোভাবেই এটা আমার অংশ হতে পারে না। তুমি কি আগুন দিয়ে আমার ঘর ভরে দিতে চাও?

সোনা ও রুপার পাত্রটি তিনি গরিব জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

একবার জুমআর দিন তিনি মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল তার ছেলে হাসান ও হোসেন খুব দামী চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়তে এসেছেন। তিনি ভাষণ বন্ধ করে দেন। ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন-এত দামী চাদর তোমরা কোথায় পেলে? দুই ভাই-এর মধ্যে একজন বললেন, অমুক ধনী ব্যক্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন। হযরত আলী (রা.) ওদের শরীর থেকে চাদরগুলো খুলে নিয়ে সরকারি তহবিলে জমা দিয়ে দিলেন।

সরকারি তহবিলের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার পর তিনি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করতেন। কখনও আত্মীয়-স্বজনকে আগে দিতেন না। একবার ইয়েমেন থেকে কয়েক পাত্র মধু এলো। হযরত আলীর পুত্র হাসানের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এলেন। হাসান চিন্তা করলেন, কি দিয়ে মেহমানদারি করবেন। বাজার থেকে রুটি আনলেন। কিন্তু রুটির সাথে দেবেন কি? হঠাৎ তার মধুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি কিছু মধু আনলেন এবং কোনো রকমে মেহমান বিদায় করলেন। হযরত আলী (রা.) মধু বিলিবন্টন করার সময় দেখলেন একটি পাত্রে মধু কম দেখা যাচ্ছে। তিনি খুব চিন্তায় পড়লেন। আলী (রা.) চাকরকে বললেন-এই মটকায় মধু কম কেন?

চাকর : আমীরুল মোমেনীন, আপনার ছেলে মেহমান আপ্যায়নের জন্য এখান থেকে কিছু মধু নিয়েছেন। হযরত আলী শুনে খুব দুঃখ পেলেন। তখনই হাসানকে ডেকে পাঠালেন। খুব রাগারাগি করলেন। তারপর রাগ থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে না দেয়া পর্যন্ত তুমি এখান থেকে কোন্ সাহসে মধু নিলে?

হাসান : এখানে আমারও তো কিছু অংশ আছে। আমি মনে করেছিলাম আমার অংশ পেলে ঐ পরিমাণ মধু আমি ফিরিয়ে দেবো।

আলী : এখানে তোমার অংশ অবশ্যই আছে। কিন্তু বিলি-বন্টন হওয়ার আগে তুমি তোমার অংশ এভাবে আদায় করতে পারো না।

এরপর তিনি বাজার থেকে মধু আনিয়ে ঐ পাত্রে রাখলেন। তারপর আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ হাসানকে ক্ষমা করো, সে না বুঝেই এমন করেছে।

একবার সরকারি তহবিলে কিছু ঘি ও মধু জমা হয়েছিল। আলী (রা.)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুমের ঘি ও মধুর প্রয়োজন হয়ে পড়লে তিনি সংবাদ পাঠালেন। ঘি ও মধু রক্ষণাবেক্ষণকারীর কাছে উম্মে কুলসুমের চিঠি পৌঁছল। তিনি খলীফার অনুমতি না নিয়েই উম্মে কুলসুমের কাছে কিছু ঘি ও মধু পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আলীর (রা.) সামনে যখন ঘি ও মধুর পাত্রগুলো আনা হলো, তখন তিনি দেখলেন একটি ঘি ও মধুর পাত্রে কিছু অংশ খালি। বিলি-বন্টনের আগে মটকাগুলো কিছুটা খালি হওয়াতে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কর্মচারী বললেন-আপনার মেয়ের নির্দেশে কিছু ঘি ও মধু আমি এই পাত্রগুলো থেকে পাঠিয়ে দিয়েছি। খলীফা শুনে দুঃখিত হলেন। কত টাকার ঘি ও মধু দেয়া হয়েছে তা জানতে চাইলেন। হিসাব করে দেখা গেল সরকারি তহবিলের ৫ দেরহাম ক্ষতি হয়েছে। হযরত আলী (রা.) তৎক্ষণাৎ মেয়েকে খবর পাঠালেন, তোমার জন্য সরকারি তহবিলের ৫ দেরহাম ক্ষতি

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, এখনই তা পাঠিয়ে দাও। মেয়ের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন।

একবার তার ভাই আকিল তাঁর কাছে এসে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা বলে সাহায্য চাইলেন। হযরত আলী (রা.) ভাইয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে বিচলিত হলেন। অনেক ভাবলেন তাঁকে কোনোভাবে সাহায্য করা যায় কি না। কিন্তু দেখলেন সাহায্য করার মতো তাঁর কাছে কিছু নেই। তিনি নিজেই তো দীনহীন দরিদ্র মানুষ। কি করে তিনি সাহায্য করবেন? অগতা নিরুপায় হয়ে ভাইকে বললেন, তোমাকে সাহায্য করার মতো আমার কাছে যে কিছুই নেই। তবে অপেক্ষা করো, সরকারি তহবিল থেকে যখন সবাইকে দেয়া হবে, তখন তুমিও তোমার অংশ পাবে।

আকিল : আমিতো ততক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছি না, আমার অংশটা দয়া করে এখনই দিয়ে দিন না।

ভাইয়ের কথায় হযরত আলীর মন গলল না। তিনি তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। একজনকে ডেকে বললেন, একে বাজারে নিয়ে যাও এবং বলো, কোনো দোকানের তালা ভেঙে সেখান থেকে কিছু নিয়ে যাক।

আকিল : আপনি আমাকে চুরি করতে বলেন?

আলী : কিন্তু তুমি আমাকে চোর বানাতে চাও কেন? সরকারি তহবিল থেকে অন্যকে দেয়ার আগে তোমাকে যদি কিছু দেই তা কি চুরি বলে গণ্য হবে না?

আকিল : আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তা'হলে আমি আপনার শত্রুর দলে ভিড়ে যাব।

আলী : তাই যাও। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারছি না। রাগে-দুঃখে ক্ষোভে আকিল আলী শত্রুর শিবিরে ভিড়ে গেলেন।

এইভাবে সরকারি তহবিলের অর্থ তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজনে সরকারি তহবিলের অর্থ তিনি কোনো দিনই ব্যয় করেননি। এতে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুরা বিরাগভাজন হয়েছেন। তবুও তিনি সরকারি তহবিল পরিচালনায় কোনো হেরফের করেননি।

তোমরাই বলো, আজকের যুগে যদি কোনো শাসনকর্তা সরকার, তহবিলের ব্যাপারে এমন নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে কি সমাজে আবার সুখ–শান্তি ফিরে আসবে না?

www.nagorikpathagar.org

একেই বলে সাম্য

হযরত আলী (রা.) জনগণের সুযোগ-সুবিধার দিকে খুব নজর রাখতেন। জনগণের কল্যাণ চিন্তা তিনি সব সময় করতেন। মানুষের সাথে তিনি সৎ ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। কারো কোনো কিছু তিনি অবহেলা করতেন না। কোনো মানুষের ওপর অন্য মানুষের প্রাধান্য তিনি স্বীকার করতেন না। ধনী-গরিব, উচু-নীচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবারই মর্যাদা ও গুরুত্বই ছিল তাঁর কাছে সমান। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। এবং সে কারণেই সরকারি তহবিল থেকে সবার জন্য সমানভাবে বরাদ্দ করতেন। সাম্যবাদ যদি কোথাও কখনও কায়েম হয়ে থাকে, তাহলে তা আলী (রা.)-এর জামানায় কায়েম হয়েছিল। ওমর (রা.) মনে করতেন, যাঁরা বেশি আল্লাহভীরু, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করছে তাঁদের বেশি ভাতা পাওয়া উচিত। সেই হিসেবে তিনি দীনদার, পরহেজগার, ত্যাগী লোকের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সমাজে এরা ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আলী (রা.) তাঁর আমলের এই ব্যবস্থা তুলে দেন। দীনদার, পরহেজগার, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবার ভাতা একইভাবে তিনি ধার্য করেন। এতে আগে যারা বেশি ভাতা পেত, তাদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর নীতিতে অটল থাকলেন। কোনো হেরফের করলেন না। তিনি যে সাধারণ মানুষের কত বড় বন্ধু ছিলেন, এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার এক মহিলা তাঁর বিপক্ষ দলের নেতা আমীর মুয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হন। মহিলার নাম ছিল সওদা।

সওদা : হে আমীর, এখন আপনি আমাদের নেতা, রাজ্যের সমস্ত কাজের ফলাফলের জন্য আপনি দায়ী হবেন। আপনার কোন কর্মচারী অপরাধ করলে আপনিই অভিযুক্ত হবেন। আপনার ওপর আমাদের যে হক আছে তার জন্য আপনাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আপনি বরাবর আমাদের ওপর এমন কর্মচারী নিয়োগ করেছেন যারা আপনার শান-শওকতের ওপর নির্ভর করে আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ক্ষেত-খামারে শস্য পাকলে যেভাবে লোকেরা শস্য গাছ কাটে, আপনার শাসনকর্তারাও আমাদের জীবন সেভাবেই হরণ করছেন। গোয়ালা গাভীর দুধ যেভাবে দোহন করে, আমাদের ধন সম্পদ তারা সেভাবেই নিচ্ছেন। আপনি যাকে আমাদের গভর্নর করে পাঠিয়েছেন, তিনি বিনা কারণে, বিনা বিচারে নিজের খেয়াল খুশিমতো আমাদের পুরুষদের হত্যা করছেন। ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, আমাদের ধন-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছেন। যদি আমীরকে মেনে চলার হুমকি না থাকত, তা'হলে আমরাও সম্মানী মানুষ, আমরা নিজেরাই এর প্রতিবিধান করতে পারতাম। আপনি তাকে বরখাস্ত করে অন্য গভর্নর নিযুক্ত করুন, আর যদি তাকে বরখাস্ত না করেন, তা'হলে আমরা নিজেরাই এ ব্যবস্থা করব।

www.nagorikpathagar.org

মুয়াবিয়া : (রাগান্বিত স্বরে) ও তবে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। তুমি আমাকে জানাতে চাও যে, তোমরা খুবই শক্তিশালী তাই না? তাহলে যা ইচ্ছা, তাই করো। আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আমার গভর্নরের কাছে তোমাকে এখনই পাঠিয়ে দিতে পারি। সে তোমার ওপর তার প্রতিশোধ নিতে পারে। সওদা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি কবিতা আবৃতি করলেন, সে কবিতার মর্মার্থ হলো :

যে আত্মা কবরের কাছাকাছি গিয়েছে

এবং ন্যায় বিচার করে দাফন হয়েছে,

সে আত্মার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

মুয়াবিয়া : সে আবার কে?

সওদা : কেন, হযরত আলী (রা.)!

মুয়াবিয়া : তিনি যে ন্যায় বিচারক ছিলেন, তার কোনো প্রমাণ তো দেখছি না!

সওদা : একবার এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আলীর (রা.) কাছে হাজির হয়েছিলাম। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। নামাজের সালাম ফিরিয়ে তিনি নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন : মনে হয় তুমি কোনো অভিযোগ নিয়ে এসেছ। তোমার অভিযোগ আগে খুলে বল। আমি সব কথা খুলে বললাম। আমার কথা শেষ না হতেই তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আকাশের দিকে মুখ করে আবেগ ভরে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, তুমি ভালোভাবে জান যে, আমি কোনো কর্মচারীকে তোমার কোনো বান্দার ওপর অত্যাচার করার জন্য নিযুক্ত করিনি। অত্যাচার-অবিচার চালানোর কোনো নির্দেশও আমি কাউকে দিইনি।'

সওদা তাঁর পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে মুয়াবিয়াকে দেখালেন। ওটা ছিল ঐ কর্মচারীর কাছে লিখিত হযরত আলীর চিঠি। মুয়াবিয়া মনোযোগ দিয়ে চিঠিটি পড়লেন। চিঠিতে লিখা ছিল : তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের দাঁড়িপাল্লা ঠিক করো। প্রজাদের সম্পত্তির পরিমাণ কম করো না। খারাপ কাজ করো না। আমার পত্র তোমার কাছে পৌছা মাত্রই তোমার কাছে যা কিছু আছে, তা মহিলাকে না দেয়া পর্যন্ত সততার সাথে জমা রাখবে।

সওদা : এর পরেই হযরত আলী ঐ কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছিলেন।

মুয়াবিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর তাঁর কর্মচারীকে বললেন : গভর্নরকে লিখে দাও, এই মহিলার সাথে যেন ভালো ব্যবহার করেন।

সওদা : আপনি তো ধমক ছাড়া কথাই বলতে পারেন না, তবে আমিও বলছি, যদি ইনসাফ করা হয় তাহলে সবার প্রতিই করা উচিত। আর যদি না হয়, তাহলে সকলের যে অবস্থা আমারও তাই হবে। আমি কেবল আমার নিজের সুবিধা আদায়ের জন্য আপনার কাছে আসিনি।

মুয়াবিয়া- (রাগত স্বরে) আলী তোমাদের এতটুকু মাথায় তুলেছে যে, তোমরা বাদশাহর সামনেও বড় বড় কথা বলতে ভয় পাও না।

www.nagorikpathagar.org

আর একদিনের ঘটনা। লোকেরা সমান হারে ভাতার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করতে লাগল। আর যারা বেশি ভাতা পেত, তারা আরও বেশি ভাতার দাবি নিয়ে কথা বলতে লাগল। তাদের দাবি, তারা সমাজের জ্ঞানী, গুণী, উচ্চশ্রেণির লোক। তারা বেশি ভাতা পাওয়ার যোগ্য। অন্যেরা তাদের দাবি ঠিক নয় বলে মন্তব্য করছিল। তারা বলতে লাগলেন, হযরত আলী যে সাম্য ব্যবস্থা কায়েম করেছেন তা-ই সঠিক ও উত্তম।

আলী (রা.) বিষয়টি জানতে পারলেন এবং খুব দুঃখিত হলেন। লোকদের উদ্দেশে তিনি ভাষণ দিলেন। বললেন, যারা আমাকে খলীফা বানিয়েছ, তাদের ওপর অত্যাচার-অবিচার করার জন্যে আমি কি তোমাদের সাহায্য নেব। আল্লাহর কসম, এটা কখনও হতে পারে না। সরকারি তহবিল যদি আমার নিজস্ব হতো তবুও সমস্ত সম্পদ সকলের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতাম। এইগুলো তো আল্লাহর সম্পদ। আমি এর রক্ষাকারী মাত্র। এই তহবিল বণ্টনে কমবেশি করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এইভাবে যতদিন তিনি শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে সমান চোখে দেখেছেন। সবার প্রাপ্য সমানভাবে আদায় করেছেন। রাজকর্মচারী, সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের কোনো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা তিনি দিতেন না। কারো অন্যায় আবদার তিনি শুনতেন না। বরং সাধারণ মানুষের পরামর্শ অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। কোনো কর্মচারীর অনুরোধ বা পরামর্শে তিনি সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-অবিচার চালাননি। বরং সাধারণ মানুষের অভিযোগেই বহু রাজকর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। রাজ-কর্মচারীদের তিনি সাধারণ মানুষের সেবক বলেই মনে করতেন। সাধারণ মানুষের চেয়ে রাজ-কর্মচারীদের কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা ছিল না। শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

এই যুগেও যদি আলীর (রা.) মতো রাজ্য-শাসননীতি অনুসরণ করা যেত, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে মানুষের প্রতি মানুষের জুলুম, অত্যাচার, অবিচার দূর হয়ে যেত। মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পেত। সমস্ত প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি উঠে যেত। সমাজে কায়েম হতো সুখী-সুন্দর জীবন ব্যবস্থা।

www.nagorikpathagar.org

দরদভরা মন ও শাসন

হযরত আলী (রা.) খবর পেলেন এক প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিধর্মীদের ওপর খুব অন্যায় অত্যাচার করছেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু বিধর্মীরা মুসলিমদের কাছে আমানত স্বরূপ। তাদের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমদের। সেই মুসলিমরাই যদি বিধর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে এই বিধর্মীরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পাবে। তিনি সাথে সাথেই শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখলেন :

তোমার জানা দরকার, তোমার এলাকার গ্রামবাসীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তুমি নাকি তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করছ। তাদের সঙ্গে হীন ও নীচ ব্যবহার করছ। আমার নির্দেশ হলো- বিধর্মী বলে ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না। তারা আমাদের দ্বারা শাসিত। তাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাথে আমরা কোনোভাবেই খারাপ ব্যবহার করতে পারি না। কাজেই ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সময় মতো সবকিছু করে দেবে। সবসময় উপযুক্ত ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ করবে না।

রাষ্ট্রের এবং সরকারের আয় বলতে ছিল ট্যাক্স ও জাকাত আদায়। যারা জাকাত আদায় করতেন, তার ছিলেন সরকারি কর্মচারী। বরাবর তিনি তাদেরকে জনগণের সাথে মিলেমিশে নরম ব্যবহার করে জাকাত আদায় করতে বলতেন। কঠোর ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। তাদের ব্যবহারে জনসাধারণ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলতেন। মোট কথা, সরকারের পক্ষ থেকে জাকাত আদায়ের ব্যাপারে কোন জোর-জুলুম তিনি আরোপ করতেন না। এ ব্যাপারে জাকাত আদায়কারীদের প্রতি তাঁর একটি লিখিত নির্দেশের অংশ তুলে ধরছি :

সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। জনগণের সাথে এমন ব্যবহার করবে যাতে তোমাকে দেখে ওরা ভয় না পায়, দুশ্চিন্তায় না পড়ে। এমন ব্যবহার করো না, যাতে তারা তোমাকে ঘৃণা করে। এমন ব্যবহার করো যাতে তারা তোমাকে ভাই বলে মনে করে, তোমার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে। কারো ওপর অতিরিক্ত কর ও জাকাত ধার্য করো না। জাকাত দেয়ার মতো সামর্থ্য যার নেই, তার কাছে জাকাত দাবি করো না। কেউ যদি বলে তার যাকাত দেয়ার সাধ্য নেই তবে তার কথা মেনে নেবে। কাউকেও অবিশ্বাস করবে না। জাকাত আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি করবে না। কাউকেও হয়রানি করবে না। জাকাত হিসেবে যে যা দিতে চায়, তাই গ্রহণ করবে। কারো গোয়ালে প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করলে অনুমতি নিয়ে করবে। পশুদের প্রতি এমন ব্যবহার করো না যাতে ওরা ছোটাছুটি করতে থাকে। কোনো ভাগাভাগি

www.nagorikpathagar.org

করতে হলে মালিককে তাঁর ইচ্ছামতো করে দিতে বলবে। কোনো অংশ তুমি নিজে পছন্দ করে নেবে না। জাকাত হিসেবে কোনো পশু যদি পাও, তাহলে সেগুলো আনার জন্য দয়ালু লোকের ওপর দায়িত্ব দেবে যাতে পশুগুলোকে সে কষ্ট না দেয়। পশুগুলোকে ভুখা না রাখে।

পশুদের অতিরিক্ত খাটাবে না। ওদের বাচ্চাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখো না। বাচ্চার জন্য দুধ না রেখে সব দুধ দোহন করো না। একটানা কোনো পশুর ওপর চড়ে চলাফেরা করো না। পালাবদল করে বিভিন্ন পশুর ওপর চড়ে চলাফেরা করো। পথিমধ্যে জলাশয় পেলে তার ধারে বিশ্রাম নিতে দেবে। ধীরে সুস্থে আরামের সাথে পশুগুলোকে নিয়ে এসো। সাবধান। পশুগুলোর গায়ে যেন কোনো নির্যাতনের চিহ্ন না থাকে।

মানুষ এবং পশুর প্রতি হযরত আলী (রা.) কত সদয়, কত সহানুভূতিশীল ছিলেন, উপরোক্ত নির্দেশ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বড় হলে দেখবে, আমাদের দেশে কর ও ট্যাক্স আদায়কারী সরকারি কর্মচারীরা জনগণের ওপর কী নির্মম-নিষ্ঠুর ব্যবহার করে থাকে। জোর জবরদস্তি ও ক্ষমতা দেখিয়ে ওরা জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করতে থাকে। বর্তমান যুগের কোন রাজা-বাদশাহ বা শাসনকর্তা কর আদায়ের ব্যাপারে এমন শালীন ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারবেন কি? তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, এই শালীন, ভদ্র ও নমনীয় ব্যবহারের জন্য হযরত আলীর (রা.) সময়ে কর ও যাকাত আদায়কারীদেরকে কোনো জোর-জবরদস্তি করতে হতো না। বরং জনগণ স্বেচ্ছায় ও উৎসাহের সাথে তাদের জাকাত ও কর পরিশোধ করতো।

পশুদের প্রতি এমন ব্যবহারের নির্দেশ দুনিয়ার কোনো ইতিহাসে কি পাওয়া যায়? তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, পশু এবং পশুদের বাচ্চার ব্যাপারে কত খুঁটিনাটি নির্দেশ তিনি সরকারিভাবে জারি করেছিলেন। তোমাদের কাছে ব্যাপারটি হয়তো বেখাপ্পাই ঠেকেছে। এতবড় শাসনকর্তা, তিনি কি না পশুদের কথা ভাবছেন কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকলে কি হবে, শাসনকর্তা হিসেবে পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। সে দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। অন্যেরা এই দায়িত্ব পালন করে না বলেই আমাদের কাছে ব্যাপারটা বেখাপ্পা ঠেকেছে।

মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি লিখলেন : 'জনগণের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি সদয় হবে, হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। নম্র ও বিনয় ব্যবহার করবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। ন্যায় বিচার করবে। সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে। শাসনকর্তা হিসেবে তোমার ছোট-বড় সকল পাপের হিসাব নেয়া হবে। মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে। সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে। মনে রাখবে জীবন তোমাকে সব সময় মৃত্যুর দিকে ধাওয়া করবে। ধর্ম আর রাষ্ট্রকে তোমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। সতর্কতার সাথে সুবিবেচনার সাথে কাজ করবে। খামখেয়ালীর বশে কিছু করবে না। মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বিরাগভাজন হয়ো না। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সব কাজ করবে। ইমাম বা নেতার দায়িত্ব সব সময় স্মরণ রাখবে।

www.nagorikpathagar.org

আর এক শাসনকর্তার কাছে তিনি চিঠি লিখেন : ‘তুমি এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে যেয়ে খুব আনন্দ করে পেট ভরে খেয়েছ। এ খবর শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি। যারা শুধু বড় বড় লোকদের, রাজকর্মচারীদের দাওয়াত করে খাওয়ায় অথচ যারা গরিব-দুঃখীদের কোনো খোঁজ-খবর রাখে না তাদের দাওয়াতেই তুমি গিয়েছ। এটা কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। তোমার জানা উচিত ছিল যে, এরা হালাল পথে উপার্জন করে না। তোমার চার পাশে যখন লোকেরা না খেয়ে কাটাচ্ছে, অভাব-দারিদ্র্যে যারপরনাই কষ্ট পাচ্ছে, এক-দুই টুকরা শুকনো রুটি যখন তাদের জুটছে না, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের আর্তনাদে দশ দিক যখন প্রকম্পিত হচ্ছে তখন এই নিরন্ন অভাবগ্রস্ত মানুষের শাসনকর্তা হয়ে তুমি কোন্ মুখে পেট পুরে খেতে পারলে? আল্লাহকে ভয় করবে। প্রতি মুহূর্তের কাজের জন্য তার কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

এভাবে সকল শাসনকর্তার কাছে তিনি চিঠি লিখতেন। চিঠিতে আদেশ-উপদেশ, নির্দেশ-ফরমান সব কিছুই থাকত। প্রায়ই তিনি লিখতেন এবং এর মাধ্যমে শাসনকর্তাদের তিনি আল্লাহর পথে অটল থাকার উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর চিঠি পেলে দুর্বল ঈমানের শাসনকর্তারা ইসলামের শাশ্বত জীবন বিধানের দিকে আবার ফিরে আসতেন।

হযরত আলী (রা.) এভাবে অসি-মসি, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু দিয়ে রাষ্ট্র, ইসলাম ও জনসাধারণের সেবা করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

অকুতোভয় দেহরক্ষী

মদীনা শহরে বসে পিতা-পুত্রের মধ্যে আলাপ হচ্ছিল। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো অনেক ছেলে ছিলো। কিন্তু শিশু বয়সে সবাইতো মারা গেছে। তবুও কাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন?

পিতা : আবু তালেবের পুত্র আলীকে নবীজী সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

পুত্র : আমিতো তার নিজের ছেলের কথাই জানতে চাচ্ছি।

পিতা : মহানবী তাঁর নিজের ছেলেদের চেয়ে আলীকে বেশি ভালবাসতেন। আলী সব সময় মহানবীর সাথে থাকতেন। মহানবী আলীকে যেভাবে ভালোবাসতেন, কোনো পিতা নিজের ছেলেকেও তেমনভাবে ভালোবাসতেন না। আবার আলী (রা.) মহানবীকে যেভাবে ভালোবাসতেন, কোনো ছেলে তার পিতাকে তেমনভাবে ভালোবাসেন না।

এই ছিল আলীর সাথে নবীজীর সম্পর্ক। তোমাদের মতো বয়স থেকেই তিনি ছায়ার মতো নবীজীর সাথে সাথে থাকতেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে নবীজীর ওপর যখন অত্যাচার নির্যাতন শুরু হলো, তখন নবীজীর সাথে সাথে তাঁকেও জুলুম-নির্যাতন-এর শিকার হতে হয়েছিল। মা-বাবার উস্কানিতে মক্কার বালকরা যখন নবীজীর প্রতি ইট-পাটকেল ছুড়ত, আলী তখন নবীজীকে আড়াল করে দাঁড়াতেন। তখন কতই বা তাঁর বয়স। খুব বেশি হলে তোমাদের মতো হবে। অথচ ঐটুকু বয়সে তিনি নবীজীর দেহরক্ষীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাস্তায় নামলে লোকেরা, বালক-বালিকারা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, তাঁকে লক্ষ করে কংকর ছুড়ে মারত– তবু কখনও তিনি নবীজীর থেকে আলাদা থাকেননি। রাস্তায় বের হলেই দেখা যেত নবীজীর সাথে আলী (রা.) রয়েছেন। আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। বরং নবীজীর বিপদ-আপদের কথা জেনেই তিনি নবীজীর সাথী হয়েছিলেন। এ সময় নিজের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি তিনি নবীজীকে রক্ষা করার জন্য ব্যয় করেছেন। অনেক সময় যেসব বালক-বালিকা নবীজীকে লক্ষ করে ঢিল ও কংকর ছুড়ে মারত, তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করতেন। তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। কোনো সময়েই তাঁর সাথে কেউ পেরে উঠত না, কেননা শক্তি ও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নবীজীর প্রতি তাঁর এতই ভক্তি-ভালোবাসা ছিল যে, কোনো কোনো সময় একদল ছেলের সাথে তিনি একাই লড়েছেন। এজন্য ক্ষতবিক্ষতও হয়েছেন। বড় হয়েও নবীজীর জন্য, ইসলামের জন্য, মুসলিম জাতির জন্য তিনি বহুবার অকুতোভয়ে লড়েছেন। কোনো কোনো সময় তিনি একাকী যুদ্ধ করেছেন।

নবীজীকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, নবীজীর অনুকরণে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। কাপড়-চোপড় পরতেন। ওঠাবসা করতেন। নবীজীর সাথে সবসময় ছিলেন বলে নবীজীর চরিত্রের ছাপ তাঁর ওপর পড়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

চিরকালের চিরচেনা বাণী

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বড় বড় ঐতিহাসিকরা অনেক কথা বলেছেন। তোমাদের জন্য এখানে কয়েকজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের মন্তব্য পেশ করছি :

ঐতিহাসিক জর্জ নেপ্‌ল বলেছেন, তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাব ও পরম সহিষ্ণু ছিলেন। সবাইকে সবসময় ভালো পরামর্শ দিতেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন অসম সাহসী। মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে ডাকতেন আল্লাহর সিংহ বলে।

ঐতিহাসিক জর্জ জয়দান লিখেছেন, আলীর প্রশংসা কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। তাঁর সততা ও আল্লাহভীতির এত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তাঁকে ভালো না বেসে, শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। তিনি ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। কারো সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। কাউকে তিনি ভুল পথে পরিচালিত করেননি। তাঁর কোনো চাকর-বাকর ছিল না। নিজের কাজ তিনি নিজেই করতেন। নিজের বোঝা তিনি নিজেই বহন করতেন। কেউ তাকে সাহায্য করতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ ছিল না। তিনি ছিলেন কবি, সৈনিক ও আল্লাহভীরু শাসক। জীবনের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মহানবীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। মহানবী অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকে ভাই বলে ডাকতেন।

তিনি সব সময় লোকদের সৎ উপদেশ দিতেন। ভালো পরামর্শ দিতেন। কখনও আজে বাজে কথা বলতেন না। তাই তাঁর কথাকে লোকেরা বাণী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তোমাদের জানার জন্য এখানে কয়েকটি বাণী সংকলন করছি :

১. আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আর কাকেও ভয় করতে হবে না। আল্লাহ অবশ্যই মনকে সুন্দর করে।

২. তোমার বাবা-মাকে সম্মান করো– তাহলে তোমার ছেলেও তোমাকে সম্মান করবে।

৩. উদার হও– উদারতা প্রেমের জন্ম দেয়।

৪. সংযমী হও– সংযম সুন্দর জীবনের পথ তৈরি করে।

৫. সৎ শিক্ষা লাভ করো– মার্জিত স্বভাব অর্জন করতে পারবে।

৬. নম্র ব্যবহার করো– সম্মান অর্জন করতে পারবে।

৭. ধার্মিক হও– ধর্ম মানুষকে সংযত করে।

৮. কৃতজ্ঞ হও– কৃতজ্ঞতায় সমৃদ্ধি বাড়ে।

৯. আল্লাহভীরু হও– আল্লাহভীতি মানুষকে পাপ থেকে বাঁচায়।

১০. সন্দেহ পোষণ করো না– সন্দেহ থেকে যে নিজের মনকে পরিষ্কার রাখে সেই খাঁটি মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

১১. বোকা বন্ধু বানিও না– বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

১২. নিজেকে জান– যে নিজেকে জানে সে তার স্রষ্টাকেও জানে।

১৩. সৎ কাজ করো– যে যেটুকু সৎকাজ করে সে অনুসারে তার মূল্য হয়।

১৪. জ্ঞানী হও – জ্ঞানী কখনও দরিদ্র হয় না।

১৫. নিজেকে চেনো– যে নিজেকে চেনে সে কখনও ধ্বংস হয় না।

১৬. সত্যবাদী হও– মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞ হয়।

১৭. সাহসী হও– যার সাহস নেই তার ধর্ম নেই।

১৮. ধার্মিক হও– ধার্মিকের হৃদয় তৃপ্ত থাকে।

১৯. লোভ করো না– লোভী মানুষ বাঁচার মতো বাঁচে না।

২০. সৎ শিক্ষা গ্রহণ করো– ধনের সন্ধান থেকে সৎ শিক্ষার সন্ধান অনেক ভালো।

২১. পাপের পথে পা বাড়িও না– পাপ করলে অনুতপ্ত হও। অনুতাপ পাপকে মুক্তি দেয়।

২২. উদাসীন হয়ো না– উদাসীনতা অলসতার জন্ম দেয়।

২৩. সমালোচক হও– যে ভালোবাসে সে সমালোচনাও করে।

২৪. নীচতা পরিহার করো।

২৫. প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ো না– প্রতিহিংসা মনের শান্তি দূর করে।

২৬. যে রকম ব্যবহার পেতে চাও– অন্যের প্রতিও সে রকম ব্যবহার করো।

২৭. আশাবাদী হও কিন্তু বেশি আশা শোক বয়ে আনে ।

২৮. অসৎ লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ো না।

২৯. রাগান্বিত হয়ো না–রাগ হওয়া মানে আল্লাহর কাছে খারাপ হওয়া।

৩০. ধৈর্যশীল হও। বিপদ–আপদে বীর পুরুষেরা ভয় পায় না।

৩১. খাঁটি মানুষ হতে হলে তিনটি কাজ করবে :

ক. শোকে–দুঃখে ধৈর্যধারণ করবে,

খ. অল্পে সন্তুষ্ট থাকবে,

গ. সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করবে।

৩২. ঈমানদার হও– ঈমানদার লোক নিজের পাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকে, প্রলোভনে ভয় পায়, শুধু আল্লাহর করুণা আশা করে।

www.nagorikpathagar.org

আলোর ভুবন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম